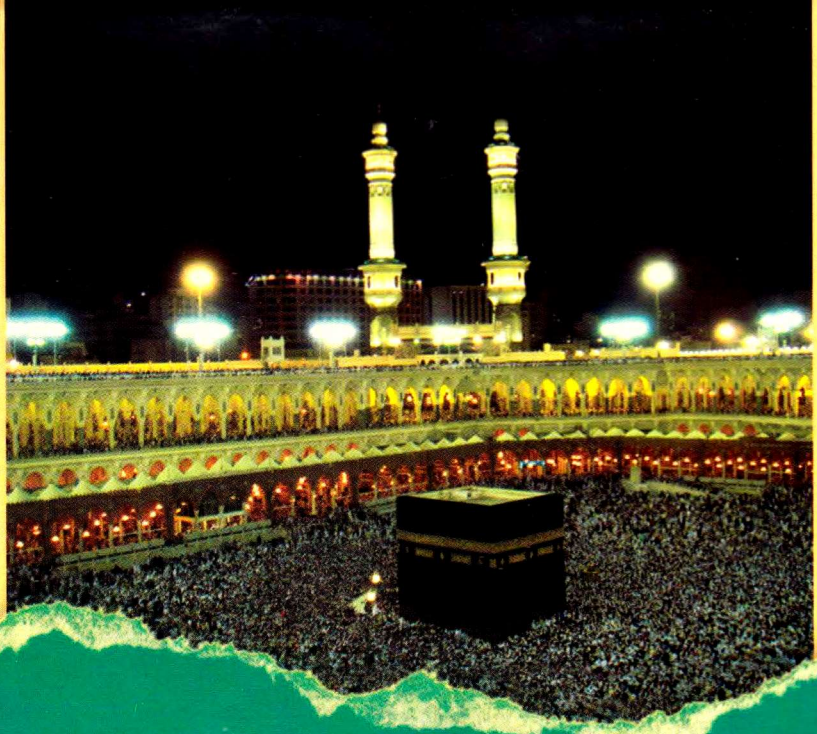

আল্লাহর অতিথি

নাজমা ফেরদৌসী

আল্লাহর অতিথি

আল্লাহর অতিথি হবার অনুভূতি এক অনুপম আনন্দের অভিজ্ঞতা। মানুষের মালিক, মানুষের সৃজনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন 'আল্লাহর অতিথি' বলে অভিহিত করে তাঁর সাথে মুমিনের এক গভীর নৈকট্যের সম্পর্ক স্থাপনের কথা প্রকাশ করেছেন। নবী (সঃ) এর বাণীতে তা এভাবেই প্রকাশিত, *"হজ্জ ও উমরাহকারী ব্যক্তি আল্লাহর অতিথি। সে তার মেযবান আল্লাহর কাছে দু'য়া করলে তিনি তা কবুল করেন। সে মাগফিরাত চাইলে মঞ্জুর করেন।"* [ইবনে মাযাহ]

তাঁর অতিথির মর্যাদা লাভ করা এক বিরল সম্মাননা। মানুষ নিজে যে মহাসম্মানিত রবের সৃজিত প্রতিনিধি, তাঁরই সম্মাননায় অভিষিক্ত হবার জন্য সে উদগ্রীব থাকবে এটাতো স্বাভাবিক। নামাযে তাঁর সাথে হয় কথাবলা, রোযায় তাঁর জন্য আত্মত্যাগ করা, যাকাতের দ্বারা অপরাপর প্রতিনিধিদের অধিকার আদায় করা আর হজ্জে সে আল্লাহর আতিথেয়তার সৌভাগ্য লাভ করে। এখানে সে তার রবের অনুপম নিদর্শনমালা প্রত্যক্ষ করে, যা তাকে আজীবন তাঁর [রবের] ভালবাসার মানুষ হতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

মহাকালের সাপেক্ষে আমাদের এ জীবনপথ ভোরের শিশির-বিন্দুর মতই ক্ষণিকের। পৃথিবীতে আমাদের বিচরন সীমিত সময়ের এক পরীক্ষামাত্র। পরীক্ষার এ ময়দানে কোন্ কাজ আমাদের বেশি কল্যাণ দেবে তা খুঁজে বের করার মধ্যেই প্রকৃত সফলতা লুকিয়ে আছে। এই সাফল্য শুধু এ জীবনের নয়, অনন্তকালেরও। অনন্ত জীবনকে সুখী ও শান্তিময় করার কলাকৌশল তিনিই শিখিয়েছেন মানুষকে, যিনি তাকে সুন্দরতম অবয়বে তৈরী করেছেন, বিকশিত করেছেন। সেই কলাকৌশলের নাম ইসলাম। প্রত্যয়, বিশ্বাস বা ঈমান এর প্রথম ভিত্তি। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ঈমানের মূল বিষয়। হজ্জ, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের সর্বশেষটি। তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র বাইতুল্লাহ অভিমুখে হজ্জের সফর প্রকৃতপক্ষে জান্নাতের পথে সফর। কেননা, *"মাবরুর [আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া] হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" [বুখারী ও মুসলিম]* আর *"হজ্জে মাবরুর হচ্ছে ঈমান ও জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল।" [বুখারী]*

মানব জাতির জন্য কাবা একমাত্র ঘর, যার প্রদক্ষিণ করা থেকে মানুষ, জামায়াতে সালাত আদায়ের সময় ছাড়া এক সেকেন্ডের জন্যও বিরত হয়না, একদলের পর আরেকদল এসে প্রদক্ষিণের ধারা অক্ষুন্ন রেখে চলেছে অবিরাম - এক অনন্য ধারাবাহিকতায়, এ কী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার একমাত্র রব হবার এক অনুপম নিদর্শন নয়? বছরের একটি দিন, ঘন্টা, মিনিট কি সেকেন্ডের জন্যও কাবা জনশূন্য হয়না। এমন ঘর কি পৃথিবীতে আর একটিও দেখানো যাবে? হজ্জে গিয়ে এরকম আরও অনেক নিদর্শন প্রেক্ষণে ঈমানকে মজবুত করার এক অনবদ্য সুযোগ মুমিন ব্যক্তি পেয়ে যান।

প্রতীক্ষার দিনগুলো

প্রতীক্ষার দিনগুলো যেন যুগ-যুগান্তর। আশা ও স্বপ্নের সাথে বাস্তবের সমন্বয় সাধনের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার এই প্রহর গোনা চলেছে সেদিন থেকে, যেদিন তিনি আমাকে সঙ্গী করে হজ্জের সফরে যাবার সংকল্প ব্যক্ত করলেন। আমি এমনটিই আশা করেছিলাম। আর এ নিয়ে আমাদের স্বপ্ন দেখাদেখি চলেছে আরো অনেক দিন আগে থেকেই।

আমাদের চার সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছেলে মুনযির মুনীফ। তখনো হাঁটতে শেখেনি। ২০০৪, রমযান মাস। ওর বয়েস ছ'মাস। ওর আব্বু জানালেন, ক'বছর ধরে একটা সঞ্চয় ফোরামে কিছু কিছু করে টাকা জমেছে। উদ্দেশ্য জমি কেনা। পছন্দসই জমি না মেলায় শরীকদের প্রাপ্য দিয়ে দিচ্ছে। টাকাটা হাতে এলে এবারই হজ্জে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন তিনি।

আমি বললাম, 'আমাকে যেন সাথী করে নেয়া হয়।'

তিনি বললেন, 'সাথীতো হয়েই আছো। সাথে নিয়েই যাব ইন্‌শাআল্লাহ।'

দু'জনের সফরের পুরো খরচ বহনে প্রয়োজনে আমার মোহরানার টাকাও খরচ করার কথা তাঁকে বললাম। মুনযির একান্তই দুধের শিশু, তদুপরি তখনও আমার অসুস্থতা পুরোপুরি কাটেনি। হজ্জে যাবার মত সুস্থ হয়ে উঠিনি। তাই হৃদয়ের ব্যগ্রতা, ঈমানী আশ্বাস আর দাবী নিয়ে অনুরোধ করলাম আমাকে নিয়ে আগামী বছর যাবার জন্য।

পরিবারের মৌলিক চাহিদা মিটাবার সাথে সাথে হজ্জের সফর খরচ বহনের সামর্থ থাকলেই একজন সুস্থ সবল ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ ফরয হয়ে যায়। আর মহিলাদের জন্য হজ্জ ফরয হওয়ার অতিরিক্ত শর্তটি হল মাহরাম সফরসঙ্গী থাকা। মাহরাম সফরসঙ্গী ছাড়া মহিলাদের হজ্জের গ্রহণযোগ্যতা নেই। আমি আমার সফরসঙ্গী পাবার এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। আমার husband-এর হজ্জ সম্পন্ন করা হয়ে গেলে পরবর্তীতে কাকে সফরসঙ্গী পাব। আমার আব্বা ও ভাইরা আগেই হজ্জ করেছেন। নিজের ছেলেদের সাথে যেতে হলে অপেক্ষা করতে হবে দেড়-দু'যুগ। এ বিলম্বের কারণে শারিরীক ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দে ভাটা পড়তেও পারে। হজ্জের জন্য এতো তাগিদ, এতো উৎসাহ এবং এত পরিমান কল্যাণের অব্যাহত ধারা এ কাজে রয়েছে যে হজ্জ সম্পন্ন করা ছাড়াই মৃত্যু এসে যাবে নিজের জন্য তা কল্পনারও অতীত।

হজ্জের অবারিত কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত হবার পর একজন মুমীন ব্যক্তির সামর্থ না থাকলেও সে আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করে এবং দু'য়া করতে থাকে যে, আল্লাহ যেন তাকে এতটা স্বচ্ছলতা দেন, যাতে সে হজ্জ করতে পারে। সেখানে সুস্থতা ও আর্থিক সামর্থ অর্জন করার পর বাচ্চা ছোট, বাচ্চাদের পড়াশোনা .... এরকম নানা সমস্যার জন্য বিলম্ব করতে গিয়ে পাছে সৌভাগ্যবঞ্চিতদের মাঝেই শামিল হয়ে যেতে হয় –এ ভাবনা আমাকে শংকিত করেছিল। বয়স যত বাড়ে - মানুষের শক্তি, উদ্যম, সাহস ও সুস্থতা ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবেই কমতে থাকে। ফলে হজ্জের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় একের পর এক প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। কাজেই হজ্জ করতে বিলম্ব করায় কোন বিশেষ সুবিধা লাভের নিশ্চয়তা নেই।

মুনযিরের আব্বু আমাকে সহ আগামী বছর যাবার বিষয়ে সম্মত হলেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। সেই সাথে দু'য়া করলাম, তিনি যেন তাঁর ঘরের অতিথি হবার এ স্বপ্ন ও সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দান করেন। যেন সব কাজ সহজ করে দেন।

বড় তিন ভাই-বোনের সাথে মুনযিরকেও আমার আব্বা-আম্মার তত্ত্বাবধানে রেখে যাবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য হওয়ায় ওকে রেখে যাওয়ার ভাবনা বাদ দেয়া ছাড়া উপায় থাকলনা। ওর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়াটা আমাদের জন্য ছিল বেশ কঠিন। এ অবস্থায় আমরা দু'জনেই ইস্তেখারা করলাম, মুনযিরকে সঙ্গে নিব কি নিবনা, এ বিষয়ে। আলহামদুলিল্লাহ। দু'জনের একই মনোভাব তৈরী হল, যা এর আগে হয়নি। সেই সাথে ২০০৩-এ নিকটতম প্রতিবেশী কান্তা ভাবী ও কামাল ভাইয়ের তাদের ছোট্ট মেয়ে নাফিসাকে নিয়ে এবং পরবর্তী বছর জোহরা ভাবীর, ভাইসহ হজ্জ করার অভিজ্ঞতা আমাদের হজ্জের সফরের জন্য সহায়ক হলো। অভিজ্ঞতাগুলো আল্লাহর সাহায্য ও রহমত পাবার নমুনায় টইটম্বুর ছিল। পরিশিষ্টে কেস স্টাডিতে এর কিয়দংশ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যাতে আরও হাজারো মা-বোন আল্লাহর অতিথি হবার সফরে বেরুতে উৎসাহ বোধ করেন।

সিদ্ধান্ত নিলাম, মুনযিরকে নিয়েই যাব। দেখতে দেখতে রমযান- ২০০৫ এসে গেল। ইতোমধ্যে মুনযির হাঁটতে ও দৌড়াতে শিখেছে। দু'এক শব্দে কথাবলা শিখেছে। স্বাভাবিক খাবারে অভ্যস্ত হয়েছে। মুনযিরের আব্বু স্মরণ করিয়ে দিলেন, দু'য়া কবুলের এ মাসে যেন হজ্জের বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে না ভুলি। সারাটা রমযান আল্লাহর কাছে এ কাজের সহজতা চাইলাম। সেই সাথে চলল প্রতীক্ষার প্রহর গোনা।

প্রজন্মের ভাবনা

আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণা, হজ্জ হল জীবনের শেষ কাজ। কাজেই তা সম্পন্ন করতে হবে বৃদ্ধ বয়সে। অন্ততঃ ছেলেমেয়ের বিয়েশাদী হয়ে যাবার পর। যদিও তিনি তার আগামী দিনের হায়াত ও সুস্থতা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান, লেখালেখি, কুরআন-হাদীস চর্চা এবং ইসলামী দাওয়াত প্রসারের ফলে এ ধারণায় পরিবর্তন আসছে। তবে, ব্যাপক নয়। এখনও তা নতুন ধারা সৃষ্টি করার মত শক্তি অর্জন করেনি। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেলাম।

যখন ইস্তিখারা করে ছোট্ট ছেলেকে সাথে নিয়েই হজ্জে যাব সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন এ বিষয়ে সমাজের এই ভীষণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিটি আমার কাছে বেশ পরিস্কারভাবে প্রকাশ পেল।

আমাদের সমাজে ইসলামের যে কাজগুলো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় সেগুলোর প্রতি উৎসাহী লোকের কমতি নেই। কিন্তু যেখানেই বাধা-বিপত্তি, লোক নিন্দার ভয়, আর্থিক বা শারীরিক ঝুঁকি (Life risk) রয়েছে সেখানেই ভীরু পিছুটান আচ্ছন্ন করে রাখে আমাদের অনেককে। আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও আস্থাকে দুর্বল করতে শয়তান

আমাদের পিছু নেয়। এ কাজের জন্য নানা প্রকার আবেগ-ভালবাসা ও আদর-স্নেহের মায়াজাল বিস্তার করে। নিজ দুর্বলতার সপক্ষে অজুহাত খাড়া করতে উৎসাহ দেয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে ভাল এমন সব জিনিস দিয়েই বাঁধে যেন তার ধোঁকা আমরা বুঝতেই না পারি। আল্লাহর রাজি-খুশির কাজে আগ বাড়াতে দেয় না। ঝুঁকি নিতে দেয়না। এ বাঁধন ছিন্ন করতে পারায় রয়েছে শয়তানী শক্তির পরাজয়, আল্লাহর সাহায্য ও মুমীনের জয়। ব্যক্তি পারলে জাতি পারবে। জাতি যখন পারবে ইসলাম তখন বিজয়ী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। সাহাবীরা পেরেছিলেন, কেননা তারা এ বাঁধনকে উপেক্ষা করেছিলেন। কাঙ্খিত পরিবর্তনের জন্য আমাদেরও তা পারতে হবে। এ কাজে পথ দেখাবেন মায়েরা, কেননা সন্তানকে এবং জাতিকে পথ দেখানোর কাজ প্রথমতঃ তাদেরই। আজকে নতুন ধারা তৈরীর জন্য আমাদের সামর্থবান মা-দের আগ বাড়িয়ে আসা দরকার। নিজ রবের ডাকে সাড়া দেবার প্রয়োজনে নিজের শিশু-সন্তান সমেত হাজির হয়ে যাবারই প্রস্তুতি থাকা দরকার। যেখানে মা ও সন্তানের দ্বৈত-কণ্ঠের আবেগ উৎসারিত "লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" (আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ আমি উপস্থিত) ধ্বনি উচ্চারিত হবে।

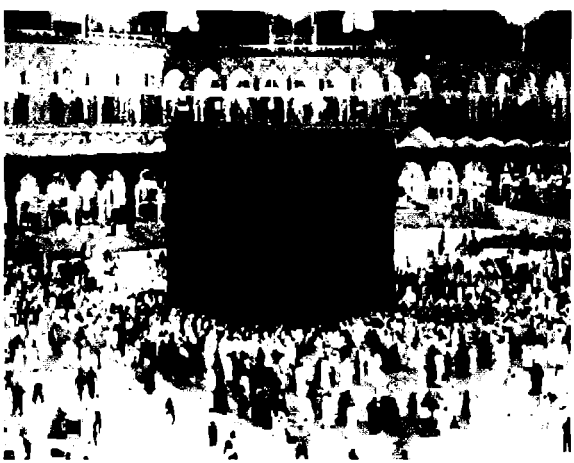

আল্লাহর ঘর ঃ খানায়ে কাবা, যা কখনও নির্জন হয়না।

হজ্জের এ লম্বা সফর অবশ্যই ঝুঁকিমুক্ত নয়। জান ও মাল যে কোন প্রকার ঝুঁকি আসতে পারে। যেমন জীবনের প্রত্যেকটি কাজেই ঝুঁকি আছে। জীবন যতক্ষণ, ঝুঁকির প্রশ্নও ততক্ষণ। শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলে পরে আর কোন ঝুঁকি থাকে না।
হাদীসে রাসূল (সঃ) এ বলা হয়েছে,
"তোমরা ফরয হজ্জের জন্য তাড়াতাড়ি কর। কেননা কেউই জানেনা তার ভাগ্যে কী আছে" [মুসনাদে আহমাদ]।

কাজেই ঝুঁকির অজুহাতে আল্লাহর নির্ধারিত ফরয হজ্জ আদায়ে বিলম্ব করা একজন মুমীনের জন্য শোভনীয় নয়। বিশেষভাবে সৃষ্ট (শারীরিক বা যাত্রা পথের) কোন ঝুঁকির বিষয়ে শরয়ী শিথিলতা তো আছেই, সেটি আলাদা প্রসঙ্গ। কিন্তু ফরয পালনের ব্যাপারে

শরিয়তের আপোষহীন ভূমিকা সম্পর্কে অনেকেই অনবহিত। এ কারণে আমার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমাদের দেড় বছরের শিশু সমেত হজ্জে যাবার বিষয়টি প্রথম অবস্থায় সহজভাবে গ্রহণ করেনি। কিন্তু অটল সিদ্ধান্তের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সাহায্য মিশে সহজ হয়ে উঠল আমাদের হজ্জের সফর।

প্রেরণার কথা

আমার চারদিকের পরিমন্ডল থেকে হজ্জের সফরের বিষয়ে দু'টো প্রশ্ন এসেছেঃ
প্রথমতঃ শিশু নিয়ে ইবাদাতে মনোনিবেশ (Concentration) করা সম্ভব কিনা?
দ্বিতীয়তঃ শিশুর যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারব কিনা?

প্রশ্ন দুটো বাস্তব এবং আমাদের প্রস্তুতির পক্ষেই সহায়ক ছিল। সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম যাতে শিশু পরিচর্যায় ব্যাঘাত না ঘটে এবং শিশুর কোন কষ্ট না হয়। সেই সাথে চলেছে দু'জনে মিলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকা। প্রথম প্রশ্নটির ব্যাপারে আমি একবারের জন্যও দ্বিধাবিভক্ত হইনি। কেননা মুমীনের গোটা জীবনই ইবাদাতের জীবন। নামায, রোযা, যাকাত, হিজাবসহ সকল ইবাদাত একজন মুমীন মা তার শিশু সন্তান সামলেই করেন। ফলে তার শিশুর যত্ন ও পরিচর্যার দিকটিও ইবাদাতের মধ্যে শামীল হয়ে পড়ে। ইবাদাতের concentration যত গভীরই হোক না কেন অবশ্যই মা নিজের সন্তান সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন না। সন্তান শিশু হোক, কৈশোরে বা যৌবনেই পদার্পণ করুকনা কেন, সে হচ্ছে মায়ের বিশেষ মনযোগের বিষয়। এ বিষয়ের জবাবদিহিতা রয়েছে কঠিনভাবে। নবী (সঃ) এর বাণী,

"এবং মহিলা নিজ স্বামীগৃহ ও তার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তোমরা সকলেই স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী দায়িত্বশীল। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের নিকট দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।"[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

মা নামাযরত থাকা অবস্থায় শিশু বিপদাপন্ন হয়ে পড়লে নামায ছেড়ে শিশুকে বিপদ থেকে রক্ষা করা তার অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। নামায পুনরায় আদায় করলেই হয়ে যায়। সহীহ আল বুখারীর এরকম বর্ণনা এসেছে, স্বয়ং নবীজি (সঃ) কোন শিশুর কান্না শুনলে নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। শিশুর প্রতি খেয়াল রাখতে গিয়ে ইবাদাতের concentration নষ্ট হচ্ছে বলে সেই সময়ের ইবাদাত পরে করার জন্য কখনোই একজন মুমীন মা বাকী রাখেন না । বরং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত রেখে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে আল্লাহর নির্ধারিত ইবাদাতও সময়ের ভেতরেই সুসম্পন্ন করতে সচেষ্ট থাকেন। সাবালক হলে যেমন নামায, রোযা, পর্দা ইত্যাদি ফরয হয়, সামর্থ হলে যাকাত, তেমনি শক্তি ও সামর্থ হলেই হজ্জ ফরয হয়ে যায়। আর ফরয হজ্জ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা কর্তব্য হয়ে পড়ে।
রাসূল (সঃ)বলেন,

"যে হজ্জের ইরাদা করে (উপযুক্ত হবার কারণে), সে যেন দ্রুত হজ্জ করে নেয়। কেননা মানুষ কখনো সুস্থতা হারায়, কখনো সম্পদ হারায়, কখনোবা সমস্যায় পড়ে যায়।" [ইবনে মাযাহ]। তিনি আরও বলেন,

"যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার ব্যয় নির্বাহের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করেনা–সে ইহুদী হয়ে মরুক বা নাসারা হয়ে মরুক তাতে কিছু যায় আসেনা।" [তিরমিযি]

সুতরাং এত সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও হজ্জের বিষয়টিকে শিথিলভাবে দেখার সুযোগ কোথায়? বাচ্চা শিশু নিয়ে হজ্জ করা বা না করার বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত অভিমত কাজ করেনি। বরং এ ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি। আমি সেই সম্মানিতা মায়ের ছবি সামনে রেখেছি যিনি নবী (সঃ) এর নিকট নিজ শিশু পুত্র সমেত হজ্জ করার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। *রাসূল (সঃ) হজ্জের সফরে রাওহা নামক স্থানে এক কাফেলার দেখা পেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কারা?" তারা বললো, 'আমরা মুসলিম। আপনি কে?' তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূল।" তখন এক মহিলা তার কোলের ছেলে তাঁর দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর কি হজ্জ হবে?" আল্লাহর রাসূল (সঃ) জবাব দেন, "হ্যাঁ। আর তুমি এজন্য প্রতিদান পাবে।" [সহীহ মুসলিম:৩১১৬]*

রাসূলের ভাষ্য মূল আরবীতে এরকম ছিল ঃ "না'য়াম, ওয়ালাকি আজরা"। না'য়াম– নিশ্চয়তাসূচক এবং হ্যাঁ বোধক শব্দ। আর 'ওয়ালাকি'– তোমার জন্য। 'আজরুন' শব্দটি প্রতিদান, প্রতিফল, সুফল, সওয়াব, বিনিময়, পারিশ্রমিক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুর'আনে সূরা আত্তীনে 'আজরুন গাইরুমামনুন' শব্দসমষ্টি 'বিশেষ প্রতিদান' বা 'অনিশেষ সুফল' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই, গভীরভাবে ভেবেছিলাম, হজ্জের শক্তি ও সামর্থ হয়ে যাবার পরও শিশু সন্তান থাকার কারণটি আমাকে আটকে রাখবে, এটি কি আল্লাহর পছন্দের বিষয় হবে, নাকি শিশু সহকারে উপস্থিত হয়ে যাওয়াতেই অধিক কল্যাণের নিশ্চয়তা? যেখানে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, সওয়াব, নিজের কল্যাণ আর সেই সাথে সন্তানেরটাও! এ আশ্বাস পাবার পর কি কোন মুমিন মা নিজকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইবেন?

আর একটি চিত্র। এটি আমাকে টেনেছে দারুনভাবে। তা হল, দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মা হাজেরার নির্জন বসবাস। *তাঁর হৃদয়ে হাজারো নয়, একটিমাত্র প্রশ্ন জেগেছিল, "কার নির্দেশ?"*

জবাবটিও ছিল চমৎকার। তাঁর স্বামী ইবরাহীম (আঃ) এর দৃঢ়তা এবং ত্যাগে পরিপূর্ণ একটি জবাব, "আল্লাহর।"

ব্যস্। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অকুণ্ঠ আনুগত্যে অটল অবিচল হয়ে রইলেন হাজেরা (রাঃ)। মক্কার জনহীন ধু-ধু প্রান্তরে শুকনো উষর মরুবালির বুকে শুরু হল তাঁর জীবনযাত্রা। আল্লাহর উপর মজবুত ঈমান ও আস্থার পথ ধরে রচিত হল নতুন সভ্যতা গড়ার ইতিহাস। নির্দেশ পালনে কালক্ষেপণ না করার ইতিহাস। পিপাসার্ত শিশুর জন্য এক আঁজলা পানি সংগ্রহের তাগিদে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটোছুটির ইতিহাস। কেন?

কার জন্য তিনি এ নির্জন বাস মেনে নিয়েছিলেন? কোন সম্পদ বা প্রতিপত্তির মোহে, নাকি স্বামীর জন্য? বরং কেবল আল্লাহর জন্যই উৎসারিত হয়েছিল এক নিঃসঙ্গ নারীর একনিষ্ঠ ভালবাসা, আত্মত্যাগ, শ্রম ও আকুতি মিশ্রিত প্রার্থনা। যার জবাবে শুষ্ক মরুমাটি চিরে জন্ম নিয়েছিল সুপেয় ঝর্ণার এক অনিশেষ ফল্গুধারা "যমযম"। যে পানি এক ইসমাঈল ও হাজেরার পিপাসাই মিটাল না বরং তা হল যুগ-যুগান্তরব্যাপী কোটি কোটি মানুষের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণকারী এক সমাপ্তিহীন স্রোতধারা। যে পানিকে কেন্দ্র করে শুরু হল লোকালয়, নগর। পৃথিবীতে এক নতুন সভ্যতার হল গোড়াপত্তন।

হাজেরা (রাঃ) একজন নারী। তিনি সাহায্য পেয়েছেন। আমরা একালের নারীরা কেন পেতে পারব না? এখন তো আকাশযান পাখির মতো উড়ে আমাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছে মক্কার খুব কাছে। সেখান থেকে সড়ক পথে গাড়িতে চড়ে খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছি মাসজিদুল হারামের নিকটে। হারাম শরীফে প্রবেশের পর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছাদের নিচে না আছে রোদের তাপ, না আছে পিপাসার কষ্ট, না একাকীত্বের যন্ত্রনা। তা হলে কোন বিষয়টি আমাদের এ প্রজন্মের নারীদের শক্তি, সামর্থ এবং সঙ্গী জুটে যাবার পরও হজ্জের মত এমন বিশাল কল্যাণের ধারায় অবগাহন করতে বিলম্ব করায়? অথচ মহান আল্লাহ্ বলছেন,

"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের (ইবাদাতের জন্য) নির্ধারিত হয়েছে, যা মক্কায় অবস্থিত এবং যা সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৯৬]

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাবার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ সম্পন্ন করা তার একান্ত কর্তব্য। কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ বিশ্বজগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭]

পবিত্র কুর'আনের সূরা বাকারা, সূরা আল ইমরান, সূরা তাওবা, সূরা মায়িদা এবং সূরা হজ্জ এর অনন্তঃ বিশটিরও বেশী স্থানে হজ্জের এবং হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদাতসমূহের গুরুত্ব ও নিয়মাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে। একেবারেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। সেই সাথে সিয়াহ সিত্তাহর ছয়টি হাদীস গ্রন্থে, সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত হাদীস মুয়াত্তা ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর জীবনে হজ্জের কার্যাবলী যেভাবে গুরুত্বের সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা জানার পর যে কোন মুমীন ব্যক্তিই হজ্জকে জীবনের শেষ প্রান্তে করায় বা বিলম্বিত করায় আগ্রহী হবেন না। নিজ রবের ঘোষিত হিদায়াত ও বরকতের সন্ধানে সেখানে কবে যাব এ উৎকণ্ঠা মুমীনের থাকবেই। কিন্তু বিলম্বিত করার কারণে শক্তি সামর্থ ক্ষয়ে গেলে পরে বদলী হজ্জ করানো সম্ভব কিন্তু সে গৃহের হিদায়াত ও বরকত প্রত্যক্ষ করা থেকে তো বঞ্চিতই থাকা হল।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, *"যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ করবে এবং কোন রকম পাপ-অশ্লীলতা এবং আল্লাহর নাফরমানীর কোন কাজ করবেনা, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে ফিরে যেমনভাবে নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভুমিষ্ঠ করেছিল।" [বুখারী, মুসলিম]*

হযরত আবুযর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, দাউদ (আঃ) আল্লাহর নিকট আরজ করলেন, পরওয়ারদিগার! যে আপনার ঘর যিয়ারাত করতে আসবে, তাকে কি প্রতিদান দেয়া হবে? আল্লাহ বলেন, "হে দাউদ ! হজ্জকারী ব্যক্তি আমার অতিথি। তার অধিকার হচ্ছে আমি এ দুনিয়াতে তার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেই এবং আখিরাতে যখন সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আমি তাকে আমার রহমত দিয়ে ধন্য করি।" [ইবনে মাযাহ]

রাসূলুল্লাহর সাহাবী আমর বিন আস (রাঃ) যখন অন্তিম শয্যায়, সাহাবাদের কয়েকজন তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ কান্না করলেন, এরপর বললেন, "রাসূলুল্লাহ(সঃ)এর হাতে আমার ঈমান আনার দিন তিনি [রাসূল (সঃ)] আমার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। প্রথমে আমি হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আমি আপনার কাছে বাইয়াত নিব, তবে একটি শর্তে।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) শর্তটি জানতে চাইলে আমি বলেছিলাম, 'আমার জাহেলিয়াতের জীবনের সব গুনাহ যেন মাফ করা হয়।' তিনি উত্তরে বলেন, 'হে আমর! তুমি কি জাননা, ইসলাম গ্রহণই পূর্বের সব গুনাহ মিটিয়ে দেয়, আর হিযরত এবং হজ্জও অতীতের গুনাহ মিটিয়ে দেয়?" [সহীহ মুসলিম:১২১]

রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেন, "হজ্জ ও উমরাহ উভয়টি মানুষের দারিদ্র এবং পাপরাশিকে এমনভাবে বিদূরিত করে যেভাবে হাপর স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ পুড়িয়ে খাঁটি করে। মাবরুর হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।" [তিরমিযি:৮১০]।

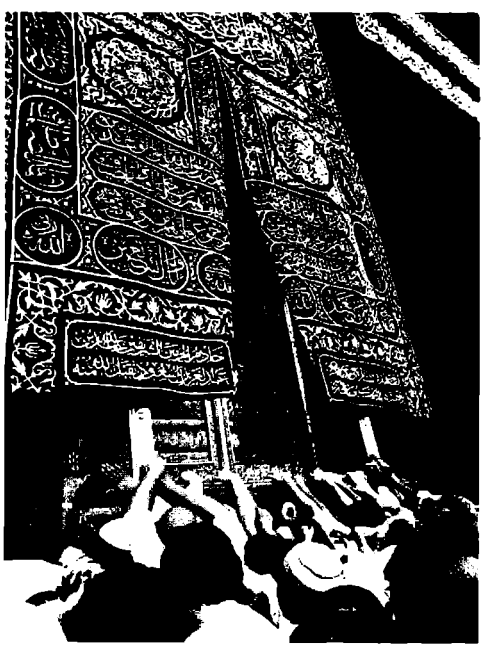

মুলতাযাম ঃ

কাবার স্বর্ণদুয়ার।

মানব সভ্যতার সার্বিক কল্যাণের হাতছানি।

এ গৃহের হজ্জ করা আল্লাহ স্বয়ং পছন্দ করছেন ও নির্দেশ দিচ্ছেন। সশরীরে এ গৃহের মেহমান হবার আকাঙ্খা মুমীনের সহজাত হবারই কথা। কোন বল প্রয়োগে নয়, লোভ লালসা তাড়িত হয়েও নয়। একজন খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি তার রবের প্রতি কর্তব্যের তাগিদে, হৃদয়ের ভালবাসার টানেই এ ঘরের আতিথ্য গ্রহণ করে আনন্দিত হন।

এই প্রজন্মের মাঝে জান্নাতের পথের এ সফরে ত্বরা করে যাবার প্রেরণা জাগানো দরকার। সামর্থ হবার পর বিলম্ব না করে আল্লাহর অতিথি হিসেবে হাজির হবার জন্য পেরেশানী থাকা দরকার। যার সামর্থ নেই, তার সামর্থ তৈরী হবার জন্য উদ্যোগী হওয়া দরকার। এতে দুনিয়ার কল্যাণ আখিরাতেও কল্যাণ। হাজেরা (রাঃ) এর ত্যাগ, সবর এবং ইবরাহীম (আঃ) এর আনুগত্য ও কুরবানীর ইতিহাস যে মক্কা নগরীর সাথে মিলেমিশে এক হয়ে আছে, সেই নগরীতে আল্লাহর অতিথি হয়ে বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে হাজির হয়ে, হৃদয়াভ্যন্তরে "উম্মাহবোধ" জাগ্রত করে তবেই ফিরে আসা দরকার। তাসবিহ, টুপি, খেজুর আর জায়নামায যতটা গুরুত্ব সহকারে সঙ্গে আনা হয় ততোধিক গুরুত্ব সহকারে "উম্মাহবোধ" অর্জন করা দরকার। হজ্জের সামাজিক শিক্ষা এটাই। এই Corporate feelings অর্জন করতে পারলে আমরাও আমাদের ভুখন্ডে ঐক্য, সম্প্রীতি ও দারিদ্র বিমোচনের এক স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করতে পারব।

আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ কেননা, আমার হজ্জের সফরে সমাজের নানা বাধা ও পিছুটান সৃষ্টি হবার পরও আমার নিকটজন, আত্মীয় ও পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত পেয়েছি। বড় মেয়ে উমামা ফেরদৌসী, বয়স তখন বারো, বড় ছেলে মুনতাসির মাহদী বয়স ছিল নয়, দু'জনেই সমস্বরে আনন্দ প্রকাশ করল আমরা হজ্জে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছি শুনে। ছোট মেয়ে মুনীরা মুশতারী, তার বয়স সাত, সে বলল, "আম্মু আমরা সবাই কি যেতে পারি না?" বললাম, "ইনশাল্লাহ, যাবে। যখন তোমাদের ফরয হবে।" তিন ছেলে-মেয়ে অতি উৎসাহের সাথে লিস্ট করল যে ওদের কার জন্য কি কি দু'য়া করব। আরও লিস্ট করল কি কি জিনিস আমাদের সাথে নিতে হবে আর কার জন্য কি আনতে হবে। চাচা, ফুফু, নানা, নানু, মামা, খালামনি আর তাদের পরিবার এমনকি কাছের প্রতিবেশীদেরও ওরা তালিকাভূক্ত করেছিল।

প্রস্তুতি

ছোট্ট শিশু নিয়ে যে কোন কাজের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা একটু ভিন্নভাবেই হবে। এটা মাথায় রেখে ছ'মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি চলল। প্রথমতঃ পড়াশোনা কি কি করব? হজ্জের আবশ্যকীয় ফরয ওয়াজিবগুলো জেনে বুঝে পড়ে মনে গেঁথে রাখা, ইহরাম বাঁধার নিয়ম ও শর্তাবলী জানা, সহীহ উচ্চারণে "রব্বানা আতিনা .... (তাওয়াফ কালে যা রুকনে ইয়ামনী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়া হয়), তালবিয়া, আরাফার ও অন্যান্য দু'য়া মুখস্থ করা, তাওয়াফ সায়ীর নিয়মাবলী, মাসজিদে হারামের মর্যাদা, হারাম এলাকার সীমা ও মর্যাদা, উমরাহ, তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে যিয়ারাহ, বিদায়ী তাওয়াফ, নাফল তাওয়াফ, মিনা, আরাফা, মুজদালিফা, জামরা, কুরবানী, শিশুর হজ্জ,

মদীনা সফর ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিস্তারিত এবং ভালভাবে মনে গেঁথে নেয়ার জন্য ছ'মাস সময় মোটেও যথেষ্ট মনে হলো না।

এরপরে প্রস্তুতির আরেক অংশ 'পাথেয় সংগ্রহ'। হজ্জ সফরের পূর্ব-প্রস্তুতির মধ্যে হজ্জ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের যেমন গুরুত্ব রয়েছে এরও তেমনি গুরুত্ব রয়েছে। রাসূলের যুগে কিছু লোক হজ্জের পাথেয় সঙ্গে নিতনা এবং বলত, "আমরা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।" অথচ মক্কায় উপনীত হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করেন, "তোমরা হজ্জের সফরে পাথেয় নিয়ে যাও, আর সবচেয়ে ভালো পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। হে বুদ্ধিমানেরা! আমাকে ভয় করতে থাক।" [সূরা বাকারাঃ ১৯৭]
জাহেলী যুগে পাথেয় নেয়াকে দুনিয়াদারীর কাজ মনে করা হত এবং বলা হত সম্বলহীনভাবে আল্লাহর ঘর অভিমুখে রওনা হওয়া ধার্মিকতার লক্ষণ। আল্লাহপাকের আয়াত এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে। পাথেয় সংগ্রহের এ তাগিদ সামনে রেখে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে রমযানের আগে-পরে ফাঁকে ফাঁকে বাসার জন্য এবং আমাদের নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা ও সেলাই-ফোঁড়াই সারিয়ে রাখলাম। মুনযিরের আব্বু টাকা ভাঙ্গিয়ে রিয়াল কিনে আনলেন। প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে হজ্জের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে এমন মা বোনদের সান্নিধ্যে গেলাম, ফোনে আলাপ করলাম। তাদের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। আমার আম্মা, আব্বা, আপা ডাঃ খালেদা নাসরিন, বড় ভাই ডাঃ ইকবাল হোসেন, বড় ভাবী, নাসরিন হোসেন, আফরোজা বুলবুল আপা, আমিনা আপা, আরো অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন সাধ্যমত। প্রতিবেশী দ্বীনিবোন কান্তা ভাবী ও জোহরা ভাবী নিজেদের অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে দিয়েছেন যা আমার সার্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ছিল। মুনযিরের জন্মের পর থেকে বাচ্চার যত্ন ও পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকায় বাইরে হাঁটাহাঁটি খুব কম হত। হজ্জে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর হজ্জের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নিয়মিত ঘড়ি ধরে আমরা দু'জনে বাইরে হাঁটতে থাকলাম। পাশাপাশি ডায়েট কন্ট্রোল শুরু করলাম, যাতে ওজনটা দ্রুত কমে আসে। হজ্জের মত শ্রমসাধ্য কাজ স্বস্তি ও শান্তিতে সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রিত থাকলে খুবই ভাল হয়। তা না হলে তাওয়াফ, সায়ী, মাসজিদে আসা-যাওয়া, আরাফা, মুযদালিফা, সবখানেই ভিড় উৎরে চলাফেরায় দারুন বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এমনিতেই সুস্বাস্থ্যের জন্য ওজন নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হজ্জের প্রস্তুতির জন্যও বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।

ছোট শিশুর জন্য কত কী-ই না লাগে। খিচুড়ি রান্নার শুধু চাল-ডাল-নুন-তেলই নয়, হাঁড়িও নিলাম একটি। পর্যাপ্ত টিস্যু পেপার বক্স, প্যাম্পার্স, বেবী লোশন, পাউডার, শ্যাম্পু, সাবান, ডিটারজেন্ট, শীত ও গরমের পোষাক, সুঁই-সুতা, চামচ, ছুরি, প্লেট, বাটি, ফিডার, চিনি, দুধ, বেবী সিরিয়াল, স্যালাইনের প্যাকেট ও প্রয়োজনীয় ঔষধ, চকলেট, চানাচুর, বিস্কিট, হালকা-পাতলা খেলনা, বেলুন, ন্যাপি ক্রিম, ওয়েট টিস্যুবক্স এমনকি পটি পর্যন্ত বাদ গেল না। আমার বড় ভাবীর পরামর্শে কিনে নিলাম বেবি

ক্যারিয়ার, যেটা বাচ্চা নিয়ে হাঁটাহাঁটির সময়টায় কাজে লেগেছে দারুন। ছ'মাস থেকে দু'বছরের বাচ্চাকে বেবি ক্যারিয়ারে নিয়ে পিঠে বা বুকে ঝুলিয়ে মাইলকে মাইল হাঁটা যায়। হাত দুটো ফ্রি থাকে। মুনযিরের জন্য ইহরামের কাপড়ও নেয়া হল দু'সেট। মুনযিরের আব্বুর তিন সেট। আর আমাদের দু'জনের না হলেই নয় এমন সব প্রয়োজনীয় কাপড় ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র বেঁধেছেদে নিতেই লাগেজ হয়ে গেল সংখ্যায় বেশী, আয়তনেও বড়। তবে প্রায় একমাস আগে থেকেই ধীরেসুস্থে গুছিয়ে নেয়াতে তেমন একটা ঝামেলা হয়নি। মোটামুটি গুছিয়ে রেখে আমরা গেলাম চট্টগ্রামে। ওখানে মুনযিরের ছোট ফুপী বর্তমানে ঢাকা ইডেন কলেজের বোটানীর এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আসমা নজির রোশনী, মুনযিরের আব্বুর চাচা, ফুফু এবং অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। সবার সাথে দেখা করে দু'দিনের মধ্যে আবার ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকার আত্মীয় স্বজনদের সাথেও দেখা করলাম। পুলিশ ভ্যারিফিকেশন এর জন্য থানায় হাজির হওয়া, ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য হসপিটালে যাওয়া এগুলো আগে ভাগেই সেরে রাখলাম।

তিতুমীর হজ্জ কাফেলার মাধ্যমে আমরা আমাদের মুয়াল্লিম ফি, প্লেন ফেয়ার ও মক্কা মদীনায় থাকা খাওয়ার টাকা জমা দিয়েছি। কাফেলা আয়োজিত হজ্জ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশ নিয়ে সফর প্রস্তুতির আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আরও ভালভাবে জেনে নিলাম। জানুয়ারী ২০০৬ এর ১ম সপ্তাহে হজ্জের মূল অনুষ্ঠান হচ্ছে। সময়টা শীতের মাঝামাঝি। মোটা পশমী কাপড় ও ঠান্ডাজনিত রোগের ঔষধ সহকারে মরু-শীত মোকাবেলায় প্রস্তুতি পাকাপোক্তভাবেই নিলাম। ডিসেম্বর ২০০৫ এর ১৪ থেকে ২০ তারিখের এর মধ্যে যে কোন দিন ফ্লাইট হতে পারে বলে জানানো হয়। ১২ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলগামী তিন ছেলেমেয়ের ফাইনাল পরীক্ষাও শেষ হল। এর মধ্যেই আত্মীয়-স্বজনদেরকে বাসায় দাওয়াত করলাম, নিকটাত্মীয় যারা উপস্থিত ছিলেন, সবাইকে নিয়ে আমার আব্বা ডাঃ এ এস এম নজীবুল্লাহ দু'য়া করলেন আমাদের নিরাপদ সফর এবং মাবরুর হজ্জের জন্য। তারপর টুকিটাকি লেনদেন চুকিয়ে নেয়া, প্রতিবেশী, দ্বীনিবোন ও আত্মীয় যাদের সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি তাদেরকে ফোন করে বলা, বড় তিন ছেলেমেয়েদের কোথায় কার অভিভাবকত্বে রেখে যাব সেসবের ব্যবস্থাপনা করা, এক মাসের ব্যবধানে ফিরে এসে সংসারী গিন্নিবান্নির হাল ধরার ব্যবস্থাপনা সব কিছুই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পাকাপোক্ত করে রেখে যেতে হল।

প্রস্তুতির ভেতর অজানা শংকা

আমার প্রতিবেশীরা ক'দিন ধরে নানা রকম খাবার-দাবার রান্না করে পাঠাচ্ছেন। ফ্লাইটের দু'দিন আগে থেকে আমার রান্নাঘরের কাজ নেই বললেই চলে। কাজল ভাবী, সুলতানা রাজিয়া ভাবী, খাদিজা ভাবী, মুমীন ভাবী, রোজি ভাবী, গোলাম মাওলা ভাবী একজনের পর একজন খাবার রান্না করে পাঠাচ্ছেন। এর পাশাপাশি চলছে এখানে ওখানে দাওয়াতে অংশগ্রহণ।

এই সুযোগে লিষ্ট অনুযায়ী গুছিয়ে নিলাম লাগেজ। এক মাস আগে মোটামুটি গোছানো থাকলেও নতুনভাবে পথের চাহিদাকে সামনে রেখে নেড়েচেড়ে আরেকবার ঝালিয়ে পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে নিলাম একেবারে হাতব্যাগ পর্যন্ত। জোহরা ভাবী আর কান্তা ভাবী দেখছেন ঠিকমত গুছাচ্ছি কিনা। সাথে সাথে যোগ হচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধি ও পরামর্শ। বিশেষ করে ছোট বাচ্চা নিয়ে কোন্ কাজ কখন কী ভাবে করলে সহজ হবে এ ব্যাপারে চুলচেরা guideline দিয়েছেন। জেদ্দা পৌঁছে মুয়াল্লিমের গাড়ি পেতে দেরি হলে খাবারের সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য প্রচুর শুকনো খাবারের উপহার ঢুকিয়ে হাতব্যাগটা ভীষণ ভারী করেছেন এ দুই বোন। সহযোগিতা করেছেন তাদের স্বামীরাও। আল্লাহ তাদের সকলকে প্রতিদান দিন।

এতসব প্রস্তুতির ভেতরেও আমাদের উৎকণ্ঠা আর আশংকা দূর করতে পারছিলাম না। শুনেছিলাম এবার অনেক হজ্জযাত্রী টাকা জমা দেওয়ার পরও বাদ পড়বে। বিমান এত লোকের টিকেট দিচ্ছে না। জেদ্দায় বাংলাদেশ বিমানের শ্লট [বিমান অবতরণের অনুমতি] প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার কারণে। মানসিক টানা পোড়েনে উদ্বিগ্ন থাকলেও আশা ছিল অনেক .....। সেজন্য সাহায্য তাঁর কাছেই চেয়েছি যিনি পারেন সাহায্য করতে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিদিনই সফর প্রস্তুতির অগ্রগতি তদারকীতে ব্যস্ত থাকছিলেন মুনযিরের আব্বু। দু'একদিন পর পরই গাজীপুরের সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন কোয়ার্টারের বাসা থেকে ঢাকায় গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আসতেন আর প্রতিদিন দু-তিনবার করে ফোন করতেন এজেন্সী অফিসে। কাজের অগ্রগতি জানতে চাইলে তিনি জানাতেন, "অবস্থা খুবই নাজুক। বলার মত কিছুই হয়নি। তবে প্রস্তুতি নিতে থাক, আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাক।" উদ্বিগ্নতায় তার মুখ দেখতাম থমথমে। অবশেষে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গালফ এয়ারের ঢাকা-আবুধাবী-জেদ্দা রুটে প্লেনের টিকিট করা হয়েছে, খবর পেলাম। আবুধাবি ট্রানজিট। ট্রানজিট ভ্রমনে সময় বেশি লাগে। কষ্টও অনেক। তবুও যে যেতে পারছি সেজন্য মনে আনন্দের ঢেউ জাগল। কৃতজ্ঞতা জানালাম আল্লাহকে। সামনের কাজগুলোকে যেন তিনি বাধামুক্ত করেন সেটা হয়ে উঠল আমাদের নৈমিত্তিক চাওয়া।

সেদিন ছিল ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫। আমার আম্মা বেগম লতিফা খাতুন আর আপা ডাঃ খালেদা নাসরিন মণি আমাদের বাসায় আসলেন এবং বড় তিন ছেলেমেয়েকে আম্মা-আব্বা ও বড়ভাইদের ঢাকার গ্রীন রোডের বাসায় নিয়ে গেলেন। দু'য়া চেয়ে বিদায় নিলাম আমার আম্মা ও বড়বোনের কাছ থেকে। শিশু ও কিশোর বয়েসী তিন ছেলেমেয়ে মুনীরা, মুনতাসির ও উমামা খুবই সাবলীল অন্তরঙ্গতায় ও হাসিমুখে আমাদের কাছে দু'য়া চাইল এবং বিদায় নিল। দু'য়া কবুলের স্থানগুলোতে সেই প্রফুল্ল মুখগুলো সামনে এসেছে বারবার-"আম্মু, দু'য়া করবেন।"

মনে এসেছে আম্মা-আব্বার কথা, "তোমরা দু'য়া করো-- নাজমা, শোয়েব।"

১৫ তারিখ রাত দশটায় গাজীপুরের টাকশালস্থ মুনযিরের আব্বুর বর্তমান কর্মস্থলের বাসা থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ১৬ ডিসেম্বর ভোর ৪ টায় ফ্লাইট। বেরুনোর আগ পর্যন্ত প্রতিবেশী ও দ্বীনি ভাই বোনদের সৌজন্য

সাক্ষাৎ চলতে থাকল। প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এল। বলল, "চাচী, আমাদের জন্য দু'য়া করবেন।"
বললাম, "অবশ্যই"।
জামাল উদ্দীন ভাই ও নাজমুন্নাহার ভাবী আসলেন। দু'য়া চাইলেন। তাদের সাথে নিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিলাম। গাড়ি শর্যন্ত তুলে দিতে এগিয়ে এলেন অনেকে। আল্লাহর পথে এগিয়ে দেয়ার কত অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্খীই না পেলাম। সবার জন্য প্রাণ খুলে দু'য়া করেছি যেন আল্লাহ তাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দেন, আর তাঁর অতিথি হবার তাওফিক দেন।
সন্ধ্যায় ঘুমিয়েছে মুনযির। জোহরা ভাবী ওকে রেডি করে আমার কোলে দিলেন। বাসার চাবি এবং অগোছালো খাবার টেবিল গোছগাছের ভার নিয়ে একজন দ্বীনিবোনের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। প্রতিবেশী ভাইরা লাগেজ তুলে দিলেন গাড়িতে। মুনযিরের আব্বুর কলিগ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী কামাল ভাই এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সাথে গিয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন।

এয়ারপোর্ট যাবার পথে মুনযিরের বড় চাচা জনাব শিবলী নজির, যিনি তখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব ছিলেন, ফোনে অনুরোধ করলেন তার বনানীর বাসা হয়ে যেতে। শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি এয়ারপোর্ট আসতে পারছেন না, এ অবস্থায় আমরা দেখা করে গেলে ভাই ও ভাবী দু'জনেই খুব খুশী হবেন। মুনযিরের দাদা-দাদী দু'জন ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাদের জান্নাতবাসী করুন। তাদের অবর্তমানে আমাদের ছেলেমেয়েরা চাচা-চাচীকে অত্যন্ত সম্মান করে। আমরা ওখানে গেলাম। ওদের চাচা আমাদের সফলতার জন্য দু'য়া করলেন। বললেন, "আমাদের পরিবারের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী সবাইকে হজ্জ সম্পন্ন করার আগেই দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে। তোমাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সবার আনন্দের ও সৌভাগ্যের ব্যাপার যে ছোট বয়সেই মুনযিরকে তোমরা আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাচ্ছো। দু'য়া করো আমরাও যেন যেতে পারি। সেই সাথে আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ উপহার ....." ভাবী আমার হাতে গুঁজে দিলেন দু'শো ডলারের একটি খাম। পারস্পরিক দু'য়া ও ক্ষমা চাওয়া-চাওয়ির মধ্য দিয়ে একটি আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে পারিবারিক বিদায় সম্পন্ন হল।

জিয়া বিমান বন্দরে [বর্তমানে ' শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর']

রাত বারোটার মধ্যে আমরা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছি। ফ্লাইট ভোর চারটায়। এদেশের রাস্তার নড়বড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গাড়ি ম্যানেজ করার সুবিধা সামনে রেখে ঘন্টাখানেক আগেই এয়ারপোর্টে এসেছি। সেখানে দেখি আমাদের মত আগে ভাগে এসে ফর্ম পুরণে ব্যস্ত রয়েছেন বেশ কিছু নারী-পুরুষ। জানা গেল তারাও গালফের ঢাকা-আবুধাবি-জেদ্দা রুটের যাত্রী। আমাদের প্রথম গন্তব্য মদীনা হওয়ায় আমরা কেউই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলামনা। তাই কারা হজ্জযাত্রী আর কারা নয়, তা

পোষাকী নজরে আলাদা করা যাচ্ছিল না। তবে মার্জিত, শালীন ও সহনশীল চলনে বলনে কিছুটা বুঝা যাচ্ছিল।

অত্যন্ত ধৈর্য ও সহশনীলতা, নিয়ন্ত্রিত কথা ও আচরন, একজন হজ্জে সফরকারী ব্যক্তির হজ্জ কবুল হওয়ার জন্য জরুরি। হজ্জের জন্য বেরিয়ে পড়ার পর হতে হজ্জ সম্পন্ন করে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্তই তিনি আল্লাহর অতিথি। তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করা হয়, তার দু'য়া কবুল করা হয়। সুতরাং যিনি মেহমান হিসেবে পথে নেমেছেন, তাকে তো স্বীয় মর্যাদা বহাল রেখেই চলতে হবে। কাজেই সফরের যেখানেই কোন কষ্ট, জটিলতা বা প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছি। তিনি যে বান্দার আহবানে সাড়া দেন সেটা অসংখ্য বার দেখতে পেয়েছি। যে ভাইবোনেরা আল্লাহর অতিথি হয়ে ঘর ছেড়ে বের হলেন, যে কোন সমস্যায় কেবলমাত্র আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর সাহায্যের আকাঙ্খী হওয়াই যথেষ্ট দেখতে পাবেন। এ পর্যায়ে কোন রকম চেঁচামেচি, ঝগড়া, রাগারাগি, কটুকথা বা অতিথির মর্যাদা ক্ষুন্নকারী কাজ না করে আল্লাহর অতিথি ডাকবেন শুধু আল্লাহকে, সমাধানের জন্য বুদ্ধি, মেধা ও হিকমত কাজে লাগাবেন। তিনিই সমাধানের পথ দেখাবেন। এত কষ্টার্জিত অর্থ, মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় করে ফরয আদায় করতে গিয়ে যেন উল্টো তাঁর অসন্তোষ কিনে ঘরে ফিরতে না হয় সে জন্য হজ্জের সফরে প্রত্যেক ভাইবোনেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বিমান বন্দরে ঢুকেছি রাত বারটায়। এয়ারপোর্টের নানা ফর্মালিটি, চেকিং এসব পালাক্রমে সারতে সারতে রাত প্রায় দু'টা বেজে গেল। সঙ্গে আনা সমস্ত টাকা এবং ডলার ভাঙ্গিয়ে সৌদি রিয়াল কিনে আনলেন মুনযিরের আব্বু। পারিবারিক, শিক্ষামূলক, দ্বীনি ও সামাজিক বিভিন্ন প্রোগ্রামকে সামনে রেখে দূরের সফর করেছি বহুবার। সড়কপথে, পানিপথে কখনোবা আকাশপথে। কিন্তু হজ্জের সফরের পূর্বপ্রস্তুতি, আমেজ-অনুভূতি সব একেবারেই আলাদা। জীবন যাপনের নৈমিত্তিক রুটিন, আরাম-আয়েশ, সন্তান, আত্মীয়-পরিজন বেষ্টিত পরিমন্ডল ছেড়ে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি এক অনন্ত জীবনের পথে যার গন্তব্য জান্নাত ভিন্ন কিছু নয়। মনপ্রাণ ঢেলে সেই চিরায়ত আকাংখা বাস্তবায়নের স্বপ্ন এঁকে চলছি। প্লেনের টিকিট ও বোর্ডিং পাস হাতে, চেকিং, ইমিগ্রেশন সেরে বিমান বন্দরের বহির্গমন যাত্রী লাউঞ্জে নিজকে আবিস্কার করলাম সেই অনন্ত গন্তব্যের জন্য অপেক্ষমান লক্ষ জনতার একজন হিসেবে।

কোলাহলে মুনযির জেগেছে অনেক আগেই। ফাঁকে ফাঁকে তার খেলাধূলা ও খাওয়া-দাওয়া চলছে। সহযাত্রী দ্বীনি বোন নুরুন্নাহার আপার সাথে মুনযির খেলায় মেতে উঠেছে। ঢাকার এক ব্যবসায়ী পরিবারের প্রায় ১৫/১৬ জন যাচ্ছেন আমাদের এ গ্রুপের সাথে। ছোট দুটি মেয়ে, একজনের নাম 'সাফা'; প্রায় বারো বছর বয়েস আর তার বোন 'ফারাহ' সাত কি আট বছর হবে। আমাদের বড় মেয়ে উমামা আর ছোট মেয়ে মুনীরার সমবয়েসী। পড়েও একই ক্লাসে। মুনযির ওদের 'আপা' 'আপা' ডাকছিল আর দূর

থেকে লুকোচুরি খেলছিল। মক্কা মদীনা ঘুরে ঢাকা ফেরা পর্যন্ত মাঝে মাঝেই এই দুই আপাকে খেলার সাথী পেয়ে বেশ খুশি হয়েছিল মুনযির।

১৬ ডিসেম্বর ভোর তিনটে ত্রিশ। প্লেনে উঠলাম আমরা। ভোর রাত চারটেয় গালফের এয়ারক্রাফট ডানা মেলল আকাশে। মাটি থেকে নিঃসম্পর্ক হবার মুহূর্তে পুনরায় সেই অনন্ত পথযাত্রার কথা মনে হচ্ছিল। আল্লাহর খুশীর জন্য, তাঁর অনন্ত পুরস্কারে ভূষিত হবার জন্য সমস্ত পিছুটান ও মায়াকে অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নেবার মাঝেই মুমীনের জীবনের প্রকৃত সফলতা লুকিয়ে আছে। ঘুমন্ত ঢাকা মহানগরীকে অতিক্রম করতে আমাদের মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। প্রাণের গভীর থেকে সিক্ত আকুতি মহান রবের কাছে পেশ করলাম, তিনি যেন এ সফরকে তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। সমস্ত শংকার মেঘ কেটে গিয়ে বিপুল সম্ভাবনা এবং আশার ঝিলিক ঝলমলিয়ে উঠল আমার হৃদয়াভ্যন্তরে।

ট্রানজিট ভ্রমনের বিড়ম্বনা

প্লেন Fly করার শুরুতে আশপাশের কারো কারো কানে ব্যথা, বমিভাব হচ্ছিল, চকলেট জাতীয় কিছু মুখে রাখলে এ সমস্যা কম হয়। অনেককেই অপ্রস্তুত হতে এবং অস্বস্তি প্রকাশ করতে দেখলাম। হাতব্যাগ থেকে চকলেট নিয়ে সহযাত্রী বোনদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। সাথে শিশু থাকায় আমাদের seat plan হয়েছে একেবারে ফ্রন্টে। প্লেন আকাশে উঠে যাবার পর সামনের দেয়ালের সঙ্গে এডজাস্ট করে বেবিকট ফিট করে দিয়ে গেল air hostess. মুনযিরকে শুইয়ে দিলাম। ঘুম এসে গিয়েছিল ওর। আমাদেরও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়েছে। এত ভোরে কখনো breakfast করিনি। মনে হচ্ছে সেহরী খাচ্ছি। গালফের ঐতিহ্যবাহী খাবার--শক্ত ও শুকনো রুটি, কাবাব, স্যুপ, সালাদ, সঙ্গে দুধ আর কফি। খাবার হালাল, কাজেই খেতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বিপত্তি হল অন্য জায়গায়। আমাদের সামনে বিশাল টিভি স্ক্রিনে তখন ভারতীয় ফিল্ম দেখাচ্ছে। গালফের নিজস্ব টিভিতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী। এরা সচরাচর যে ধরনের সংস্কৃতি চর্চা করে থাকে, তাই শো করেছে। সরাসরি হজ্জ ফ্লাইট হলে প্লেনের ভেতরে ইসলামী জীবনাচরণের ছোঁয়া থাকে। কিন্তু এ ধরণের ট্রানজিট ফ্লাইটে ধর্মীয় ভাবানুভূতি তেমন একটা গুরুত্ব পায় না। হজ্জের সফরে এ ধরণের পরিবেশ নিঃসন্দেহে অনাকাংখিত। তবে মুনযিরের আব্বু সমস্যা মুকাবেলায় বেশ উদ্যোগী, সমস্যা মুকাবেলা করেই তো ঈমানের পথ অতিক্রম করতে হয়।

"Excuse me" দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই ঘুরে দাঁড়াল বিমানের এক মহিলা অ্যাটেনডেন্ট। অত্যন্ত বিনীতভাবে মুনযিরের আব্বু বলেছিলেন, "Would you please close this sorts of T.V. program, as we are many hajj pilgrim with you?"

অনেকটা ভাবলেশহীন ভাবেই মহিলা বললেন,

...Sir, this is not hajj flight, and I'm not concern with this T.V. program. It is operated from flight control room."

এরপরের কথোপকথন ছিল এমনঃ Shoaib: Well, this is not hajj flight. I know, I'm tired off and feel uneasy. Would you please tell flight control room about my request?

Attendant: Passengers who are not pilgrim may react.

Shoaib: I'll manage all the passengers, If they react, and I know how to manage. Please tell the control room to stop, please.

Attendant: Ok, Sir, I'll try my level best.

অল্পক্ষণের মধ্যে ওরা সত্যি সত্যি টিভি অফ করে দিল। মজার ব্যাপার হল, যাত্রীদের কেউই এ নিয়ে কোন কথা তুলল না। এখন এক প্রশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে প্লেনের ভেতর। প্রতিটি হজ্জযাত্রীর জন্য এ প্রশান্ত পরিবেশটুকু প্রয়োজন। সামনের স্ক্রিনে এখন লোকাল টাইম, প্লেনের এ্যারাইভাল টাইম দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে ম্যাপে প্লেনের গতিপথ নির্দেশ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ টাইম ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমরা ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে ভারত মহাসাগর ছুঁয়ে উড়ে চলছি। আর কিছু সময় পার হলেই আমরা গালফ এরিয়ায় প্রবেশ করবো।

বাহ্‌রাইনের নিজস্ব বিমান গালফ এয়ার। পারস্য উপসাগর [Persian Gulf], ওমান গালফ ও বাহরাইন গালফ এ তিন উপসাগর তীরবর্তী ছয়টি দেশ গালফ এলাকা হিসাবে সুপরিচিত। "সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত [রাজধানীঃ আবুধাবী] এ ছয়টি দেশ উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোর এক সমন্বিত পরিষদ গড়ে তুলেছে। দেশগুলো একটি একক গোষ্ঠীবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে তারা একই ধরনের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত।" [তথ্য সূত্রঃ উইকিপিডিয়া]

সৌদি আরবে, মক্কা-মদীনাসহ কতক অঞ্চলে ইসলামের সঠিক কৃষ্টি-কালচারকে যথাযথ মর্যাদায় অনুসরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু, গালফ এরিয়ার অন্যান্য স্থানগুলোতে ভিন্ন অবস্থা। শত শত বছর ধরে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকার পর কেন এমন হল? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আরও তথ্য মিলেছে ইন্টারনেট থেকে।

"ভূখন্ডটি খনিজ তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ হওয়ায় এসবের উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনে বিশ্বমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, খনিজ, শ্রম প্রভৃতি সেক্টরে নিজস্ব জনশক্তির অপ্রতুলতা অন্য দেশ থেকে জনশক্তি আমদানীর ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এ কারণে বিশ্বের নানা দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং জর্ডান, মিশরসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ থেকে ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতি নির্বিশেষে ব্যাপক সংখ্যক লোক

এ অঞ্চলে migrate করেছে। তাছাড়া, মার্কিন ও ভারত প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চীন ও ভারত প্রভাবিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ আরবের সংস্কৃতিতে ভিন্ন মাত্রার পরিবর্তন সূচিত করেছে।" [তথ্য সূত্র ঃ ইন্টারনেট]

ঘটনাটি মুসলিম বিশ্বের জন্য সুখকর কিনা সে বিতর্কে না গিয়ে, যে বিষয়টির প্রতি আমাদের গভীর দৃষ্টিপাত করা দরকার সেটি হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করে সামনে এগিয়ে আসা। অবশ্যই কুর'আন-সুন্নাহকে হৃদয়ে ধারণ করে ও কর্মে অনুসরণ করে। এড়িয়ে নয়, উপেক্ষা বা লংঘন করেও নয়।

শংকার মেঘ কেটে স্বস্তি এল

ফযরের ওয়াক্ত হলে দু'জনে পালাক্রমে উযু ও নামায সেরে নিলাম। ঘুমন্ত মুনযিরকে একাকী রেখে দু'জনে একসঙ্গে নামাযের জন্য যাওয়াটা সমীচীন মনে হলো না। আকাশের এ নামায আমাকে মনে করিয়ে দিল এক অনিবার্য সত্য। যেখানেই যাই, যে অবস্থায়ই থাকি আমরা কখনোই আল্লাহর হুকুমের বাইরে নই। মুমিন ব্যক্তি মাটির বুকে যেমন নিজ রব আল্লাহর সামনে অবনত হবেন, আকাশেও তাই। কি স্বদেশে, কি বিদেশে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, যে কোন জনপদেই যান না কেন আনুগত্য থেকে তিনি দূরে সরবেন না। তিনি জানেন যে আল্লাহ সবসময় তাকে দেখেন আর সব জানেন। সফরের কষ্ট লাঘব করতে নামায সংক্ষিপ্ত (কসর) করার সহজতা আল্লাহই ঠিক করে দিয়েছেন। হজ্জের সফরে কোন স্থানেই পনের দিন বা তার বেশী একাধারে থাকার সুযোগ সাধারণতঃ হয়না। কাজেই নামায কসর হয়, ঘর থেকে বেরিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসা পর্যন্তই। এ সহজতার বিষয়টি যার যার ইচ্ছাধীন নয়, এটাই নিয়ম, এটাই সফরের ইবাদাত।

ফযরের নামায আর breakfast সারা হল, টিভি বন্ধ হল, প্রশান্ত পরিবেশে এবার চোখ জুড়ে নেমে এল ঘুম। বিড়ম্বনা পরিনত হল স্বস্তিতে। ঘুম যখন ভাঙ্গল, জানালা দিয়ে দেখি অপরূপ এক টকটকে লাল আকাশ। হাতঘড়িতে বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে আটটা। স্ক্রিনে স্থানীয় সময় দেখাচ্ছে সাড়ে ছ'টা। সূর্য উঠছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। এক পর্যায়ে সব লাল একত্র হয়ে একটা বল তৈরি হয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেন্ডের ভেতরে পিন্ডটি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল। একসময় রঙ বদলে হলদেটে আলোর বিকিরণ শুরু হল। নিচে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল আরব সাগরের আলো-ঝলমলে স্রোতধারা-- কত সভ্যতার উত্থান আর পতনের ইতিহাস বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে! মুনযির গভীর ঘুমে মগ্ন। ওর আব্বুও। এ বিরল দৃশ্য শেয়ার না করে উপভোগ করা কঠিন। ডেকে তুললাম ওর আব্বুকে। তিনিও অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলেন আকাশ ও সাগরের সম্মিলন।

মজার ব্যাপার হল আমরা ছুটছি দক্ষিণ পশ্চিমে, আর সূর্য উঠে আসছে দক্ষিণ পুর্ব কোন্ থেকে পশ্চিমের দিকে। ফলে আমাদের সূর্যোদয় উপভোগের সময়টা ছিল সাধারণের চেয়ে দীর্ঘতম, বলা যায় অসাধারণ। কিছুক্ষণ নিচু স্বরে আমরা কুরআন তিলাওয়াত করে

কাটালাম। প্লেনের প্রায় সব যাত্রীরা ঘুমাচ্ছে। এক সময় দিগন্ত রেখায় সাগরের চিহ্ন মুছে গিয়ে ধূ-ধূ মরুমাটির চিহ্ন দুলে উঠল। বিস্ময়ের চমক উঠল আমার হৃদপিন্ডে। বেশীর ভাগ পথ পেরিয়ে এসেছি! আরব ভূখন্ডের কাছাকাছি!!

কত কঠিন এই মরু। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় পাহাড়ের উঁচু-নিচু ঢেউ তুলে দিক্‌চক্রবাল জুড়ে জেগে আছে বালির ধূসর সাগর। কোথাও বাংলাদেশের মত স্নিগ্ধ সবুজ বন-বনানী বা মাঠ-ঘাট নেই। অথচ এই কঠিন প্রকৃতির কোলেই জন্মেছেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষেরা।

মরুভূমিতে ছোট-বড় পাহাড়ের ঢেউ তুলে জেগে থাকা বালির সাগর। আকাশের উঁচু থেকে ঠিক এমনই দেখায়।

অধিকাংশ নবী-রাসূল জন্মেছেন এই আরব ভূ-খন্ডে। এ জন্যই কি, যেন মরুবাসীরা কোন ওজর বের করতে না পারে? সুজলা সুফলা দেশে নবীরা জন্মালে মরুবাসীরা একথা বলার সুযোগ পেত, '... তোমরা সুজলা-সুফলা দেশে কতনা সুখে আছ, তাই আল্লাহর বিধান সহজে মানতে পার। আমরা মরুর বাসিন্দা। কত কঠিনভাবে জীবন ধারণ করি, কি করে মানবো নবী রাসূলের কথা ....।' ঐশী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠায় নবী-রাসূলদের ত্যাগের কোন তুলনা হয় না।

স্থানীয় সময় সকাল আটটায় আবুধাবী এয়ারপোর্টে নামলাম। এখানে আমাদের ছ'সাত ঘন্টার যাত্রাবিরতি। বাংলাদেশ সময় প্রায় বেলা এগারটা। ঘড়ির কাঁটা প্রায় তিন ঘন্টা পিছিয়ে দিলাম। আমাদের পরবর্তী ফ্লাইট বিকেল তিনটায়। সময়টা কিভাবে কাটাবো দু'জনে ঠিক করে নিলাম। এখানে আমাদের মত হজ্জযাত্রীও রয়েছেন বিভিন্ন দেশের। বেশ কিছু ইহরামের পোষাক পরাও দেখলাম।

মুনযিরকে নিয়ে আমরা দু'জনে এয়ারপোর্ট ঘুরে-ফিরে দেখলাম। সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাজধানী আবুধাবি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। অত্যন্ত ডেকোরেটেড এবং উঁচুমানের স্থাপত্য-শৈলীর নিদর্শন বহন করছে। দোতলায় যাত্রী লাউঞ্জ। গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওপরে দোতলা লাউঞ্জটি বৃত্তাকারে ঘুরে এসেছে এর ফলে গ্রাউন্ড ফ্লোরের মধ্যখানে একটি বৃত্তাকৃতি আঙিনা তৈরি হয়েছে। বৃত্তাকার ভবনের দোতলার পরিধির দিকে সারি বাঁধা Duty free shop, সিঁড়ি, escalator ও প্রশাসনিক কক্ষ। আর কেন্দ্রের দিকে

আঙিনার অংশটুকু বাদ রেখে লাউঞ্জটি নির্মাণ করা হয়েছে। লাউঞ্জের কেন্দ্রের দিকে রেলিং ঘেরা স্থানে দাঁড়ালে বিপরীত দিকটি যেমন দৃষ্টিগোচর হয়, নিচের আঙিনাটিও চোখে পড়ে। কালারফুল ঝাড়বাতি আর লাইটিং দ্বারা সজ্জিত আঙিনাতেও ছোট-বড় দোকান রয়েছে।

সুদূর অতীতে ইসলাম এখানে বিজয়ী আদর্শ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এককালীন শাসকদের একচেটিয়া দুনিয়া-প্রীতি ও আখিরাত-বিমূখতা তাদের ইসলামী মূল্যবোধে ধস নামিয়েছে। এ পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে পরাশক্তিগুলো এখানে প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় হয়েছে। আজো সে ধস রোধ করার মত শক্তি তৈরি হয়নি। আরবীয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির এক মিশেল পরিবেশ এখানে। দীর্ঘ ভ্রমনের পর ছুটোছুটি করায় মুনযির খুব মজা পাচ্ছে। চেনা-অচেনা, দেশী-বিদেশী নানা জনের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছে ওর। আমরা মার্কেট ঘুরে দেখলাম। বিশ্বমানের সব জিনিসপত্রে ঠাসা। দামও তেমনি উঁচু। এখানে বিরাট আকৃতির কাঁচের বোতলে ঐতিহ্যবাহী খোশবুদার আতরের সমারোহ। মনে ধরে রাখার মত সুবাস। ফিরদাউস, আল-উরদ্, মাযমুয়াহ, আমবার, অউদ, মাক্কাহ, দু'য়া আল-জান্নাহ-- নামগুলোও চমৎকার ।

যুহরের নামাযের জন্য একটু খুঁজতেই আমরা মাসজিদ পেয়ে গেলাম। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ভিন্ন কক্ষ। ওজুর ব্যবস্থাও চমৎকার। মুনযিরকে ওর আব্বুর কাছে রেখে নামায আদায় করলাম। আমার শেষ হলে মুনযিরকে নিলাম। উনি গ্রুপের অন্যান্য ভাইদের ডেকে জামায়াতের সাথে নামায পড়লেন। যতই সময় অতিক্রম করছি, শংকার মেঘ কেটে কেটে হৃদয়টা ততই ছুটছে গন্তব্যের দিকে।

সফরে শিশুর পরিচর্যা

দুপুরের খাবার, এজেন্সির পক্ষ থেকেই দেয়া হল। দেশী খাবার। বড়রা খেলাম। মুনযিরকে রুটি, সেদ্ধ ডিম আর ফল খাওয়ালাম। সঙ্গে আনা রুটি থেকে প্রতিবেলায় একটি করে রুটি দিয়ে খাওয়া সেরে নিচ্ছে সে। সাথে সেদ্ধ ডিম, কখনো মুরগির ভুনা গোশ্ত। শিশুর সফরকে সহজতর করে তোলার জন্য কত কায়দা করেই না এসব কিছু নিতে হয়েছে।

আলাদা একটি বেবিফুড ব্যাগ করেছি। ব্যাগটি সবখানে নিজেরা হাতে বহন করেছি, লাগেজে দেইনি। বেবিফুড হওয়াতে চেকিং-এর সময় কোথাও আপত্তি উঠেনি। গোশ্ত ভুনা করে কয়েকদিন আগেই স্টেরাইল করা airtight পাত্রে নিয়ে ডিপফ্রিজে রেখেছি। বাসা থেকে বেরুনোর কিছুক্ষণ আগে বেবীফুড ব্যাগে আলাদা আলাদা প্যাকেটে রুটি, ফল ও ফ্রোজেন ভুনা গোশ্ত ভরে নিয়েছি। সম্পূর্ণ ফ্রোজেন আর airtight থাকায় চব্বিশ ঘন্টার আগে তা নষ্ট হওয়ার কোন কারণই ছিল না। দেড় বছর বয়েসী শিশুর জন্য দুধ ও সেরিয়াল যথেষ্ট হত না। তাছাড়া এসব খাবারের চেয়ে ঘরে তৈরী শিশু উপযোগী খিচুড়ি, নরম রুটি, চিকেন আর ভাত বেশি প্রিয় ছিল তার। প্লেনে ও এয়ারপোর্টে পরিবেশিত খাবারগুলো শক্ত ও মসলাদার হওয়ায় সে খেতেও পারছিল না।

এ অবস্থায় বাচ্চার খাবারের ব্যাপারে আমার পূর্বপ্রস্তুতিটুকু মনে হচ্ছিল আল্লাহর বিরাট এক সাহায্য।

ডাইরেক্ট প্লেনে সফরের চেয়ে ট্রানজিট সফরের সার্বিক প্রস্তুতি বেশ ঝামেলাপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ। মূল গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত লাগেজের দায়-দায়িত্ব বহন করে বিমান কর্তৃপক্ষ। এজন্য ট্রানজিটে বিরতি লম্বা হলেও লাগেজ হাতে পাওয়া যায় না। ট্রানজিট ক'ঘন্টার তার ওপর নির্ভর করে কি ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় বেশী হলে প্রস্তুতির ধরণ এক রকম, কম হলে ভিন্ন হবে। তবে প্লেন delay করলে ট্রানজিটের সময়টা লম্বা হয়। আর প্লেন ডিলে করবে কিনা তাতো আগে থেকে জানা থাকেনা। এক্ষেত্রে অনেকগুলো factor এক সাথে কাজ করে বলে কাউকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। ট্রানজিট মানেই গন্তব্যে পৌঁছার সময়সীমার ব্যাপারে একরকম অনিশ্চয়তা। এজন্য সঙ্গের হাতব্যাগে এক্সট্রা একসেট ড্রেস, বোরকা, স্কার্ফ, তোয়ালে, বেডশীট, জায়নামায, টিস্যু পেপার, জরুরী ঔষধ, শুকনো খাবার, বাচ্চার খাবার, ড্রেস ও প্যাম্পার্স এসব জরুরী জিনিসগুলো নিয়েছিলাম। যদিও দু'টো হাতব্যাগ খুব ভারী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রস্তুতি থাকায় শুধু নিজেরই নয় অন্য বোনদেরও কিছু help করতে পেরেছি। অনেকেরই এ ধরনের প্রস্তুতি না থাকায় যারপর নাই কষ্ট হয়েছে দেখলাম। কষ্ট থেকে রেহাই পেলাম বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। ছোট বাচ্চা নিয়ে বিদেশ সফরে অভ্যস্ত বড়আপা ডাঃ খালেদা নাসরিন মণি, বড়ভাবী নাসরিন হোসেন, মেজভাবী নুসরাত পারভিন অনেক পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের পরামর্শগুলো আমি গুরুত্বের সাথে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়েছি।

অবশ্য অনেকে এভাবে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়ার বিষয়টাকে হালকা করে দেখেন এই ভেবে যে দেশে-বিদেশে সবখানে সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখলাম বিষয়টি অতটা সহজ নয়। বিশেষ করে হজ্জের সফরে ছোট্ট শিশু যখন সঙ্গে থাকে। সব জিনিস পাওয়া গেলেও সবখানেই stop করে কেনাকাটা করার সুযোগ তখন হয়ে উঠে না। ছোট বাচ্চা সাথে থাকলে তা আরোও অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই জরুরী জিনিসগুলো লিষ্ট করে যথাসাধ্য হাতের কাছে রাখাই ভাল। অযথা পেরেশানী থেকে বাঁচা যায় এবং চিন্তামুক্ত মনে পথ চলা হজ্জের এ সফরকে সহজ ও সুন্দরতর করে।

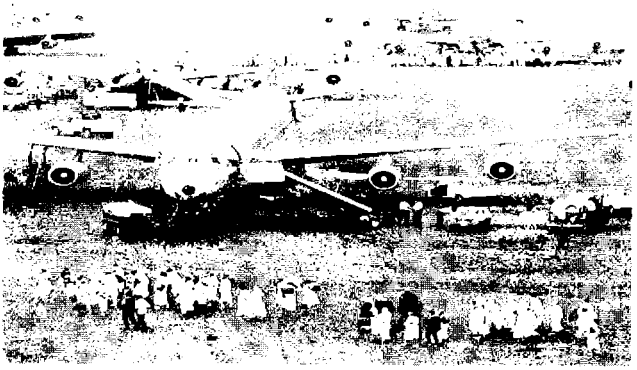

ইহরামের পোষাকে কাবার পথে রওনা হয়েছেন আল্লাহর অতিথিদল।

দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়ে গেল মুনযির। দুটো সিট মুখোমুখি মিলিয়ে বেডশীট বিছিয়ে শুইয়ে রাখলাম। ফ্লাইটের সময় হয়ে এলে ঘুমন্ত মুনযিরকে কোলে তুলে নিলাম। এয়ার বাস পৌঁছে দিল প্লেনের সিঁড়ি গোড়ায়। প্লেন fly করা পর্যন্ত ও ঘুমিয়েই ছিল।

এই প্লেনে অনেক ইহরাম বাঁধা নারী-পুরুষ দেখলাম। মনটা আনচান করছিল। আমরা কবে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হব তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র কাবার পথে! এখনো গুনতে হবে নয়-দশটি রাতদিন।

জেদ্দায় ব্যবস্থাপনা

বিকালের মধ্যভাগে জেদ্দায় পৌছি আমরা। আকাশ মেঘলা থাকায় সন্ধ্যা মনে হচ্ছিল। প্লেনেই 'আসরের নামায পড়েছিলাম। প্লেন থেকে নামতেই প্রশাসনিক ভবনে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়া হল। এখানে চেকিং চলল দফায় দফায়। বডি চেকিং, হ্যান্ড ব্যাগ, ফুড ব্যাগ, পার্স, বেবী ক্যারিয়ার সবকিছু চেক করল। এর আগে আবুধাবী এয়ারপোর্টেও চেকিং হয়েছে কড়াকড়িভাবে। সেখানে অনেকের হ্যান্ডব্যাগে রাখা সিজর, ব্লেড, ছুরি কর্তৃপক্ষকে ফেলে দিতে দেখলাম। আমাদের দেশের অধিকাংশ হজ্জ যাত্রীর প্রথম আকাশে উড়ার অভিজ্ঞতা হয় হজ্জে। তাদের অনেকেরই জানা থাকে না যে, এসব ধারালো জিনিস লাগেজে দেয়া যায়, হাতব্যাগে নয়। আকাশ ভ্রমনের অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকের কাছ থেকে প্লেনে কি নেয়া যাবে, কি যাবে না বিস্তারিত জেনে নেয়া হজ্জ সফরে ইচ্ছুক একজন ব্যক্তির জন্য খুবই জরুরি। তা না হলে বিড়ম্বনা ও লজ্জার শেষ নেই। অনেক ভাইবোনদের এ ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হতে দেখে দুঃখ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

এখানে চেকিংয়ের পর চেকিং, কাগজপত্র আর পাসপোর্ট এ কাউন্টার সে কাউন্টার করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা ছুঁয়ে গেল। এখানকার ঝামেলার কথা এ মুখে ও মুখে শুনেছি। আগেভাগে তাই তৈরি ছিলাম যাতে যে কোন সমস্যা মোকাবেলায় Step নেয়া যায়। বেল্ট থেকে লাগেজ সংগ্রহ করে মদীনাগামী বাসে ঠিকমত উঠালো কিনা সে

তদারকীর ভার পুরোপুরি এজেন্সীর উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক মনে হল না। এজেন্সির গাইড তো দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। গাইড তো সবার লাগেজ চেনেন না তাই ভুল করে অন্যের লাগেজের সাথে বদল হয়ে ভিন্ন গাড়িতে তুলে দেয়ার আশংকা রয়ে যায়। চুরি হওয়া বা চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই, কিন্তু সাময়িক হারিয়ে ফেলাতে যে অন্তহীন হয়রানীর পরিস্থিতি তৈরি হয় তা নিঃসন্দেহে ইবাদাতের পরিবেশকে ব্যাহত করে। অসতর্কতা এবং সুষ্ঠু তদারকীর অভাবে এ ধরনের বিপর্যয়কর ঘটনা বহুবার ঘটতে শুনেছি।

একটানা ভ্রমনের একঘেঁয়েমিতে মুনযির কিছুটা কাবু হলেও অনেককেই সে আপন করে নিয়েছে। সহযাত্রী ভাই-বোনেরাও তাদের সর্বকনিষ্ঠ সঙ্গী মুনযিরের আধো আধো খালা, চাচী, চাচু, মামা, নানা, আপা ডাকে মুগ্ধ, অভিভূত। তাদের পরস্পরের মাঝে ইতিমধ্যে কয়েক দফা চকলেট, বিস্কিট আর হাসি বিনিময় হয়ে গেছে। ওর জন্য আদর-আপ্যায়নের কম্‌তি ছিল না।

জেদ্দা পৌঁছে সফরের ক্লান্তিতে কাতর সহযাত্রীদের অনেকেই। জেদ্দা-মদীনা প্রায় চারশত কিলোমিটার পথ। আট-ন'দিন কাটিয়ে আবার চারশো বিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মক্কা। হজ্জ অনুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রে পৌঁছে তবেই না খানিক স্বস্তি। অবসন্ন বোনদের বললাম, "এখনও তো অনেক পথ বাকি। ভেঙ্গে পড়লে বাকি পথের কী হবে?" বোনেরা হাসলেন। নুরুন্নাহার আপা বললেন, "তুমি শক্ত মেয়ে বলে কথা। তা না হলে কি এ বাচ্চা নিয়ে হজ্জ করার সাহস করতে?"

একটু ভেবে বললাম, "বিষয়টি সাহসের নয়, আল্লাহর হুকুম মানার। এ হুকুম শক্তি ও সামর্থবান নারী-পুরুষ সবার জন্যই।"

এরই মধ্যে মাগরিবের আযান হল। নামাযের জন্য বিছানো কার্পেটে নামায পড়ে নিলাম। এখানে উযু করতে গিয়ে দেখি টয়লেটগুলোতে পরিচ্ছন্নতার সমস্যা প্রকট। বুঝা গেল না ক্লিনারের সংকট, নাকি দায়িত্বশীলতার। জানা থাকলে প্লেন থেকেই উযু সেরে নেয়ার কথা ভাবতাম।

মদীনাগামী বাসের schedule কারো জানা নেই। শুধু বাসের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বলা হল। লাইনে দাঁড়াবার আগে শুকনো খাবার যার যা ছিল খেয়ে নিলাম সবাই মিলে। খাবার পানি খুঁজতেই একজন আফ্রিকান (ভলান্টিয়ার মনে হল) আমাদেরকে "যমযম" লেখা কন্টেইনার দেখালো। বলল, "যমযম ওয়াটার"। আনন্দে অভিভুত হয়ে প্রাণভরে খেলাম, বোতলে ভরে নিলাম। ৪০/৫০ জনের এ গ্রুপে দু'একজন গাইড থাকলেও সুষ্ঠু তদারকীর কাজ, বলা যায় প্রশাসনিক গাইডের কাজ মুনযিরের আব্বুকেই করতে হচ্ছিল। তাঁর উদ্যোগী ভূমিকা থাকায় সঙ্গীরা অনেকেই নির্ভর করছিল। ফলে তার অবস্থা আর কোন দিকে নজর দেয়ার মত ছিল না।

আমি গ্লাস ভর্তি করে সামনে ধরেই বললাম, "যমযম"। বিস্ময় ভরে জিজ্ঞেস করলেন, "কোত্থেকে"? আমরা কেউই আশা করিনি যে এত আগেই "যমযম"পেয়ে যাব।

"Jamjam water" লেখা কন্টেইনারের দিকে ইংগিত করতেই কালক্ষেপণ না করে উনি দু'য়া করতে শুরু করলেন। তিন ঢোকে শেষ হল পানিটুকু। পরে জেনেছিলাম, যমযমের পানি পানের আগে আমাদের দু'জনের দু'য়া ছিল একই "আল্লাহপাক যেন সহজতর করে দেন ছোট্ট শিশু নিয়ে হজ্জের এ সফর।"

পানি পানের পর মনে হল যেন পথের সকল ক্লান্তি পেছনে ফেলে নুতন সতেজতা নিয়ে আমরা সামনে চলছি। সহযাত্রী যাকে যাকে কাছে পেয়েছি, এ পানির সন্ধান দিতে ভুলিনি। আল্লাহর রহমতে জেদ্দা বিমান বন্দরের সমস্ত কাজ স্বস্তির সাথে, অল্প সময়ে সমাধা হয়ে গেল। লাগেজ সংগ্রহ করে ট্রলি করে বাসে তোলার জন্য পাঠানো, মুয়াল্লিমের প্রতিনিধির বারংবার গণনা, বাসের জন্য লাইন ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর, তবে কোনটাই খুব অসহনীয় মনে হয়নি। দীর্ঘ সময় ক্ষেপণের অভিযোগে কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বকাবকি করা লোকও চোখে পড়েছে যদিও তা হজ্জযাত্রীর জন্য শোভনীয় নয়। লাখ লাখ লোকের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। প্রায় তিন ঘন্টা ধৈর্যের পরীক্ষা দেয়ার পর মুয়াল্লিমের বাসের দেখা মিলল। অনেক সময় মুয়াল্লিমের বাস মিলতে ১০/১২ ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণতঃ গ্রুপ ছোট হলে এ সমস্যা হয়। বড় গ্রুপের হজ্জযাত্রী সংখ্যায় বেশী থাকায় বাস ভরে যায় এবং তাড়াতাড়ি ছাড়ে। মদীনাগামী বাসে উঠার প্রাক্কালে আমাদের পাসপোর্ট মুয়াল্লিমের লোক এসে জমা নিয়ে নেন। মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলাম রাত নয়টায়। মদীনায় শীত বেশী শুনেছিলাম। সে অনুযায়ী হাতব্যাগে শীতের কাপড় নিয়েছিলাম। বিশাল লাক্সারী কোচ যাত্রীতে টইটম্বুর। শীত প্রথমটায় তেমন বুঝা যাচ্ছিল না। আমাদের গ্রুপের আরবী জানা লোকেরা ড্রাইভারের কাছ থেকে গন্তব্যে পৌঁছার সম্ভাব্য সময় জেনে নিলেন। শুনলাম মদীনা পৌঁছাতে সকাল ৪/৫ টা বেজে যেতে পারে।

প্রিয় নবীর শহরে

আমাদের প্রিয়নবী(সঃ) জীবনে একবারই হজ্জ করেছেন আর তা ছিল বিদায় হজ্জ। মদীনা হতে যাত্রা করেছিলেন বিদায় হজ্জের। আমরাও আমাদের হজ্জের সফর মদীনা হতে শুরু করার কথা চিন্তা করেছিলাম। মদীনা সফর হজ্জের কোন অংশ নয়। তাহলে কেনো সেখানে যাব? এর জবাব খুঁজতে গিয়ে এ বিষয়ে কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষাগুলো সামনে রেখেছি। মদীনার পথে চলতে গিয়ে যে প্রেরণা কাজ করেছিল তার মধ্যে সহীহ হাদীসের নিম্নোক্ত মতগুলো গুরুত্বের দাবী রাখে।

১. "তিনটি মাসজিদ ব্যতিত বরকতের আশায় অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফর করা যাবে না। সেগুলো হল ঃ মাসজিদে হারাম, মাসজিদে নববী ও বায়তুল মুকাদ্দাস।" [সহীহ আল বুখারী ঃ ১১৮৯, সহীহ মুসলিমঃ ১৩৯৭]

২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, "আমার এ মাসজিদে এক ওয়াক্তের নামায অন্য মাসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম, শুধু মাসজিদে হারাম ব্যতিত।" [সহীহ আল বুখারীঃ ১১৯০, সহীহ মুসলিমঃ ১৩৯৫]।

নবী (সঃ)এর মাতৃভূমি মক্কা হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি হিযরাত করেছেন মদীনায়। এখান থেকেই ইসলামী সভ্যতা সুবাতাস ছড়িয়েছে চতুর্দিকে। পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এখানেই। রাসূল (সঃ) এর গোটা জীবনের সংগ্রামী অধ্যায়গুলো কেটেছে এখানে। মাসজিদে নববী ইসলামী রাষ্ট্রের সচিবালয়ের ভূমিকা পালন করেছে। কুর'আন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত মদীনা সফরের যথার্থতা ফুটিয়ে তুলেছেঃ

"যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটাই তোমার সালাতের অধিক যোগ্য। তথায় এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।" [সূরা তাওবাঃ ১০৮] "প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর" –'মাসজিদে নববী' ও মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত 'মাসজিদে কুবা' উভয় মাসজিদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।

মাসজিদে নববীর একাংশ ঃ

আল্লাহর রাসূল (সঃ)-ও সাহাবায়ে কিরামের ত্যাগের ইতিহাস মিশে আছে যে মদীনায়।

হজ্জ করার জন্য দেশের পর দেশ, নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত আর মরুভূমি পেরিয়ে পৃথিবীর দূর-দুরান্তের মানুষ আরবে আসেন। আকাশপথ দুরান্তের এ সফরকে সুগম ও সহজতর করেছে। মক্কা-মদীনার দূরত্ব প্রায় চারশো বিশ কিলোমিটার। হজ্জের জন্য যিনি মক্কা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পেলেন, তিনি মদীনা সফরের সুযোগটুকু কেন ছেড়ে দেবেন? এ যেন এক আনুগত্য ও ভালবাসার পথ পরিক্রমা। রাসূলের অনুগামী উম্মাতের জন্য ইসলামী জীবন গড়ার এক উদাত্ত আহবান। রাসূলের কর্মমূখর মদীনায়

পরিভ্রমন করা, যেন তাঁর কর্মজীবনের স্মৃতিগুলোকে অনুভব করা। যেন তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহর মনোনীত হয়ে উঠার প্রাণপণ প্রচেষ্টা।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ) মুসলিম উম্মাহর প্রিয় নবী, মানবতার জন্য আদর্শ নেতা ও রাসূল। প্রিয় নবীর প্রিয় শহরই মদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর। নবী (সঃ) বলেছেন, "হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে পবিত্র (হারাম) বলে ঘোষণা করেছেন। আর আমি এ দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান (মদীনা) কে পবিত্র বা হারাম বলে ঘোষণা করছি।" [সহীহ আল বুখারীঃ ২১২৯, মুসলিমঃ ১৩৬০]।

রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের হিযরত, ত্যাগ ও কুরবানীর ইতিহাস মিশে আছে মদীনার ধুলিকণায়। মানব কল্যাণের পরিপূর্ণতা দানকারী কুরআনের প্রায় অর্ধাংশ নাযিল হয়েছে মদীনায়। কুরআনের জীবন্ত রূপ মদীনাতেই পল্লবিত হয়েছিল। হজ্জে এসে সেই মদীনায় আসতে পারা অবশ্যই আনন্দের ও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

তীব্র বেগে বাস ছুটেছে মদীনার পথে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গছে। ক্লান্তিতে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল। দু'তিন ঘন্টা কিছুই মনে নেই। মাঝে মাঝে ঝিমুনী, কিছুক্ষণ সজাগ

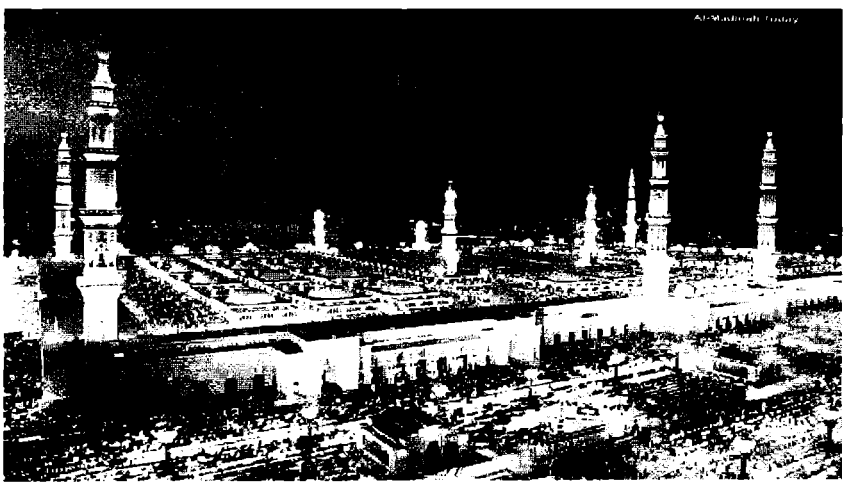

মাসজিদে নববীর বিস্তৃতি।

থেকে আবার ঘুম--এভাবে কাটল রাত তিনটে পর্যন্ত। একটা রেষ্টুরেন্টের সামনে বাস থামলো মিনিট পনেরোর জন্য। শীতের তীব্র প্রকোপ এখানে টের পেলাম। অনেকেই নেমে চা-নাস্তা বা টয়লেট যা প্রয়োজন সেরে নিলেন। আবার শুরু হল চলা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে খেজুর বাগান, কাঁটাঝোপ, কখনোবা দালান-কোঠা। আরোও ঘন্টা খানেক চলার পর শুনলাম মদীনার খুব কাছে এসে পড়েছি।

ভোর পাঁচটা ছুঁই ছুঁই। আমরা মদীনা শহরের ভেতর প্রবেশ করলাম। তখনও বেশ অন্ধকার। দলে দলে মানুষ ফযরের নামাযের জন্য যাচ্ছে। এত ভোরে মানুষের এমন বাঁধভাঙ্গা মিছিল দেখে অবাক লাগছিল। জনস্রোতকে সুযোগ দিতে গিয়ে আমাদের বাস থেমে থেমে আগাচ্ছিল। এক সময় মসজিদে নববীর গোটা অবয়ব ঝলমলিয়ে দুলে উঠল আমার দৃষ্টিসীমায়। মনে মনে রাসূলের আদর্শকে স্মরণ করে দরুদ ও সালাম পেশ করলাম। কারণ রাসূলের প্রতি দরুদ প্রেরণ করা আল্লাহর নির্দেশঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমীনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দু'য়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।"[সূরা আহযাব:৫৬] (পাঠক, দয়া করে এখানে দরুদ পড়ুন।)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করোনা এবং তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবস্থলে পরিণত করোনা। তোমরা আমার উপর দরুদ (অর্থ রহমত, দু'য়া) পাঠ কর। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে।" [আবু দাউদ, হাদীস নং-১৭৪৬]

রাসূল (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালার বিচরণকারী কিছু ফিরিশতা রয়েছেন, যারা আমার উম্মাতের সালাম আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেন।" [নাসায়ী শরীফ ঃ ১২৬৫]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মনে পড়ামাত্রই আমরা দরুদ পাঠ করতে পারি-যে কোন স্থানে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়। বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে কুরআনে ও সহীহ হাদীসে। সুতরাং এর সাথে নতুন বা অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করা বিদ্য়াতের পর্যায়ে পড়ে যায় কিনা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। হজ্জে সফরকারী ভাইবোনেরা যাতে বিদ্য়াতে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি।

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, মদীনার হারামের সীমা 'আইর' হতে 'সউর' পর্বত পর্যন্ত। যে ব্যক্তি সেখানে দ্বীনের নামে নতুন কিছু আমদানি করবে বা বিদ্য়াতীকে স্থান দেবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামাতে তার ফারয বা নাফল কোন আমলই আল্লাহ কবুল করবেন না। [সহীহ বুখারীঃ ১৮৭০, সহীহ মুসলিম ঃ ১৩৭০]

মদীনায় প্রবেশকালে, সবুজ গম্বুজ দর্শনমাত্র বা এখানকার গাছপালার প্রতি নজর পড়ামাত্র দরুদ ও সালাম পড়তে হবে এরকম কোন আদর্শ সাহাবায়ে কিরামের জীবনে নেই। অনেকে একান্ত আবেগতাড়িত হয়ে এরকম করতে বলেন, কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে এক অস্বচ্ছ ধারণা অংকুরিত হয়। রাসূলের প্রতি দরুদ প্রেরণের কোন স্থান, কাল নির্দিষ্ট করা হয়নি বা কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতেও তা করতে বলা হয়নি। আমাদের দেশে যেভাবে মিলাদ মাহফিল করে দরুদ পাঠের রেওয়াজ চালু হয়েছে সাহাবায়ে কিরামগণ এরকম করেননি। এখনও পর্যন্ত মক্কা মদীনার কোথাও এরকম

রেওয়াজ নেই। এ জন্য মদীনায় প্রবেশকালে সমস্বরে জোরে জোরে দরুদ পাঠ না করে মনে মনে বা মৃদুস্বরে দরুদ পড়াই নিরাপদ। মক্কার মত মদীনাও হারাম বা পবিত্র। কাজেই মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের আগে থেকেই উভয় স্থানের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে জেনে নেয়া দরকার। যাতে মানুষের অজ্ঞতায়, অসতর্কতায় বা অবচেতনেও কোন বেআদবী বা গুনাহের কাজ এখানে হয়ে না যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, "মদীনা হারাম। যে এখানে কোন দুস্কর্ম করল অথবা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দিল, তার উপর আল্লাহ তায়ালা, ফিরিশতা এবং সকল মানুষের লানত। কিয়ামাতের দিন তার ফারয-নাফল কিছুই গ্রহণযোগ্য হবেনা।" [সহীহ বুখারীঃ ১৭৩৭]

সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুসারে দেখা গেছে, হারাম এলাকায় কোন প্রাণী শিকার করা, হত্যা করা, পড়ে থাকা বস্তু সরিয়ে নেয়া, গাছ কর্তন করা- এসবই হারাম। কাজেই মক্কা-মদীনার প্রতিটি পদচারণা যেন কল্যাণ অর্জনকারী হয় বারবার সে দু'য়া করছিলাম। সেই সাথে স্মরণ করছিলাম রাসূলের জীবনের কথা, সাহাবাদের কথা। সাহাবায়ে কিরাম যে গভীর আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে দ্বীন ইসলামের বিজয়ে অবদান রেখেছেন সে ইতিহাস মনে করে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল।

ভোর পাঁচটা বেজে বিশ। এক আবাসিক হোটেলের সামনে বাস থামলো। লাগেজ বুঝে নিয়ে হোটেলের নির্দিষ্ট রুমে তুলতে প্রায় পনের মিনিট সময় লেগে গেল। মুনযিরের আব্বু মাসজিদে নববীর দিকে ছুটলেন। আমি রুমে নামায পড়ে নিলাম। ইতোমধ্যে মুনযির সজাগ হয়েছে। বড় বড় চোখে তাকাচ্ছে চারিদিকে। ধুলিমলিন দেখাচ্ছে ওকে। এটাচড্ বাথরুমে গরম পানির ব্যবস্থা আছে। ওকে গোসল করিয়ে ড্রেস-আপ করাতেই ফিরলেন ওর আব্বু। ওকে সাথে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। এ সুযোগে গোসল সেরে নিলাম। দু-দিনের জার্নিতে ময়লা কাপড়গুলো ধুয়ে বেরুতেই দেখি মুনযিরের আব্বু সকালের নাস্তা নিয়ে আমার অপেক্ষায়।

জান্নাতের টুকরোর খোঁজে

মাসজিদে নববী বাসার একেবারে কাছে। মুনযির ওর বাবার কোলে চড়ে, আমরা পায়ে হেঁটে মাত্র ৩/৪ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম। সকালের উজ্জ্বল রোদে ধোয়া উঁচু উঁচু মিনার আর সবুজ গম্বুজে সুসজ্জিত প্রিয় রাসূলের স্মৃতি বিজড়িত মাসজিদে নববী।

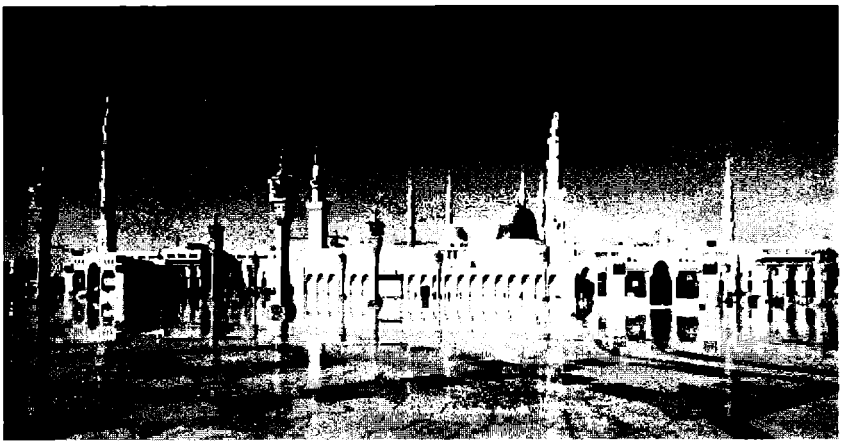

মাসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিক

মদীনায় হিযরত করে আসার পর তিনি প্রথম মাসজিদে কুবা, এরপর মাসজিদে নববী নির্মাণ করেন। সাহল এবং সুহাইল দুই এতিম বালকের নিকট থেকে ক্রয় করা জমির উপর নির্মিত সেদিনকার খেজুর গাছের খুঁটি, পাথুরে দেয়াল আর খেজুর পাতায় ছাওয়া গৃহটি কালে কালে উত্তরণের ধারা অতিক্রম করে আজ দাঁড়িয়ে আছে মহিমান্বিত স্থাপত্য সৌন্দর্য ও অনুপম নির্মাণশৈলী বুকে নিয়ে। মাসজিদের ভেতরে, ছাদে ও আঙিনায় প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষের বেশী লোকের নামাযের স্থান-সংকুলান হয়। সবুজ গম্বুজের নিচে সমাহিত রয়েছেন স্বয়ং প্রিয় নবী (সঃ)। তাঁর রওজা ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানকে জান্নাতের একটি টুকরো বলা হয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেছেন,

"আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যস্থলটি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি। আর আমার মিম্বার হাউজে কাউসারের উপরে হবে।" [সহীহ আল বুখারীঃ ১৮৮৮, সহীহ মুসলিমঃ১৩৯১]

দুনিয়ার এ উত্তাল জীবনে অবস্থান করে জান্নাতের এ বাগানে খানিক সময় কাটিয়ে নামায আদায় করা, আল্লাহর কাছে দু'য়া করা মুমীন প্রাণের এক প্রশান্তিময় চাওয়া। সৌন্দর্য ও শিল্প সৌকর্য যত উঁচু মাত্রারই হোক না কেন, সেটা মুমীনের হৃদয়কে যতটা কাড়ে তার চেয়ে বেশি সে অনুভব করে প্রিয় রাসূলের প্রতি ভালবাসার টান। সেই টান আমাকে আকৃষ্ট করতে থাকল মাসজিদে নববীর ভেতরে। যেখানে রাসূল (সঃ), সাহাবায়ে কিরাম এবং উম্মুল মুমিনীনরা নামায আদায় করেছেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টা সাধনায় তৎপর থেকেছেন।

মাসজিদের ভেতরে ঢোকার অনেকগুলো গেট। একদিকে দেখলাম দলে দলে মহিলারা প্রবেশ করছেন। মেয়েদের জন্য আলাদা গেট। সেদিকে এগুতে থাকলাম। মুনযিরকে আমার কাছে দিয়ে ওর আব্বু পুরুষদের গেটের দিকে গেলেন। যে স্থান হতে আলাদা

হয়েছিলাম, কথা হল দু'জনেই এখানে পিলারের পাশে এসে একত্রিত হব- বেলা এগারটার মধ্যে। আমার কোলে মুনযির, একহাতে ওর খাবারের ব্যাগ, কাঁধের ব্যাগে জায়নামায়, চাদর, জরুরী কাগজপত্র। সঙ্গে আরো দু'জন পরিচিত সহযাত্রী বোন ছিলেন। একজন স্কুল-শিক্ষিকা, অন্যজন কলেজ শিক্ষিকা। ভেতরে ঢোকার কোন এক পর্যায়ে এ দুই বোন কখন যে আমার আড়ালে চলে গেলেন, ভীড়ের মাঝে হারিয়ে গেলেন টেরও পাইনি। ভেতরে ততদূর গেলাম, যার পরে আর এগুবার জো নেই। নানা দেশ, বর্ণ, আকৃতি, বয়স ও চেহারার নারীদের মেলা। কেউ নামায, কেউ কুরআন তিলাওয়াত, কেউ তাসবীহ্ পড়ছেন। চাদর আর জায়নামায বিছিয়ে পেছনে আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। মুনযির বসে রইল পাশে।

দু'রাকাত দুখুলুল মাসজিদ নামায সেরে পেছন ফিরেছি। ততক্ষণে আমার পেছনে সারি সারি নামাযের কাতার দাঁড়িয়ে গেছে। দরজা দিয়ে অবিরত স্রোতের মত মহিলারা প্রবেশ করছেন। মাত্র মিনিট দশেকের ব্যবধানে মহিলাদের উপচে পড়া ভীড় দেখে আমি বিস্ময়বোধ করছিলাম। কাঁধে ব্যাগ ও কোলে মুনযির সমেত এ ভীড় ঠেলে বের হয়ে আসা এখন আমার সাধ্যের বাইরে। স্রোতের বিপরীতে চলার মত। ধাক্কাধাক্কি করে অন্যকে কষ্ট দিয়ে যাওয়া তো ঠিক হবেনা। পেছনে ফেরার পথ বলা যায় বন্ধ। মাত্র সকাল সাড়ে দশটা। বারটায় সালাতুল যুহর। যে যত আগে পারছে নামাযের জন্য হাজির হয়ে যাচ্ছে। কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ থেকে জানলাম, রিয়াদুল জান্নাহ-তে ঢোকার মহিলা অঞ্চলের ফটক এখন বন্ধ; বাদ যুহর ঘন্টাখানেক সময়ের জন্য খুলবে। সুতরাং রিয়াদুল জান্নাহ-র খোঁজ করার সময় আরো পরে আসছে।

সময় যাচ্ছে আর ভীড় বাড়ছে। আমার অবস্থান মুনযিরের আব্বুকে জানাতে পারলেও তিনি অন্তঃত নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। অথচ যোগাযোগের কোন পথ নেই। মোবাইল ফোনে এখানকার সিম ভরা হয়নি এখনও। প্রথম পদক্ষেপেই এভাবে commitment miss হওয়ায় চারিদিক থেকে চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরল। হজ্জের সফরে বেরিয়েছি, অতএব সবরের সাথে পথ-চলাকেই আমার সাথী বানাতে হবে-এ দৃঢ় মনোবল আমাকে সিদ্ধান্ত দিল, "সবদিকে পথ বন্ধ, একটি শুধু খোলা। সেটি হল, জামায়াতের সাথে সালাতুল যুহর আদায় কর। এরপর শান্তভাবে বেরিয়ে পড় স্রোতের সাথে। পূর্ব নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াও। মিলে যাবে সঙ্গী।"

তা-ই হল। সালাতুল যুহর শেষ। ভিড়ের মধ্যে পিঁপড়ার গতিতে না চলে উপায় নেই। মূল গেটের কাছে পৌঁছাতেই একটা বেজে গেল। মাথার উপর গণগনে সূর্য। কোন্ পিলারের কাছে দাঁড়াব সেটি ঠিক করে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন বেখেয়ালে পিলার নাম্বারও জেনে নেইনি। মনে হয়েছিল খুঁজে পাব কিন্তু এখন দ্বিধাগ্রস্থ। কয়েকবার এ পিলার থেকে ও পিলার হাঁটাহাঁটি করলাম। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। এমনও হতে পারে পিলার পেয়েছি কিন্তু লোকজনের ভিড়ে মুনযিরের আব্বুকে পাচ্ছি না। এ-ও বিচিত্র নয় যে, সময়মত আমাকে না পেয়ে উনি নিজেই খুঁজছেন। আসলে ঠিক কী ঘটেছিল তখন বুঝতে পারিনি।

যতক্ষণ না ক্লান্তিবোধ করলাম ওই এরিয়ার ভেতর খুঁজলাম মুনযিরের আব্বুকে। এক সময় মুনযির অস্বস্তি প্রকাশ করতে শুরু করলে আন্ডারগ্রাউন্ড কার-পার্কিং এর উপরের একতলা ভবনের ছায়ায় বসে পড়লাম। সেখানে অনেক দেশের মহিলারা। কেউ বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউ লাঞ্চ করছে। মুনযিরকে ওর খাবার খাইয়ে শান্ত করলাম। খানিক পর আমার কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে গেল সে। ছায়ায় বসে হালকা ঝিমুনীতে আমারও কিছুটা ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। হজ্জ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা এ মুহূর্তে সবচাইতে বড় চাওয়া হয়ে হৃদয় তোলপাড় করে উঠল। আল্লাহপাক যেন আমার উদ্ভূত সমস্যার সহজ সমাধান দেন দু'য়া করতে থাকলাম। বাসার ঠিকানা লেখা কার্ড সাথে আছে; আশাকরি বাসা চিনে বের করতে পারব। রিয়াদুল জান্নাহ-র খোঁজ আজ পাইনি, কাল-পরশু পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ। কিন্তু আমার সফরসঙ্গী কোথায়? যাকে ছাড়া হজ্জের যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে আমি শরয়ীভাবে অপারগ। কোথায় খুঁজবো তাকে?

দু'য়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে থাকলাম সময়। চতুর্দিকে, বিশেষ করে প্রধান ফটকের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখলাম উনাকে বা চেনাজানা কাউকে পেলে যাতে সাহায্য নিতে পারি। এভাবে ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেল। হঠাৎ চোখে পড়ল, হেঁটে যাচ্ছে চেনামুখের একটি দল। আমাদের সাথে আসা মুনযিরের আব্বুর অনেক সিনিয়র এক ফ্রেন্ড সানাউল্লাহ ভাই, সঙ্গে আমাদের সহযাত্রী একজন ডাক্তার ভদ্রলোক, তার স্ত্রী এবং আরো ক'জনা বাসার দিকে যাচ্ছেন। দ্রুত গতিতে প্রায় দশ পনের গজ হেঁটে গিয়ে তাদের থামালাম। বললাম, আমি মুনযিরের আব্বুকে খুঁজে না পেয়ে তার অপেক্ষায়। শুনে সানাউল্লাহ ভাই বলেন, "ভাবী, আমি শোয়েবকে খুঁজতে যাচ্ছি আপনি বরং বাসায় যান।"

আলহামদুলিল্লাহ। আমি বাসায় ফেরার ত্রিশ মিনিটের মাথায় ফিরলেন মুনযিরের আব্বু। পরে যখন মদীনার দুঃখ-কষ্ট বিষয়ক হাদীসটি খুঁজে পেয়েছিলাম, তখন মনে হল সেদিনের সেই কষ্টটা যথার্থই, কল্যাণকর ছিল। হাদীসটি এরকম,সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি মদীনায় দুঃখ কষ্টে সবর করবে, আমি কিয়ামাতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করব।" [সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং ১৩৬৩]

কষ্ট না এলে সবরের পরীক্ষাও হয় না, সতর্কতাও আসে না। এ ঘটনা-পরবর্তী প্রত্যেকটি স্থানে সনাক্তকরণ চিহ্নের ব্যাপারে সতর্ক থেকেছি। এ ধরনের ঘটনার পূনরাবৃত্তি আর হয়নি একবারও।

বাসায় দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিলাম। এরপর মাসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তিনটেয় সালাতুল 'আসর। 'আসর ও মাগরিবের নামাযের মাঝে আমরা মাসজিদে নববীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে দেখলাম। মাসজিদের পূর্ব দিকে জান্নাতুল বাকী, এখানে শায়িত রয়েছেন আহলে বাইত ও উম্মুল মুমিনীনসহ নবীজির দশ হাজার সাহাবা এবং অসংখ্য মুমীন নর-নারী। অপর তিনদিক ঘিরে আছে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, আবাসিক হোটেল এবং শপিংমল। মাসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে সবুজ

গম্বুজের নিচে রাসূল (সঃ) এর কবর যার ঠিক পাশেই রিয়াদুল জান্নাহ বা জান্নাতের টুকরা রয়েছে।

পুরুষদের যিয়ারাতের জন্য দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে আলাদা গেট আছে। মহিলাদের রওজায় ঢোকার গেটটি উত্তরদিকে। লোকজন একদিকের দরজা দিয়ে ঢুকছে, অন্যদিক দিয়ে বেরুচ্ছে। ঢোকার গেটে অনেক লম্বা ক্যিউ। এত লোক যে শেষ হবার আগেই পরবর্তী নামাযের সময় হয়ে যাবে। এ অবস্থা দেখে মুনযিরের আব্বু যিয়ারাতের জন্য তখন আর গেলেন না। আমরা নামায সেরে বাসায় চলে এলাম।

রওজাতুম মিন রিয়াদুল জান্নাহ-তে

মুনযিরের আব্বু পরদিন ভোরে মাসজিদে নববীতে ফযরের নামায সেরে নবী (সঃ)এর কবর যিয়ারাত করে, রিয়াদুল জান্নাহ হয়ে বাসায় এলেন। আমাকে বললেন, "যেতে চাইলে প্রস্তুতি ভালভাবেই নাও।" কারণ হজ্জ উপলক্ষে প্রতিনিয়ত মানুষের ভিড় যেমন বাড়ছে তেমনি রওজা ও রিয়াদুল জান্নাহ-তে যাবার জন্য মানুষের ব্যাকুলতা ও প্রতিযোগিতাও সে হারেই বাড়ছে। অন্যকে যাতে কষ্ট না দিয়ে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারি সেজন্য নিজেকে তৈরী করে নিলাম। মুনযিরের খাওয়া দাওয়া সেরে ওকে ওর আব্বুর কাছে রেখে আবার চেষ্টা করলাম।

মাসজিদের ভেতরে মহিলা অঞ্চলের পুরোটা পেরিয়ে শেষ প্রান্ত এসে যেখানে মিলেছে সেখানে বড় বড় কয়েকটি কাঠের দরজা। এ দরজার ওপাশে নবীজির ওফাতের ঘর এবং রওজাতুম মিন রিয়াদুল জান্নাহকে সুসংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। সময়মত এ দরজা খুলে দিলে যাওয়া যাবে কাঙ্খিত সেই জান্নাতের টুকরা--রওজাতুম মিন রিয়াদুল জান্নাহ-এ। শতশত মহিলা এখানে অপেক্ষারত। আমিও তাদের মাঝে শামিল হলাম। ঘন্টাখানেক সময় পরে দরজা খুলল। কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক ভাবেই ঢুকছেন মহিলারা। এখানে কোন পুরুষের চলাচল নেই আমিও নিশ্চিন্তে মহিলাদের স্রোতে মিশে গেলাম। কয়েক মিনিট হাঁটার পর দেখলাম কাছে, একেবারে সামনে রাসূল (সঃ) এর ঘর যেখানে তিনি সমাহিত রয়েছেন।

সবুজ গম্বুজের নিচে এখানেই সমাহিত রয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর প্রিয় দুই সাথী।

দেখে মনে হল কত চেনা কত জানা এ ঘর। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) এর ঘর। রাসূল (সঃ) এর বাসগৃহ এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর কবরও এখানেই। সম্মানিত সাহাবা মুসলিম বিশ্বের খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) শায়িত তাঁর পাশে।
এখানে এসে আবেগের আধিক্যে শিরক ও বিদয়াতে লিপ্ত হবার আশংকা খুবই বেশি। অথচ স্বয়ং রাসূল (সঃ) বলেছেন, "আমার কবরকে ইবাদাত বা উৎসবের স্থান বানিও না।" [আবু দাউদঃ ১৪৭৬]
সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেককেই এখানে রাসূলকে ডেকে দু'য়া করতে এবং কবর সামনে রেখে সেজদার ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম। বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। মহিলা পুলিশ এ ব্যাপারে তৎপর দেখলাম। বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণে তারা বলছেন, "হারাম। হারাম। কুদ্দাম কুদ্দাম।"--নিষিদ্ধ, হারাম-- সামনে চলুন।

মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রবল হয়ে উঠলেও প্রকৃত জ্ঞানী ও মুমীন ব্যক্তি আল্লাহর কথা স্মরণে রাখেন এবং নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে শিরক ও বিদ্য়াত মুক্ত থাকেন। কিন্তু যারা ভক্তি প্রকাশের জন্য সিজদা, মৃতের কাছে দু'য়া করা বা ঐ ধরণের মাধ্যম অবলম্বন করেন তারা নিজ মনের ইচ্ছে পূরণ করেন মাত্র। অথচ ইসলাম আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূল (সঃ) কে অনুসরণের নাম- নিজের খুশীমত চলা ইসলাম নয়।
মহান আল্লাহর বাণী, "আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।" [সূরা আল-ইমরানঃ ৩১]
আল্লাহর ভালবাসা পেতে যার ইচ্ছে করে তিনি রাসূলের অনুসরণ করেই জীবন যাপন করবেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর প্রতি ভক্তি নিবেদনের কোন কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া শেখাননি। তিনি আল্লাহকে ভালবাসতে এবং রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আর এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল (সঃ) এর জন্য যথোপযুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ। আমাদের নাগালেই রয়েছে কুরআন, যাতে তাঁর জীবনকে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাতে কোন রহস্যের ঘেরাটোপ নেই, সন্দেহ বা অবিশ্বাসের দোলাচলও নেই। রাসূলের আদর্শ ও নেতৃত্ব মানার জন্য প্রয়োজন একটি উন্মুক্ত হৃদয়, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিশ্বাসে তাজা প্রাণ। এখানে দরুদ ও সালাম পেশ করলাম।

রওজাতুম মিন রিয়াদুল জান্নাহ বা 'জান্নাতের টুকরো'।

নবীজির কবর বাঁয়ে রেখে কয়েক কদম সামনে এগিয়ে যেতেই খুঁজে পেলাম অনেক স্বপ্নের, অনেক আকাংখার সেই রিয়াদুল জান্নাহ, যাকে আমি খুঁজেছি নিজেকে হারিয়ে। "রওজাতুম মিন রিয়াদুল জান্নাহ" অর্থ জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বা জান্নাতের টুকরো। এই স্থানটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার করুণা বর্ষণ ও মানুষের কল্যাণ অর্জনের দিক থেকে জান্নাতের বাগান তুল্য কেননা, সেখানে সর্বদা আল্লাহ পাকের স্মরণ হতে থাকে। এ অংশটি প্রায় ৫৩ গজ দীর্ঘ। এলাকাটি বিশেষভাবে সংরক্ষিত।

মাসজিদে নববীর সবখানে লালচে মেরুন রঙের কার্পেট। কেবল রিয়াদুল জান্নাহ-য় বর্তমানে সবুজাভ সাদা কার্পেট, যা দেখে স্থানটি চিনে নিতে বেগ পেতে হয়না।

সবুজাভ সাদা কার্পেট বিছিয়ে স্থানটি চিহ্নিত করা আছে। সালাত ও দু'য়া করার আবেগ যত খুশি উৎসারণ করা যায় এখানে। আল্লাহ এমনই সত্ত্বা, যিনি চাইলেই খুশি হন এবং চাওয়া পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন। বিদ্‌য়াত ও সুন্নাত, স্থানগত দুরত্ব মাত্র কয়েক হাত। অথচ পরিনামের দিক থেকে উভয়ের দূরত্ব অনেক অনেক যোজন। রিয়াদুল জান্নাহ'র

একটা অংশ মহিলাদের জন্য পর্দা টানিয়ে দেয়া আছে। পর্দার উপরের দিকে নবী(সঃ) এর মিম্বারের ঊর্ধাংশটুকু দেখতে পেলাম। এখানে নবী (সঃ) এর মিহরাব যথাস্থানেই রয়েছে, যেখানে তিনি দাঁড়াতেন।

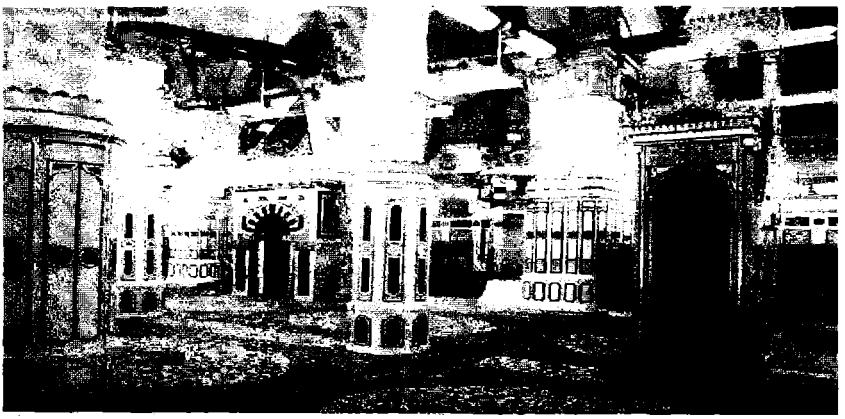

ডানদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মিম্বার, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিতেন, বামে তাঁর মিহরাব যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়াতেন, মিহরাবের বামে তাঁর কবর। এ পুরোটাই রওজাতুম মিন রিয়াদুল জান্নাহ।

এরপর রিয়াদুল জান্নাহ-এ আরো গিয়েছি। মুনযিরও গিয়েছে ওর আব্বুর সাথে, দু'য়া করেছে। এই রিয়াদুল জান্নাহ খুঁজে পাবার আনন্দ যে কতটা ছিল সেটা পরিমাপ করার সাধ্য আমার নেই।

উহুদের হাতছানি

১৯ ডিসেম্বর সকালের নাস্তার পর তিতুমীর হজ্জ কাফেলার বাস আমাদের নিয়ে রওনা হল ঐতিহাসিক উহুদ পাহাড়ের পথে। মদীনা শহরের উত্তরে বেশ কিছু এলাকা পেরিয়ে গেলাম। রাস্তার পাশে পাশে খেজুর বাগান। ঝিরঝিরে বাতাসে খেজুর পাতা দোল খাচ্ছে। রাস্তার আইল্যান্ডে সযত্ন পরিচর্যায় বেড়ে উঠা রঙ-বেরঙের ফুলের শোভা বেশ লাগছে। হারাম এলাকার অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এখানকার গাছপালা উপড়ানো, ফুল বা পাতা ছেঁড়া, এবং এখানে কোন কিছু শিকার করা নিষিদ্ধ। এ সম্মান আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে সুনির্দিষ্ট যা মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ভুখন্ডের জন্য প্রযোজ্য নয়। মক্কা ও মদীনা হচ্ছে সেই দু'টি নগর যে দু'টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ(সঃ) জন্ম নিয়েছেন এবং বসতি স্থাপন করেছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব অবতরণের স্থান হিসেবে এ দু'টো নগরকেই আল্লাহপাক বেছে নিয়েছেন। এই কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ দু- শহরেই। এ দু'শহরের মর্যাদা গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায় ওখানে সশরীরে হাজির হয়ে। এখানকার কুয়াশা ভেজা

সকালের দৃশ্য আর হালকা হিমেল হাওয়া ক্ষণিকের জন্য শীতকালীন বাংলাদেশের প্রকৃতির কথা মনে করিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পর গাইড আমাদের জানালেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা উহুদ পাহাড় দেখতে পাব। বাস ছুটছে, উহুদ নিকটতর হচ্ছে। মনের জানালায় উঁকি দিচ্ছে নবী (সঃ) এর জীবনের অমলিন রক্ত-রঞ্জিত স্মৃতিগুলো, যা তাঁর জীবনে উহুদকে কেন্দ্র করে ঘটে গেছে। দৃষ্টিসীমায় উহুদ পাহাড় জীবন্ত হয়ে উঠলে আমার মন বলে উঠল আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা ছাড়া এ জীবনের আসলেই কোন মূল্য নেই। আজ হজ্জের সফরে উহুদ প্রান্তর দেখতে এসে মনের গভীরে সেই প্রেরণা স্পন্দন তুলছে বারবার।

উহুদ ঃ প্রিয়নবী (সঃ) এর ভালবাসার পাহাড়, যা আল্লাহর পথে জিহাদের এক অবিচ্ছিন্ন প্রেরণা আজও।

মাসজিদে নববী থেকে উত্তরে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার দূরে এ বিশাল পাহাড়টির অবস্থান। পূর্ব- পশ্চিমে প্রায় ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এ পাহাড়টি প্রিয় নবী (সঃ) এর ভালবাসার পাহাড়। তিনি বলেছেন, "উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদের ভালবাসে, আমরা তাকে ভালবাসি।" [বুখারী ২৮৮৯, মুসলিম ১৩৬৫]

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) একদা উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সঙ্গে আবু বকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) ছিলেন। তারপর পাহাড়ে কম্পন সৃষ্টি হয়। নবী (সঃ) বলেন, হে উহুদ, তুমি স্থির হয়ে যাও। কারণ তোমার উপর নবী, সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন। [সহীহ বুখারী ৩৬৭৫]

৩য় হিজরীতে ঘটে উহুদ যুদ্ধের বেদনাদায়ক ঘটনা, যার স্মৃতিচারণ রাসূলের ভালবাসায় সিক্ত প্রতিটি মুমীনের অন্তরকে বেদনার্ত না করে পারে না। নবীজি (সঃ) এর চাচা হামযা (রাঃ) সহ সত্তরজন সাহাবী এখানে শহীদ হয়েছিলেন। নবীজির সামনের দু'টো দাঁত শহীদ হয়েছিল। তাঁর ঠোঁট ও চেহারায় ক্ষত হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধের দিনটি ছিল কঠিন পরীক্ষার দিন।

নবী (সঃ) বলেছেন, "উহুদ প্রান্তে যখন তোমাদের ভাইরা শহীন হন, তখন আল্লাহ তাঁদের রূহ সমূহকে সবুজ পাখির মধ্যে রাখেন। তারা জান্নাতের ঝরনার পানি পান করে, জান্নাতের ফল ভক্ষণ করে, আরশের ছায়াতলে স্বর্ণের ঝাড়বাতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এমন সুন্দর আশ্রয় পেয়ে তারা বলে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি, পানাহার করছি- এ খবর কে দুনিয়ার জীবিত ভাইদের নিকট পৌঁছে দিবে, যাতে তারা জিহাদের ব্যাপারে উদাসীন না হয়?" [আবু দাউদ ২৫২০]

হৃদয়ের জানালায় সেই সবুজ পাখির উড়াউড়ি নবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। প্রানপণ সাধনার এপথ ধরেই আসবে মুসলিম উম্মাহর কাংখিত সাফল্য, যা পৃথিবীর জীবনে এবং আখিরাতে এনে দেবে সুনিশ্চিত মর্যাদার চাবিকাঠি। চলন্ত বাসে এ বিষয়গুলোর উপর আমাদের ব্রিফিং দেয়ার ফলে উহুদ ও খন্দক প্রান্তরে ভ্রমণ বেশ শিক্ষাপ্রদ ও প্রানবন্ত হয়ে উঠেছিল।

উহুদ পাহাড়ঃ

আল্লাহর জন্য আত্মত্যাগের এক সাক্ষী হয়ে জেগে আছে হাজার বছর ধরে।

বাস থামলে আমরা সবাই ধীরে সুস্থে নেমে দাঁড়লাম। আমাদের ডানে, কালের সাক্ষী উহুদ পাহাড় আর বাঁয়ে উহুদ যুদ্ধে শহীদদের কবরস্থান। আমীরুশ শুহাদা হযরত হামযা (রাঃ)এর কবর চিহ্নিত করা আছে, দেখলাম। মেয়েরা দূর থেকেই সালাম জানালাম ও দু'য়া করলাম। পুরুষেরা কাছে গিয়ে যিয়ারাত করলেন। মুনযিরকে ওর বাবা কোলে নিয়ে যিয়ারাতে গেলেন। অনেকে উহুদ পাহাড়ে উঠার আগ্রহ প্রকাশ করলে আমাদের গাইড বারণ করলেন এই বলে যে, এতে উঠার মধ্যে কোন বিশেষ ফজীলত নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে জনস্রোত বেড়ে চলল। আমরা বাসে চাপলে বাস ছেড়ে দিল। হালকা, মধ্যম এরপর দ্রুত হল গতি। উহুদকে নবীজি (সঃ) ভালবেসেছেন। নবীজিকে আমরা ভালবাসি বলে তাঁর ভালবাসার উহুদ পাহাড় দেখতে এসেছি। উহুদ পাহাড় দৃষ্টিসীমা থেকে যতই সরে যাচ্ছে, আল্লাহর পথের সেই একনিষ্ঠ সাধকদের স্মৃতি ততই প্রবল হচ্ছে। এক সময় উহুদ পাহাড় চোখের আড়াল হয়ে গেল। মনের গভীরে আঁকা হয়ে গেল নবী (সঃ) এর ভালবাসার পাহাড়ের এক ছবি, যা আমাকে সাহস এবং প্রেরণা যোগায় আজও।

খন্দকের পথে

উহুদ পাহাড় পেছনে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম ঐতিহাসিক খন্দকের দিকে। খন্দক (The Trench) প্রান্তরটির অবস্থান মদীনার উত্তরে উহুদ পাহাড়ের দক্ষিণে। মদীনা শহরের বিস্তৃত চারপাশ ঘিরে রিং রোড নামে বিশাল হাইওয়ে তৈরী করা হয়েছে। এই হাইওয়ে ধরে পশ্চিমে কিছুটা এগিয়ে গেলে হাতের বাঁয়ে খন্দকের প্রান্তর চলন্ত বাস থেকেই দেখা যাচ্ছে। শিলাময় প্রান্তর। প্রিয় নবী (সঃ) স্বহস্তে পরিখা খনন করেছেন এই পাথুরে প্রান্তরে। খনন কাজে তাঁর সাথী হয়েছিলেন এক হাজার সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম। পরিখার পাথুরে এলাকাটি আজ দেড় হাজার বছর পরও মহানবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যবদ্ধ, সংগ্রামী, পরিশ্রমী ও হিকমতপূর্ণ জীবনের আদর্শকে চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। মুসলিম উম্মাহর একজন হিসেবে নিজকে যাচাই ও সংশোধনের সুযোগ এনে দেয়।

উহুদ যুদ্ধে জয়-পরাজয় অমিমাংসিত থাকার দু-বছর পরে হিজরী ৫ সালে মক্কা ও মদীনার সমস্ত মুশরিক, কাফির ও ইয়াহুদী জনগোষ্ঠী জোটবদ্ধ হল মদীনা আক্রমনের জন্য। নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে নবী (সঃ) তা জানতে পেরে বিশিষ্ট সাহাবাদের নিয়ে পরামর্শ করেন। পারস্য বংশোদ্ভুত রাসূল (সঃ) এর নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী সালমান ফারসী (রাঃ) এভাবে প্রস্তাব দেন, 'হে রাসূল, পারস্যে আমাদের ঘেরাও করা হলে আমরা চারিদিকে পরিখা খনন করতাম।' (আর রাহীকুল মাখতুম পৃঃ ৩৩৪) এ কৌশল আরবদের কাছে ছিল অভিনব। নবীজি (সঃ) এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং পরিখা খননের কাজ শুরু হয়ে যায়। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমরা রাসূলের (সঃ) সাথে খন্দকে ছিলাম। আমরা পরিখা খনন করছিলাম এবং কাঁধে মাটি বহন করে দূরে ফেলে আসছিলাম। এ সময় রাসূল(সঃ) বলেছিলেন, 'আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। ওগো করুণাময়, আনসার ও মুহাযিরদের ক্ষমা করে দিন।' [বুখারী ঃ ৩৫১৩] অন্যান্য সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় আল্লাহর রাসূল (সঃ) নিজে খনন কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাবার মত অবস্থা বা ফুরসত তাঁদের কারোই ছিল না। এক শীতের সকালে রাসূল (সঃ) খন্দকের দিকে গমন করে দেখতে পান যে মুহাযির ও আনসাররা পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের কাছে কোন ক্রীতদাস ছিল না যে তাদের পরিবর্তে কাজ করে দেবে।

তালহা (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের কাছে ক্ষুধার কথা বললাম এবং আমাদের পেটে পাথর বাঁধা দেখালাম। রাসূল (সঃ) দেখালেন যে তাঁরও পেটে বাঁধা রয়েছে দুটো পাথর। [তিরমিযি]

ইসলামের বিজয়ের জন্য সংগ্রাম ও সহিষ্ণুতার এ চিত্র স্মরণ করে খন্দকের প্রান্তরে আমরা গভীর প্রেরণায় উজ্জীবিত হবার দৃঢ়তা পেলাম। বাস ধীরে চলছিল যাতে আমরা

ভালভাবে সব কিছু দেখতে পারি। Simply কোদাল ও টুকরির প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিলাময় পাহাড়ী মৃত্তিকায় ৪ মিটার প্রশস্থ, ৩ মিটার গভীর এবং আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ ঐ খনন কার্যের ঐতিহাসিক মূল্য নিঃসন্দেহে অতি উঁচু মানের। আর এই অসাধারণ কর্ম সম্পাদনে মহানবী (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যক্ষ নমুনার উল্লেখ হাদীসে রয়েছেঃ হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা পরিখা খনন করছিলাম। হঠাৎ একটি বড় পাথর পড়ল। কিছুতেই সেটি নড়াতে পারছিলাম না। আমরা রাসূল (সাঃ) কে এ কথা জানালে তিনি বললেন, আমি আসছি। তার পেটে তখনও পাথর বাঁধা। তিনি কোদাল দিয়ে পাথরে আঘাত করলেন, সাথে সাথে সে পাথর ধুলাবালির স্তুপে পরিণত হল। বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ "আর রাহীকুল মাখতুম"-এ বুখারী শরীফের রেফারেন্সে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ আছে।

একই গ্রন্থে বুখারী শরীফের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত হাদীসটিও উল্লেখিত রয়েছে ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (সঃ)কে ক্ষুধায় কাতর দেখে একটি বকরী জবাই করেন। তাঁর স্ত্রী প্রায় আড়াই কেজি আটার রুটি তৈরি করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহর নিকট গোপনে বলেন যে, কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীকে নিয়ে আমার বাসায় আসুন। রাসূল(সঃ) খনন কার্যে নিয়োজিত সকল সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হন যার সংখ্যা ছিল এক হাজার। অতঃপর সকল সাহাবা পেট ভরে গোশ্ত-রুটি খেলেন। উনুনের উপর গোশ্তের হাড়ি তখনো টগবগ করে ফুটছিল। একের পর এক রুটি তখনও তৈরি হচ্ছিল। যতো পরিবেশন করা হচ্ছিল শেষ হচ্ছিল না। (পৃঃ ৩৩৫)
এ দুটো ঘটনাই ছিল তাঁর বিস্ময়কর মুযিযা। আর "মুযিযা" ছিল তাঁর সত্যনবী হবার অন্যতম সাক্ষ্য, যা প্রত্যক্ষ করেছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে হাজারো জনতা।

খন্দকের প্রান্তর একটি প্রেরণা। যা আমাদেরকে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কৌশল, সাহস, ত্যাগ, জ্ঞান ও শ্রম বিনিয়োগ করতে শেখায়। খন্দকের যুদ্ধকে আহযাব যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধে দশ হাজার শত্রুসেনা কর্তৃক প্রায় এক মাস মদীনা অবরুদ্ধ ছিল। পরিখা-বেষ্টিত থাকায় এবং সংগ্রামী সাহাবায়ে কিরামদের অতন্দ্র প্রহরার কারণে শত্রুরা তাদের রণসজ্জা সমেত মদীনায় প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল কিন্তু ছেড়েও যাচ্ছিল না। খন্দক যুদ্ধের শেষের একটি দিনে প্রচন্ড মুকাবেলার কারণে সাহাবায়ে কিরাম এবং রাসূল (সঃ) এর নামায কাযা হয়েছিল। এজন্য তিনি এত মনোকষ্ট পান যে বলেন, "হে আল্লাহ! মুশরিকদের ঘর এবং কবরকে আগুনে ভরে দিন। তাদের জন্য আমাদের সালাতুল উসতা (আসরের নামায) কাযা হয়েছে।"[সহীহ বুখারীঃ ২য় খন্ড] এ অবস্থায় রাসূল (সঃ) নিকট দু'য়া করেন যে, "হে আল্লাহ আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাস্ত করুন।" পর পর তিনদিন ধারাবাহিকভাবে তিনি দু'য়া করার পর আল্লাহ তাঁর জবাবে জিবাইল (আঃ) মারফত ওহী করে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। একই সময়ের মধ্যে মুশরিক, কাফির ও ইয়াহুদীদের জোটে পারস্পরিক অবিশ্বাস দানা বেঁধেছিল এবং ঐক্যে ফাটল ধরেছিল। সময়টা ছিল শীতকাল। সেই শীতের এক

রাত্রিতে আল্লাহপাক ঝড়ো বায়ু প্রেরণ করলে তারা ভীষন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, এবং শত্রু শিবির লন্ড ভন্ড হয়ে যায়। ফলে সম্পূর্ণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও মনভাঙা অবস্থায় তারা পরদিন সকালে স্বেচ্ছায় ময়দান ত্যাগ করে। রাসূল (সাঃ) নিজ সাহাবীদের বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

বিজয়ের মাসজিদ বা মাসজিদে ফাতহ ঃ খন্দক প্রান্তরে 'সালা' পাহাড়ের উপর অবস্থিত মাসজিদে ফাতহ বা মাসজিদে আহ্যাব, যেখানে খন্দকের যুদ্ধে বিজয়ের সুখবর আল্লাহতায়ালা ওহী করেছিলেন।

খন্দক যুদ্ধে বিজয়ের সুখবর নবীজি (সঃ) কে আল্লাহপাক ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যেস্থানে, সেখানে তৈরি হয়েছে মাসজিদে ফাত্হ বা বিজয়ের মাসজিদ। এ বিজয় কোন ধর্ম, বর্ণ বা জাতির বিজয় নয়, মানুষের গড়া জীবন পদ্ধতির উপর তার স্রষ্টা প্রদত্ত জীবনবিধানের শ্রেষ্ঠত্বের বিজয়। খন্দক প্রান্তরের কাছে 'সালা' পাহাড়ের উপর মাসজিদে ফাত্হ বা মাসজিদে আহ্যাব অবস্থিত। সিঁড়ির পর সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা মাসজিদটি এক নজর দেখে এসেছিলাম। ভাবছিলাম, আল্লাহর রাসূল(সঃ) ছিলেন মানবতার শান্তি ও কল্যাণকামী এক মহান ব্যক্তিত্ব, যার ক্ষমাশীলতা, সৌজন্যতা, ত্যাগ এবং আদর্শ নেতৃত্বের নমুনা কেবল তিনি নিজেই অথচ যারা অজ্ঞতাকে সঙ্গী করেছিল, তারা রাসূল(সঃ)কে সারাটি জীবন কতই না কষ্ট দিয়েছে।

এখান থেকে ফেরার পথে বাসে আমাদের সামনে বিশাল আকারের কাঁচা পাকা তাজা (শুকানো নয়) খেজুর পরিবেশন করা হয়েছিল। তাতে রয়েছে ভিন্ন স্বাদ ও গন্ধ ।

মাসজিদে কুবা , কিবলাতাঈন ও জান্নাতুল বাকী

উহুদ আর খন্দকের প্রেরণা বুকে নিয়ে আমরা বাসে চাপলাম। বাস ছুটল মাসজিদে কুবা এবং মাসজিদে কিবলাতাঈন অভিমুখে। মাসজিদে নববী থেকে ৩.৫ কিলোমিটার উত্তর-

পশ্চিমে মাসজিদে কিবলাতাঈন বা দু'কিবলার মাসজিদ অবস্থিত। এখানেই নবীজি (সঃ)এর জীবনের কিবলা পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছিল।
একদিন রাসূল (সঃ) এখানে সালাতুল যুহ্‌র আদায়কালে আল্লাহর বাণী নাযিল হয় "আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন এ দিকেই মুখ ফিরাও।" [সূরা বাকারাঃ ১৪৪]

তিনি সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণে স্বীয় মুখ তদানীন্তন কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হতে মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরান এবং বাকী নামায সম্পন্ন করেন। তাঁর অনুসরণে সালাতরত সকলেই কিবলা পরিবর্তন করে নেন। এ কারণে এ মাসজিদ 'দু কিবলার মাসজিদ' নামে খ্যাত। আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর শর্তহীন এবং স্বয়ংক্রিয় আনুগত্যের এই মাসজিদ, কিবলাতাঈন। এখানেও লোকে লোকারণ্য। আমরা এখানে সালাত আদায়ের পর মাসজিদে কুবা অভিমুখে চল্‌লাম।

দুই কিবলার মাসজিদ বা মাসজিদে কিবলাতাইন

মদীনায় হিযরত করে এসে সর্বপ্রথম নবীজি (সঃ) নিজ হাতে যে মাসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন সেটি মাসজিদে কুবা। মক্কা থেকে মদীনা দীর্ঘপথ পরিভ্রমনের পর ক্লান্ত নবীজি (সঃ) মদীনার দক্ষিণে কুবা পল্লীতে পদার্পন করেন। এখানে তিনি কিছু দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে এ মাসজিদটি তিনি নির্মাণ করেন। পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ রয়েছে- "অবশ্যই যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে, তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে নামাযের জন্য দাঁড়াবে। এতে রয়েছে এমন ব্যক্তিগণ যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন।" [সূরা তাওবা ঃ ১০৮]

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রে (কুবা পল্লীতে) দশ দিনের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি আরোহনের জন্তুতে উঠেন। তিনি চলতে লাগলেন লোকজনও তাঁর সাথে চলল। এক সময় তাঁর উট মাসজিদে নববীর স্থানে বসে পড়ল। [বুখারী ঃ ৩৯০৬]

মাসজিদে কুবা ঃ

আল্লাহর রাসূল (সঃ) মদীনায় পদার্পন করে সর্বপ্রথম এখানেই অবস্থান করেন এবং সালাত আদায় করেন।

মাসজিদে কুবা নির্মাণের পর তিনি মদীনায় যান। সেখানে তাঁর বাহন থামার স্থানে মাসজিদে নববী নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে কতিপয় মুনাফিক রাসূলের সাথে মুমীনদের বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুবা পল্লীর কাছে 'মাসজিদে দ্বিরার' নাম দিয়ে এক ষড়যন্ত্রমূলক ঘাঁটি তৈরী করেছিল। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ বিষয়ে অবহিত করেন এবং তাকে ঐ 'দ্বিরার'-এ নামায আদায় না করে মাসজিদে নববী ও মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করতে বলেন। কেননা মাসজিদদ্বয় প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নবীজী (সঃ) সপ্তাহান্তে একবার মাসজিদে কুবায় নামাযের জন্য যেতেন।

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। "রাসূল (সঃ) প্রতি শনিবার কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বাহনে চড়ে মাসজিদে কুবায় আসতেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করতেন।" [সহীহ বুখারীঃ ১১৯৩, সহীহ মুসলিম ঃ ১৩৯৯]

নবীজী (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করে মাসজিদে কুবায় আসে এবং সেখানে কোন নামায আদায় করে, সে উমরাহর সওয়াব পাবে।" (ইবনে মাযাহ ১৪১২) **[Pictorial History Of Medina Munawwarah---Dr. Md.Ilyas Abdul Ghani, Page-49]**

এ কারণে মদীনায় আগত ব্যক্তি মাসজিদে কুবায় দু'রাকাত সালাত আদায়ে আকাংখী ও সচেষ্ট থাকেন।

গাঢ় সবুজ বর্ণের খেজুর বাগান পরিবেষ্টিত মাসজিদে কুবা। গাঢ় সবুজের ফাঁকে মাসজিদের ধবধবে সাদা অবয়ব দূর থেকেই দৃষ্টি কাড়ছিল। এখানে নামায আদায় করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। মুনযির সকলের দেখাদেখি এখানে সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল।

মদীনায় অন্যান্য মাসজিদ বা ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দেখার জন্য বা শিক্ষার্জনের জন্য যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিশেষ কোন ফায়দা বা কল্যাণ আছে মনে করে যিয়ারাত করা বিদ্‌য়াত। তবে পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারাত করা নবীজী (সঃ) এর সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত কাজ। তাই মদীনা সফরকালে জান্নাতুল বাকী যিয়ারত করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। [মহিলাদের জন্য নয়।]

জান্নাতুল বাকী ঃ এখানে শায়িত আছেন রাসূলুল্লাহর (সঃ) সাহাবী, উম্মুহাতুল মুমিনীন, নবী (সঃ)-এর সন্তানগন এবং আহলে বাইত সহ অসংখ্য মুমীন নর-নারী।

আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) এর যখন আমার কাছে অবস্থান করার পালা আসত, তখন তিনি অধিকাংশ রাতের শেষাংশে জান্নাতুল বাকীর দিকে যেতেন। কবরবাসীদের জন্য দু'য়া করতেন। [সহীহ মুসলিমঃ পবিত্র মদীনার ইতিহাস]

নবী (সঃ) একদিন আয়িশা (রাঃ) কে বলেন, জিবরাইল (আঃ) আমাকে বললেন, বাকীয়ে গারকাদে গিয়ে কবরবাসীদের মাগফিরাতের দু'য়া করার জন্য আপনার রব আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। [মুসলিমঃ ৯৭৪]

ফিরতি পথে আমরা জান্নাতুল বাকী দেখলাম। আমরা বাস থেকেই কবরবাসীদের প্রতি সালাম প্রেরণ করলাম। আমাকে বাসায় রেখে মুনযিরের আব্বু অবশ্য কয়েকবারই জান্নাতুল বাকী যিয়ারাতে গিয়েছেন।

মদীনায় দিনযাপন

মদীনায় দিনগুলো ব্যস্ততার ভেতর যেন খুবই দ্রুততায় কেটে যাচ্ছিল। ২৬ ডিসেম্বর আমাদের মক্কায় যাবার দিন ধার্য হয়েছে। ইহরাম বাঁধার পূর্বপ্রস্তুতি সুন্দরভাবে নেয়ার জন্য ২৫ ডিসেম্বরের আগেই মদীনার সকল কাজ সেরে নিতে হবে। ২৫ তারিখ আমাদের লাগেজ গুছানো আর ইহরাম-পূর্ব পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা সম্পন্ন করার দিন। মদীনা থেকে মক্কা প্রায় আট/দশ ঘন্টার বাস জার্নিকে সামনে রেখে মুনযিরের খাবার দাবার তৈরী করে গুছিয়ে নিতে হবে সেদিনই। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাসজিদে নববীতে নামাযের জন্য সময়মত যাওয়া, মদীনায় চেনা-পরিচিত মহলে দেখা করা এবং প্রয়োজনীয় কেনা-কাটা সেরে নিতে হবে।

আমরা এ পাঁচদিনের কখন কি করব দু'জনে প্ল্যান করলাম। আমরা ঠিক করলাম, পুরো সফরে সম্মিলিত পরিকল্পনার বাহিরে আমরা কেউ কোথাও যাবনা বা কোন কেনাকাটা করব না। এতে করে সময়মত মাসজিদে আসা-যাওয়া এবং বাচ্চার যত্ন ও তদারকী সহজ হবে। যদিও বাসা এবং মাসজিদের চলতি পথেই Shopping centre গুলো পড়ে, তবুও shopping এর জন্য সময় দেয়া কঠিন। মাসজিদে আগেভাগে না গেলে ভেতরে ঢোকা যায় না। নামাযের ঘন্টা খানেক আগেই যেতে হয়, নামায শেষ হলে ভিড় ঠেলে বেরুতে আবার আধঘন্টা। যুহর ও ইশার নামাযের পরে ক্ষুধা ও ক্লান্তি এসে ভর করে। খবর পেলাম মক্কায় মদীনার চেয়ে ভীড় অনেক বেশী। তাছাড়া মক্কা পৌঁছেই উমরাহ সেরে হজ্জের মূল অনুষ্ঠানের জন্য নিজেদেরকে পূর্ণ প্রস্তুত করার সময় এসে যাবে। কাজেই বোরকা, স্কার্ফ, জায়নামায, খেজুর যা যা প্রয়োজন ছিল কিনে ফেললাম মদীনাতেই।

এখানে অবিশ্রান্ত এবং উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরায় কোন কল্যাণ নেই তাই দু'জনের কেউই সেটা করব না দেশে থেকেই প্ল্যান করেছিলাম। আবারও সেটা স্মরণ করালাম পরস্পরকে। মুনযিরের আব্বুর সাথে ছাড়া একাকী দূরে বের হতাম না, যদিও সামাজিক নিরাপত্তার কোন অভাব এখানে নেই। কারণ ঝামেলা এড়িয়ে চলা। মুনযিরকে বাইরে হাঁটার জন্য নিয়ে যেতাম, কাছেধারে। হজ্জ সম্পন্ন করে দেশে ফেরা পর্যন্ত সেভাবেই চলেছি। পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পথ চলায় সম্পূর্ণ সফরেই আল্লাহর সাহায্য পেয়েছি।

মুনযিরের খাবার রান্নার জন্য এজেন্সির মিজানুর রহমান ভাই একটি গ্যাস বার্ণার সরবরাহ করেন। বিষয়টি তাকে আগেই বলা ছিল। থাকার রুমে তিনটি বেড, আমাদের লাগেজের বিশাল বহর। চুলা জ্বালাবার মত ফাঁকা কোন space রুমে নেই। সংলগ্ন বাথরুমের একপাশে বেশ বড় একটি খালি স্পেস। ওখানে গ্যাস বার্নারে মুনযিরের দুধ গরম করা, খিচুড়ি, সুজি ইত্যাদি রান্নার কাজ চলছিল। বাথরুমে গরম ও ঠান্ডা দু'রকম পানির ব্যবস্থা থাকায় শীতে উযু, গোসল বা কাপড় ধোয়াতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। যতটুকু সময় মাসজিদে নববীতে কাটাই আমাদের এবং মুনযিরের জন্যও সেটা বেশী আনন্দের। বাসায় ফিরেই শুরু হয় চঞ্চলতা। হাতের কাজগুলো তড়িঘড়ি সেরে মুনযিরকে নিয়ে ছাদে যাই।

মদীনাতুন্নবী ঃ

এক অনন্য
ভ্রাতৃত্ব ও
ত্যাগের
স্মৃতিচিহ্নকে
ধারণ করে আছে
আজও।
সেই ভ্রাতৃত্ব আর
ঐক্যের স্বপ্নে
আজও স্বেদবিন্দু
ঝরায় মুসলিম
উম্মাহ।

পাঁচ তলার উপরে মাথা সমান উঁচু রেলিং ঘেরা ছাদ। মদীনার উন্মুক্ত বাতাসে মুনযির আরও চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করে। রোদ এবং শুকনো বাতাসে কাপড় শুকায় বেশ। ফাঁকে ফাঁকে আমি হজ্জের প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকি। মাঝে মাঝে মুনযিরের চাঞ্চল্য প্রশমিত করার জন্য বাসার সামনে রাস্তায় হাঁটতে যাই। ওখানে সে বিড়ালের সাথে খেলাধুলা জমায়। মদীনায় বসবাসের আট-নয়টি দিন ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। আমাদের রুম থেকে মাসজিদে নববীর আযান ও নামাযের কিরাত শোনা যায়। আযানের আগেই চলে যেতে পারলে মাসজিদের ভেতরে যাওয়া যায়, নয়তো ঠাঁই হয় বাহিরের আঙিনায়। মুনযিরের ঘুম, বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া সবকিছু সাজিয়ে নিয়েছি নামাযের সময়কে সামনে রেখে। তারপরও অনেক সময় পেরে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। দেড় বছরের শিশু তো। যে বেলা সামলে উঠতে পারছিলাম না সে বেলা ওর বাবাকে বলেছি আগে ভাগে মাসজিদে চলে যেতে। আমি ঘরেই পড়ে নিয়েছি। নামাযে যাওয়া আসার জন্য ছোট্ট শিশুকে কষ্ট দেয়া সঙ্গত মনে হয়নি। মহিলাদের মাসজিদে উপস্থিতির বিষয়টি শরয়ীভাবেই শিথিল রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি জোরালো মতামত রয়েছে। সেটি হল হারাম এলাকার অন্তর্ভূক্ত যে কোন স্থানে সালাত আদায় করলে মহানুভব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছে করলেই সে পরিমাণ নেকী ও কল্যাণ দান করতে পারেন, যা ঐ হারাম মাসজিদ (মাসজিদে নববী বা মাসজিদে হারাম) এর অভ্যন্তরে আদায় করলে দেয়া হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনে সূরা আল ফাতহ ঃ ২৭ এবং সূরা ইসরা ঃ ১ এ দুটো স্থানে, "মাসজিদুল হারাম" শব্দটি গোটা হারাম এলাকার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

মাসজিদে নববীর ভেতরের একটি অংশ

এসব বিবেচনায় রেখে আমি যেসব ওয়াক্তে মাসজিদে হাজির হতে পারিনি সেসব নামায বাসায় পড়েছি এবং দু'য়া করেছি এ ছোট্ট শিশু বড় হলে আমি যেন আবারও এই পবিত্র ভূমিতে আসতে পারি, মাসজিদের অভ্যন্তরে সালাত আদায়ে শামীল হতে পারি।

মাসজিদে গেলেই চোখে পড়ে বিশ্বের নানা দেশের নানা বর্ণের মানুষদের বৈচিত্রপূর্ণ চলন-বলন। ইসলামের আদর্শই কেবল উম্মাহর সকলকে এক সুতোয় বেঁধেছে। তবে রাসূল(সঃ) ও সাহাবাদের জীবনাচরণের অনুসরণ যত বেশী করবে, উম্মাহর ভেতরে ঐক্যবোধ ততই প্রবল হবে। এজন্য উম্মাহর ভেতরে dynamic leadership তৈরী হওয়ার যে কোন বিকল্প নেই সেকথা মনে হল একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে।

পৃথিবীর কোন কোন দেশের লোকেরা এখানে আসেন সারিবদ্ধ সেনাদলের মত। অগ্রভাগে একজন লিডার থাকেন, যিনি সেদেশের পতাকা বহন করেন। এক সন্ধ্যায় মাসজিদে নববীর খোলা চত্বরে এমনি এক কাফেলার দেখা পেলাম। মুনযির খুব বিস্ময়ভরে দেখছিল। কাফেলা নিকটবর্তী হতেই মুনযির কোনদিকে না তাকিয়ে অকস্মাৎ আমাদেরকে পেছনে রেখে ঐ কাফেলার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। কাফেলার দিকে সে তার কচি দুটি হাত উঁচু করে তুলতেই শতাধিক লোকের কাফেলাটি গেল থেমে। লিডার ওকে কোলে তুলে আদর করে দিলেন, কেউ কেউ ওর সাথে হাত মিলালেন, কেউ আবার মুচকি হাসি বিনিময় করলেন। আমরা দু'জন দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখলাম। দেড় বছরের ছোট্ট এক শিশু, কিন্তু তার ইশারায় থেমেছে শত লোকের কাফেলা। ঘটনাটি ছোট্ট হলেও শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাহল, মুসলিম উম্মাহকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের যথাযথ মাপের impression থাকা আজকের বিশ্বে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। মাসজিদে নববীর চত্বরে বসে হৃদয় নিংড়ে যে দুয়া'টি বারবার

সামনে এসেছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন বিশ্বজুড়ে সৎ নেতৃত্ব তৈরীর ব্যবস্থা করে দেন, যেরকম তৈরী হয়েছিলো এখানে, মদীনার এই মাটিতে।

এক ফিলিস্তিনের গল্প

হজ্জকে কেন্দ্র করে মক্কা ও মদীনায় জমে উঠেছে বিশ্ব মুসলিমের মিলনমেলা। গোটা বিশ্ব যেন একটি গ্রামের চেয়ে বেশী কিছু নয়। তবে ইসলামের আদর্শ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধ (Ummah feeling)। এ বোধ, এ অনুভূতি জাতি, দেশ বা মহাদেশের সীমা ঘুচিয়ে দেয়। সাগর, মহাসাগর, পর্বত, মরুভূমির সব দূরত্ব ও প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে মানব জাতি চিরকাল একই পরিবারভূক্ত, একই রক্তধারায় প্রবহমান- এ চেতনা ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে মানুষ! আমিই তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।" [সূরা হুজুরাত:১৩]
মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের এবং নেতৃত্ব নির্বাচনের নীতিমালা ঘোষনা করেছে এ আয়াতটি। অথচ মানুষের গড়া মতাদর্শ মানুষকে শুধু বিভক্তই করেনি বরং বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতিগত মর্যাদার পার্থক্যের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। সেই রেশারেশ সমাজে অশান্তির দাবানল ছড়াচ্ছে। আজকের রক্তাক্ত ফিলিস্তিন, মানুষের হাতে তৈরি সেই মতাদর্শের বিষ বৃক্ষেরই ফসল।

মাসজিদে নববীর খোলা চত্বরে দু'নামাযের মাঝের সময়গুলো কাটাই। কখনো নামায সেরে মুনযিরকে নিয়ে চত্বরে বসি ওর বাবার অপেক্ষায়; ও তখন খেলাধূলা, দৌড়-ঝাঁপ করে, গভীর মনযোগের সাথে দেখে চারিদিকের সবকিছু। এসময় দেখা হয়, কথা হয়, কুশলাদি ও হাদিয়া বিনিময় হয় পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা ভাষার মহিলাদের সাথে। ফিলিস্তিনি বোন আমিনার সাথে এখানেই আমার দেখা হয়েছিল। অনর্গল ইংরেজি বলা, পেশায় একজন নার্স। আমি বাংলাদেশী শুনে, উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, "Bangladesh is a very peaceful Muslim area. They are good Muslims, are'nt they?" আমি বললাম, `sure, we are trying to be good Muslims.'

বাইতুল মুকাদ্দাস বা মাসজিদুল আকসা ঃ যা অতীতে কিবলা ছিল, নির্মাণ করেছেন আল্লাহর নবী সুলাইমান(আঃ)। যে তিন মাসজিদে যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়, তার অন্যতম। এ মাসজিদকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার স্বপ্ন যুগ যুগ ধরেই দেখে আসছেন বোন আমিনা একা নয়, গোটা মুসলিম উম্মাহ।

আমিনার কাছে তার লোকালয় সম্পর্কে জানতে চাইলে দু'চোখের সিক্ততা আড়াল করতে চেষ্টা করেও মনে হলো পারলেন না। তিনি বললেন, আমরা আমাদের নিজ বাড়িতেই স্বাধীন নই। আমাদের ছোট্ট শিশুরা স্কুলে গেলে পর্যন্ত ইহুদীদের শিশুরা টিজ করে, ক্ষেপায়, বই খাতা নষ্ট করে, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায় কখনো হাতাহাতি, মারামারি হয়। ওদের teacher রা studentদের বলে, "They are Muslim . They are terror. So hate them. Not to be friendly with them."

এর ফলে স্কুল গোয়িং বয়স থেকেই আমাদের শিশুরা ইহুদীদের মার খেয়ে খেয়ে বড় হয়। আমরা কতক্ষণ নীরব থাকতে পারি? মাসজিদুল আকসা সম্পর্কে বললেন, সেখানে মুসলিমরা নামায আদায় করতে গেলে অনেক সময়ই ইহুদীরা মারধর করে নামাযরত মুসলমানদের মাসজিদ থেকে বের করে দেয়। বলে, "তোমরা এখানে কেন? আকসা তো আমাদের, তোমাদের নয়"।

ইসরাইলের বিষাক্ত থাবায় আজও রক্ত ঝরছে ফিলিস্তিনের। শিশু, বৃদ্ধ, নারী কেউ বাকী নেই। অত্যন্ত নিপীড়িত ও বঞ্চিত ছোট্ট এই জনপদ ফিলিস্তিন এবং এখানকার মুসলমানরা। বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর এ নিয়ে তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ নেই। পৃথিবীতে এত হিংসা, দ্বেষ ছড়াচ্ছে কারা? ভাবতে কষ্ট হয়।

আরেক বোন, মালয়েশিয়ান ল'ইয়ার তাইয়িবা বলছিলেন, "অলমাইটি আল্লাহ সব দেখছেন, যা মুসলমানদের সাথে করা হচ্ছে। তাঁর কাছেই Real Justice আছে। But we must be united."– অবশ্যই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

মাগরিবের আযান হলে আমরা একসাথে সালাতের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম।

মন বলছিল, সালাতে এক নেতৃত্বের পেছনে দন্ডায়মান হবার এই যে শৃংখলা, সংঘবদ্ধতা, আনুগত্যবোধ এবং ঐক্যবোধ-যা আমরা হজ্জে এসে অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পাই, সেই বোধ ও চেতনাটুকু প্রত্যেকেই যদি যার যার ভূখন্ডে গিয়ে বাস্তবে কাজে লাগাতাম তবে তা আজ বিশ্ব-শান্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হতে পারত।

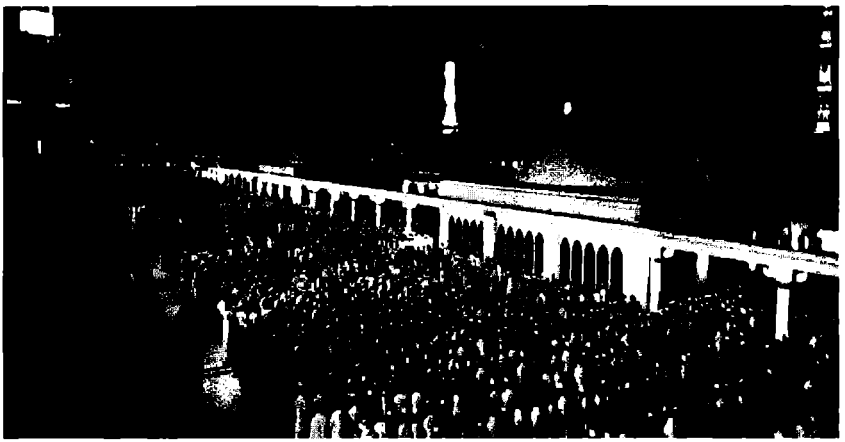

মাসজিদে নববীর ছাদে ঃ তাকওয়া, ভ্রাতৃত্ব ,ত্যাগ আর ঐক্যের এক অনুপম দৃশ্য।

আরও দু'দিনের ভ্রমনে

২৩ ডিসেম্বর সকালে ঘন্টা খানেক সময় কাটল শপিং-এ। জায়নামাযের বিপুল সংগ্রহ দেখে চমৎকার লাগল। ইরানী, সৌদি এবং তুর্কী মুসলমানদের শিল্প-সৌকর্য প্রকাশ পেয়েছে এতে। হিজাবের লম্বা মোটা-ঢিলেঢালা ড্রেস, স্কার্ফ আর স্কার্ফ-পিন এর বিপুল সমাহার রয়েছে, যেগুলো মেয়েদের পূর্ণ হিজাব রক্ষার জন্য সম্মানজনক ও আবশ্যকীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। যে সকল মা-বোনেরা হজ্জ উপলক্ষে মক্কা-মদীনায় যান, তারা হিজাবের পরিবেশ এবং হিজাব উপকরণের সহজলভ্য অথচ আকর্ষণীয় উপস্থাপন এবং ইসলামী হিজাবের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে কমবেশী জানার ও বুঝার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাই হজ্জে গমণকারী অধিকাংশ মা বোনেরাই ব্যাপক হারে এসব হিজাব উপকরণ কিনে থাকেন।

আমাদের দেশের মতো এখানে রিক্সা বা সিএনজির চলাচল নেই। পথ লম্বা হলে মানুষ গাড়ী ভাড়া করে। দু'এক কিলোমিটার পথ হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। ভারী লাগেজ থাকলে ট্রলি ব্যবহার করে। এজন্য এখানে যানজটও নেই। লাগেজ বহনের ট্রলিকে স্থানীয় ভাষায় অ্যারাবিয়া [চার চাকার ট্রলি] বলে। আমরা আমাদের জিনিসপত্রগুলো বহনের জন্য একটি অ্যারাবিয়া ভাড়া করলাম। ব্যাগের উপর মুনযিরকে বসিয়ে অ্যারাবিয়াওয়ালা লোকটি অ্যারাবিয়া ঠেলে আমাদের হোটেলের রুম পর্যন্ত পৌঁছে

দিলেন। তাকে পেমেন্ট করলে তিনি গড়গড় করে বললেন, "শুকরান, শুকরান, জাযাকাল্লাহু খায়ির .....।" ইসলাম পারস্পরিক সৌজন্য প্রকাশের বিষয়টিকে উৎসাহিত করেছে প্রবলভাবে। আমাদের দেশে এরকম স্বচ্ছন্দে কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য প্রকাশের অভ্যাস এবং চর্চা যে কতটা ব্যাপক হওয়া দরকার, সেটা এখানে এসেই প্রথম টের পেলাম।

আমরা রুমে ফিরে দু'জনে ঝটপট আগামী দিনের প্ল্যান করে ফেললাম। আজকের বাকী দিনের কাজও সাজিয়ে নিলাম। আগামীকাল ২৪ ডিসেম্বর আরেকবার মাসজিদে কুবা এবং মদীনায় রাসূল (সঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত আরো কিছু স্থান, ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অফ মাদীনা, কিং ফাহাদ কুর'আন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স ইত্যাদি স্থান ঘুরে আসার প্ল্যান নেয়া হল। রাতে ইশার পরে মাসজিদে নববী থেকে এক কিলোমিটার হেঁটে এক দ্বীনিবোনের বাসায় দাওয়াতে গেলাম। দেখলাম, হজ্জের মওসুমে আল্লাহর অতিথিদের আতিথেয়তায় এখানকার অধিবাসী এবং প্রবাসীরা সবাই অগ্রণী থাকতে চান।

পরদিন ২৪ ডিসেম্বর। ভোর সাতটা বাজলেও সূর্য দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে আছে মদীনা শহর। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ভাড়া করা গাড়ী এল। আমরা রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গী হলেন সানাউল্লাহ ভাইসহ আরো দু'জন ভাই ও তাদের স্ত্রীরা।

কুবা মাসজিদের আঙিনায় থির থির করে কাঁপছে খেজুর পাতা। কুয়াশা ঘেরা আজকের কুবাকে আকর্ষনীয় লাগছে। এই কুবা পল্লীই আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এর হিযরতের প্রায় পাঁচ/ ছ'শো মাইল পথ অতিক্রমের পর প্রথম বিশ্রামস্থল। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের- ১ থেকে ১২ রবিউল আউয়াল ক্রমাগত এগারোদিন সফরের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুবাপল্লীতে উপনীত হন। আজকের চারশো বিশ কিলোমিটার তখন আরো অনেক বেশী হয়েছিল কেননা, তিনি মক্কা থেকে মদীনায় সোজাপথে না এসে এঁকেবেঁকে ঘুরপথে এসেছিলেন। এটি ছিল তাঁর একটি প্রজ্ঞাময় কর্মকৌশল। [ATLAS ON THE PROPHET'S BIOGRAPHY--Compiled by Dr.Shawqi Abu Khalil.]

মাসজিদে কুবায় নামায আদায়ের পর গাড়ি আমাদের নিয়ে ছুটে চলল। আমরা মদীনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো একনজর দেখে নিতে থাকলাম।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মদীনার বিস্তীর্ণ অঙ্গন চোখে পড়ল। এখান থেকে প্রতি বছর বিশ্বমানের শত শত ইসলামিক স্কলার বেরিয়ে আসেন, যারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের চেতনা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

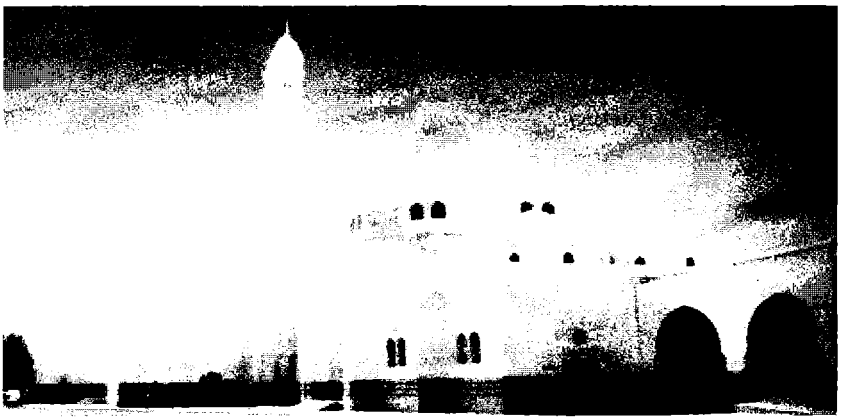

মাসজিদে জুম'য়া

মাসজিদে জুম'য়া দেখলাম- এখানে নবী (সঃ) প্রথম জুম'য়ার নামায আদায় করেন বলে ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। মদীনায় হিযরাতের পর কুবা পল্লীতে কয়েকদিন কাটিয়ে এক জুমাবারে মদীনা অভিমুখে রওনা হয়ে পথিমধ্যে তিনি জুম'য়ার নামায আদায় করেন। [Pictorial History of Madinah: Dr. Muhammad Ilyas, page-53]

মদীনাতেই সর্বপ্রথম কুরআন লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হয়, এখান থেকেই এখনও সারা পৃথিবীতে কুরআনের কপি প্রচারিত হতে থাকে। এজন্য মদীনাকে কুরআনের শহর বলা হয়। এখানে দেখলাম বিশ্বের বৃহত্তম প্রকাশনা কমপ্লেক্স হিসেবে গন্য কিং ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স। প্রতিবছর এখানে এক কোটিরও বেশী কুরআনের কপি প্রস্তুত করা হয়। বিশেষজ্ঞ ওলামাদের দ্বারা গঠিত শুদ্ধতা যাচাইকারী টীমের সার্বক্ষনিক তদারকীর মাধ্যমে কুরআনের নির্ভুল কপি এবং মূল আরবীসহ অন্ততঃ ৪০ টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করে বিশ্বের আনাচে-কানাচে কুরআনের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার কাজে এ কমপ্লেক্স নিয়োজিত। আমরা কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ *"The Noble Quran"* এর বেশ কিছু কপি সংগ্রহ করেছিলাম, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনযিরের আব্বুর বন্ধু সাইফুল্লাহ ভাই-এর মাধ্যমে।

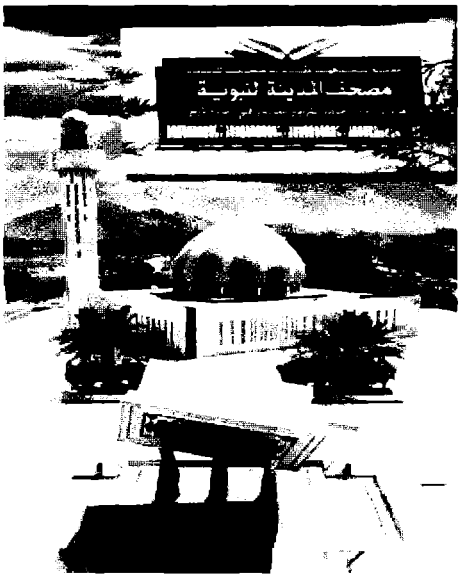

কুরআন সংরক্ষণের শহর মদীনায় বাদশা ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স।

এটি বিশ্বের বৃহত্তম প্রকাশনা কমপ্লেক্স।

মাসজিদে নববীর দু'এক কিলোমিটারের মধ্যে অনেক মাসজিদ রয়েছে যার প্রতিটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সংগ্রামী জীবনের টুকরো ঘটনার স্মৃতি-বিজড়িত। মাসজিদে আলী, মাসজিদে আবু বাকর, মাসজিদে উমার, মাসজিদে সা'দ বিন মুয়ায, মাসজিদে বিলাল, মাসজিদে সালমান ফারসী দেখলাম গাড়ি থেকেই।

মাসজিদে আবু বাকর

মাসজিদে আবি যার

মাসজিদে নববী হতে এক কিলোমিটার দূরে বাইতুলমালের এক বাগান ছিল। সেখানে নবী(সঃ) একদিন সালাতে দাঁড়ালে জিবরাইল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে এ সংবাদ নিয়ে আসেন যে, 'যে ব্যক্তি আপনার উপর দরুদ ও সালাম পাঠাবে আমিও তার জন্য ক্ষমা ও অনুগ্রহ পাঠাবো'। নবী (সঃ) আল্লাহর সীমাহীন মহত্ত্ব ও অনুকম্পার এ ঘোষনা শুনে কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত হয়ে এত দীর্ঘসময় যাবৎ ছিলেন যে তাঁর সাথী আব্দুর রহমান

বিন আওফ আশংকা করেছিলেন যে রাসূল (সঃ)এর মৃত্যু এসে গেছে কিনা। সেখানেই নির্মিত হয়েছে মাসজিদে আবিযার। [Pictorial History of Madinah: Dr. Muhammad Ilyas, page-69]

মাসজিদে ইজাবাহ সেই মাসজিদ, যেখানে নবী (সঃ) তিনটি দু'য়া করেন। প্রথম দু'টো ছিল যথাক্রমে দুর্ভিক্ষ এবং বন্যায় ডুবে যেন রাসূলের উম্মাতকে ধ্বংস করা না হয়- এ দু'টো আল্লাহপাক কবুল করেন। তৃতীয়টি ছিল উম্মাহর লোকজন যেন নিজেদের মাঝে রক্তপাত না ঘটায়- কিন্তু এটি তিনি ঝুলিয়ে রাখলেন। [সহীহ মুসলিম ২৮৯০] মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজনে রক্তপাতহীন হবার অপরিহার্যতাই ফুটে উঠেছে নবীজী (সঃ) এর দু'য়ায়।

মাসজিদে নববীর হাফ কিলোমিটার দূরে মাসজিদে সাবাক, নবম হিজরীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ মাসজিদের একাংশ জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন ও ঘোড়সওয়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে মহানবী(সঃ) ব্যবহার করেছেন। [Pictorial History of Madinah: Dr. Muhammad Ilyas, page-81] রাসূলুল্লাহ(সঃ) তাঁর সাহাবাদের সমন্বয়ে মানবতার কল্যাণের জন্য শান্তির সমাজ বিনির্মাণের যে আজীবন সর্বাত্মক সংগ্রাম সাধনা করেছেন তারই নীরব সাক্ষী যেন মাসজিদে সাবাক। ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই যে আল্লাহ রাসূল (সঃ)কে পাঠিয়েছেন, এ মাসজিদের ইতিহাস সেকথাই জানাচ্ছে।

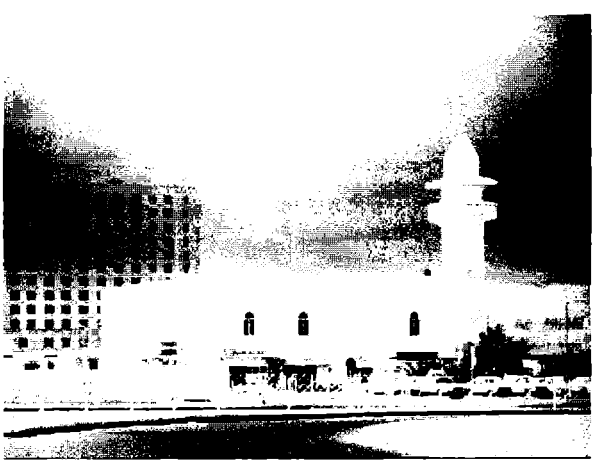

মাসজিদে সাবাক

মাসজিদে নববী থেকে ৩০৫ মিটার দূরে 'মাসজিদে মুসাল্লা' দেখলাম। নবী (সঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এখানেই ঈদের নামায পড়েছেন। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নবী (সঃ) তাকে একজন 'ভাল মানুষ' বলে আখ্যা দেন এবং এখানে তার গায়েবানা জানাযা পড়ান- মর্মে বুখারী শরীফের ৩৫৯৩ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। এ

মাসজিদেরই বর্তমান নাম 'মাসজিদে গামামা'। এ নামের কারণ হল, এ মাসজিদে রাসূল (সঃ) যখন ইস্তিস্কার নামায পড়ছিলেন, তখন একখন্ড মেঘ তাঁকে ছায়াদান করছিল। এটা ছিল তাঁর আরেকটি মুযিযা। মুহাম্মদ (সঃ) যে আল্লাহর রাসূল, এর আরেকটি সাক্ষ্য এ ঘটনাটি। যারা বিশ্বাসী তারা তা শুনেই বিশ্বাস করেছে অথচ যারা বিশ্বাসী নয় তারা তো মুযিযা দেখার পরও অবিশ্বাসীই রয়ে গিয়েছিল। সুতরাং দেড় হাজার বছর গত হলেও আমরা রাসূল (সঃ) ও তাঁর মুযিযা না দেখেও তাঁকে সত্যনবী, শেষ নবী বলে সচেতনভাবে বিশ্বাস করি, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করি। কাজেই, এখনও যারা বিশ্বাসী নন, তাদের সামনে ঐ সত্যের সাক্ষ্যদান আমাদেরকেই করতে হবে। অনুভবে সিক্ত দু'চোখ তুলে মাসজিদে গামামাকে দেখলাম আর আমার বিশ্বাসী মন সেই নিদর্শন প্রেক্ষণের আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

মাসজিদে গামামা

মাসজিদে নববীর যুহরের আযান শুনতে পেয়ে আমরা বাসায় না উঠে মাসজিদের গেটেই গাড়ি ছেড়ে দিলাম। নামাযের জন্য পেরেশান অবস্থায় তড়িঘড়ি গাড়ি বিদায় করতে গিয়ে আমরা পেছনের লকারে রাখা আমাদের ব্যাগটির কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। ফলে ছোট্ট হলেও হারিয়ে যাওয়ার একটি ঘটনা ঘটে গেল মদীনায়। মুনযিরের খাবার ও আমাদের দু'টো জায়নামায ছিল তাতে। মদীনার দুঃখ কষ্টে সবরের কল্যাণ সম্পর্কে নবীজী (সঃ)এর কথা স্মরণ করে আমরা আরেকবার সান্ত্বনা খোঁজার প্রয়াস পেলাম।

ইহরাম ঃ ভালবাসার পথ-পরিক্রমা

ইহরাম ও ভালবাসা

হজ্জ বা উমরাহর প্রথম ফরয--ইহরাম বাঁধা। আল্লাহর ভালবাসায়, তাঁর অতিথি হয়ে পথচলার প্রথম কাজ। তাঁর ঘর অভিমুখী এ সফরে মানুষের অনেকগুলো বৈধ কাজ ও আকাংখা তার জন্য সাময়িকভবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ যেন তাঁর ভালবাসায় অন্য সকল বৈধ ভালবাসাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একেবারে ভুলে থাকার চর্চা। সেই অতুলনীয় ভালবাসার পথ পরিক্রম করতে যাচ্ছি আগামী দিন। ভাবতেই মনটা আনচান করে উঠে।

২৫ডিসেম্বর সকাল থেকেই আগামী দিনের প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। আগামীকাল ইহরাম বেঁধে মক্কা অভিমূখে রওয়ানা হবার দিন। এজন্য গোছগাছ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং ইহরামের শর্ত ও নিয়মকানুনের মাসয়ালাগুলো ভালভাবে পড়াশোনা ও আলোচনা করে জেনে-বুঝে নিতে দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই পার হয়ে গেল। বিকেলে মাসজিদে নববীতে গিয়ে সালাতুল'আসর পড়লাম। তারপর মাগরিব আর ইশার নামায সেরে বাসায় ফিরলাম। রাতে সুপরিচিত অনেকেই বিদায় জানাতে আসলো।

রাসূলের (সঃ) ভালবাসার এ শহরে আবারও ফিরে আসার প্রত্যাশা নিয়ে ২৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ন'টায় আমরা মদীনা ছেড়ে মক্কার পানে ছুটেছি। মদীনা থেকে যুলহুলাইফা ৭/৮ কিলোমিটার পথ, দশটার আগেই পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জীবনের একমাত্র হজ্জ, বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। এখানে বিশাল মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে অনেক পরে। মাসজিদটি ঐ গাছের স্থানে নির্মাণ করা হয়, যেখানে সফরকালে তিনি বিশ্রাম নিতেন। তাই এর অপর নাম মাসজিদে শাজারা (গাছতলার মাসজিদ)। এটা মদীনাবাসীদের মীকাত হওয়ায় একে মাসজিদে মীকাত এবং মাসজিদে ইহরামও বলে। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, "রাসূল(সঃ) যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা করতেন তখন তিনি গাছতলার মাসজিদে সালাত আদায় করতেন। ফেরার পথে তিনি যুলহুলাইফা উপত্যকার মধ্যস্থলে সালাত আদায় করতেন। সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন।" [বুখারী:১৪৩৩,মুসলিম:১২৫৭]

উপত্যকার নামানুসারে একে মাসজিদে যুলহুলাইফা বলে। মদীনার বাসিন্দা ছাড়াও যারা মদীনা হয়ে মক্কা প্রবেশ করেন, তাদেরও মীকাত এটি। বিভিন্ন দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশকারীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মীকাত রয়েছে। মীকাত হচ্ছে সেই স্থান,যা অতিক্রম করার আগেই ইহরাম

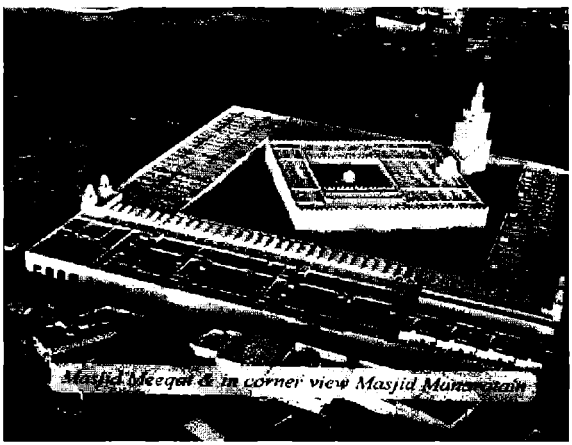

মাসজিদে যুলহুলাইফা, যা মদীনা হয়ে মক্কায় আগতদের মীকাত। একে মাসজিদে শাজারা, মাসজিদে মীকাত, মাসজিদে ইহরাম এবং মাসজিদে বীরে আলীও বলা হয়।

বাঁধতে হয়। আমাদের বাস এ মাসজিদের বিস্তীর্ন বহি:আঙিনায় থামলো। আমাদের মত শত শত হজ্জযাত্রী বাস থেকে নামছেন, আবার ইহরাম বেঁধে মক্কার পথ ধরছেন। আমাদের বাসের সব লোক নেমে গেলে পরে আমরা ধীরে সুস্থে নেমেছিলাম। মুনযির তখন আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে জেগে উঠে। মুনযির আর মুনযিরের আব্বু ইহরামের ড্রেস পরে এসেছিল, এখানে শুধু উযু নামায সেরে নিয়াত বাঁধা। আমাদের হজ্জ তামাত্তু, এজন্য উমরাহর ইহরাম বাঁধলাম। হজ্জের ইহরাম বাঁধব ৮যিলহজ্জ মক্কায়, ইনশাল্লাহ।

মাসজিদের ভেতরে উযু ও গোসলের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা সুব্যবস্থা আছে। মহিলাদের নামাযের কক্ষ আলাদা। ইহরাম বাঁধার পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে এসেছি মদীনার বাসা থেকেই। যাদের বাকী ছিল তারা এখানে সেরে নিলেন। উযু করে দু'রাকাত নামায আদায়ের পর আমরা উমরাহর নিয়াতে ইহরাম বাঁধলাম। মাসজিদের ভেতরে মহিলারা পরস্পর পরস্পরকে সহীহ উচ্চারণে ইহরামের নিয়াত ও তালবিয়া পাঠে সহযোগিতা করছিলাম। তালবিয়া পাঠের পর মনে হল, পৃথিবীর জিন্দেগীর চাওয়া-পাওয়া আর আমার দেহমনের মাঝে এক সুক্ষ্ম দেয়াল তৈরী হয়ে গেছে। এক অপ্রকাশ্য আনন্দে দুলে উঠল মনপ্রাণ। এতকালের স্বপ্ন আর আশা বাস্তবে রূপ লাভের পথ খুঁজে পেল। দলবেঁধে সব মহিলারা নিচুস্বরে তালবিয়া পড়তে পড়তে বাসে উঠে বসলাম। পুরুষরা তালবিয়া পড়ছেন উচ্চস্বরে। সারাটা বাসজুড়ে তালবিয়ার উচ্চারণ ছাড়া কোন শব্দ নেই। সব যাত্রী এসে গেলে বাস ছেড়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে একক কণ্ঠের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণ গুলো পরস্পর মিলে যেতে লাগল। মিলতে মিলতে একসময় সবার কণ্ঠ এক হয়ে সমন্বিত উচ্চারণ শোনা যেতে লাগল,

লাব্বাইক,আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।"– **here I'm, O Allah here I'm** , হে আল্লাহ ! [আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে] আমি উপস্থিত হয়েছি।"

লাব্বাইক, লা শারীকা লাকা লাব্বাইক।–"আমি হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আপনার কোন শরীক নেই।"

ইন্নাল'হামদা ।--"নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা শুধু আপনার।"

ওয়ান্- নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক্।–"এবং সমস্ত নিয়ামত শুধু আপনার। আর সার্বভৌমত্বও আপনারই।"

লা-শারীকা লাক্।–"আপনার কোন শরীক নেই।"

হৃদয়ের নিংড়ানো উচ্চারণ। ভেতর থেকে পুনরাবৃত্তি হতে থাকল শতকণ্ঠে, বারবার.....।

ইহরাম বেঁধে বারবার এ তালবিয়া পাঠ করতে হয়। কেননা এতে রয়েছে আত্মনিবেদনের সম্মিলিত এক ঘোষণা। এ যেন আল্লাহর নামে শপথদীপ্ত এক কাফেলার সত্যের সাক্ষ্যদানের ঐতিহ্যগত রীতি। যেন মহান আল্লাহর শরীকহীন সার্বভৌমত্বের প্রতি, অগনন নিয়ামাতের প্রতি আস্থার ঘোষণা। তাঁর আতিথেয়তার আহবানে সম্মিলিত সাড়া প্রদান। তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত হয়ে এক অপার্থিব সুখানুভূতি নিয়ে দুর্বার পথচলা। বাসের দুরন্ত গতির সাথে তালবিয়া পাঠের উচ্চকিত শব্দের মাঝে নিজেকে বিলীন করে ছুটে চললাম মক্কার পথে ।

হিজাব, নিকাব ও মহিলাদের ইহরাম

মহিলাদের ইহরাম বাঁধা বলতে, কেউ কেউ এক টুকরো কাপড় বা টুপি দিয়ে মাথা শক্ত করে বেঁধে রাখাকে বুঝে থাকেন। অনেকে আবার সালোয়ার, কামিজ, ওড়না, বোরখা সব সাদা পরাকেই ইহরাম মনে করেন। সুস্পষ্টভাবে জেনে বুঝেই আল্লাহর ঘরমুখী এ সফরে বের হওয়া জরুরী। নানা ভুল ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, অনেককেই দেখলাম কুরআন-সুন্নাহের কোন ভিত্তি নেই এমন বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন অথচ হিজাব ও ইহরামের ফরয পালনে উদাসীনতা এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাচ্ছে।

ইহরামের পোশাক বলতে বুঝায় দু-টুকরো সাদা সেলাইবিহীন চাদর যা পুরুষদের পরিধেয়। মহিলাদের জন্য নিত্য ব্যবহার্য পোশাকের উপর একটি আলাদা ঢিলেঢালা এবং ভারী (নন-ট্র্যান্সপারেন্ট) আবরণ দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে নিলেই হয়। এ আবরণটি আবার আঁটসাট বা পাতলা হলেও তা মানসম্মত হয়না। রাসূল(সঃ) বলেন,"যে সব নারী এত পাতলা পোশাক পরে যে শরীরের রং দেখা যায়, এবং অহংকারীর মত হেলেদুলে পথ চলে সেসব নারী জান্নাতের ঘ্রাণ থেকেও বঞ্চিত থাকবে, যা বহুদূর থেকেও পাওয়া যায়।।"[সহীহ মুসলিম:কবীরা গুনাহ,পৃ:১৭১]

শুধু ইহরাম অবস্থায় নয়, সকল সময়ই অন্য পুরুষদের সামনে চলাচলের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলারা সর্বসম্মতভাবে এই ড্রেসকোড মেনে চলা জরুরী বলেই জানেন, যাকে হিজাব বলে। হিজাব পরিধান না করে অন্য সময় যেমন বাইরে যাওয়া যায় না, ইহরাম

অবস্থায়ও তাই। সাধারণ পরিবেশে মুখমন্ডলের সৌন্দর্য আড়াল করার জন্য নিকাব দেয়া হয়, কিন্তু ইহরাম অবস্থায় মুখমন্ডল খুলে রাখার নির্দেশ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল(সঃ), ইহরাম অবস্থায় আমাদের কী ধরণের পোশাক পরিধান করার নির্দেশ আপনি দেন? জবাবে রাসূল (সঃ) বলেন–"জামা, পাজামা, পাগড়ি, টুপি এবং মোজা পরবে না। তবে যার জুতা নেই সে চামড়ার মোজা টাখনুর নিচে কেটে পরিধান করবে। তোমরা জাফরান ও ওয়ারস রঙে রঙিন কোন পোশাক পরবে না। আর ইহরাম বাঁধা মেয়েরা মুখ নিকাব দ্বারা ঢাকবে না ও হাতে দস্তানা পরবে না ।" [সহীহ বুখারী ঃ ১৭০৬]

মহিলাদের ইহরামের বেলায় হিজাবের ঢিলেঢালা পোশাক অবশ্যই পরতে হবে; সেটা জাফরান আর জর্দা রঙ ছাড়া যে কোন রঙের হতে পারে। তবে পাতলা এবং আঁটসাট হবেনা। কোন কোন দেশের মহিলারা এ ধরণের নির্দিষ্ট বর্ণের পোশাক ও চিহ্ন লাগিয়ে নেন, যাতে ভিড়ে হারিয়ে না যান।

হিজাব এবং নিকাব আমরা অভ্যাস বশতঃ বা প্রথাগত কারণে করি না। বরং সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া সীমা মেনে চলার তাগিদে করি। আল্লাহর হুকুম যখন যেখানে যেমন, সেভাবে পালন করাই ইসলাম। ইচ্ছের অনুসরণ করা নয়। রাসূলের যুগেও ইহরামকালে মহিলারা নিকাব দেননি। চেহারার সৌন্দর্য প্রভা অন্য পুরুষের দৃষ্টির আড়াল করার জন্য ইহরাম অবস্থায় অন্য পুরুষ নিকটবর্তী হলে মাথার চাদর উপরের দিক থেকে টেনে মুখ আড়াল করতেন, আবার চলে গেলে সরাতেন ।

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা রাসূল(সঃ) এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। আরোহীরা তখন আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তারা আমাদের বরাবর এলে আমরা প্রত্যেকে স্বীয় চাদর মাথার উপর থেকে টেনে মুখ আড়াল করতাম। অতিক্রম করে চলে গেলে আমরা মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলতাম।" [আবু দাউদ]

ইহরাম বাঁধার স্থানে, হজ্জ ও উমরাহর চলাচলতির পথে সারাক্ষণই অজস্র পুরুষের মুখোমুখী হতে হয়, কোথাও সেকালের মত নিরিবিলি নেই। আমরা হিজাবের জন্য ঢিলেঢালা ও ভারী, নন-ট্র্যান্সপারেন্ট লংড্রেস হিসেবে বোরকা, জিলবাব, আবায়া, মানতু পরিধান করার পর, স্কার্ফ বা ওড়না মাথার সামনের দিকে যথাসাধ্য টেনে চেহারা আড়াল করতে পারি। সেইসাথে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রন করে, কণ্ঠস্বর ও মুখ নিচু রেখে, চেহারায়

গাম্ভীর্য বা formal attitude বজায় রেখে ইহরাম ও হিজাব উভয়টির মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারি।

আরেকটি দিক হল, পৃথিবীর জীবনের আরাম, সুখ, আবেগ, আশা-আকাংখা, লাভ-ক্ষতি, অন্যের সমালোচনা এসব আলাপকালে মানুষের চেহারায় স্বভাবসুলভ আবেগ-উচ্ছ্বাস ফুটে উঠে। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় এ ধরণের আলোচনা খুবই আপত্তিকর। ইহরামের সময়টা বেশী বেশী দু'য়া, যিক্‌র ও তালবিয়া পাঠ করে, আল্লাহর ভয়ে চিন্তান্বিত ও তাঁর ক্ষমার আশায় আশান্বিত অবস্থায় কাটানো উচিত। নিজ জীবনের গুনাহের স্মরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় কারো চেহারায় হাস্যোজ্জ্বল আকর্ষনীয় রূপ ফুটে উঠার অবকাশ থাকেনা। অন্যদিকে, অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিপাত পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য সকল অবস্থায়ই গুনাহের কারণ। আর ইহরামকালীন যে কোন গুনাহের কাজে, ইহরামমুক্ত সময়ের চাইতে অধিকতর গুনাহ। ইহরাম বন্ধনকারী নারী-পুরুষ সকলেই দৃষ্টি-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইহরামের পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর বিদায় হজ্জ কালীন ঘটনাটি স্মরণীয়, যেখানে একজন মহিলা তার বৃদ্ধ পিতার পক্ষে হজ্জ করার অনুমতি চাইতে রাসূলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বাহনের উপর, নবী (সঃ) এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন ফযল বিন আব্বাস(রাঃ)। মহিলা এবং ফযল পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিলেন।" নবী (সঃ) বার বার ফযল (রাঃ)-র মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে থাকলেন।" [সহীহ বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায় / ১৪১৬]
এখানে লক্ষনীয় যে, হজ্জের সময় নবী (সঃ) মহিলাকে চেহারা ঢাকতে নির্দেশ দেননি বরং পুরুষকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের তাগিদ দিয়েছেন। আর কুরআনে তো দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সকল সময় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জরুরী বলা হয়েছে [সূরা নূর-৩০ ও ৩১]।

ইহরামের সময় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনেককেই দ্বিধাগ্রস্ত দেখেছি। নিজেকে এ থেকে বাচাঁনোর জন্য ইহরাম বাঁধার আগে হজ্জ ও উমরাহ বিষয়ক বই পড়ে, আলেমে দ্বীন ও দ্বীনি বোনদের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে ভালভাবে জানার ও বুঝার চেষ্টা করেছি। কাফেলার অন্যান্য বোনদের সাথেও মদীনায় বসে মতবিনিময় করেছি। কারণ হজ্জের সফরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় ক্ষেপণের সুযোগ নেই।

ইহরামের সময় নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর কয়েকটি পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য common, কয়েকটি শুধু মহিলাদের জন্য আর কয়েকটি শুধু পুরুষদের জন্য। দারুস সালাম প্রকাশিত History of Makkah: Safiur Rahman, বইটি থেকে এ বিষয়ে খুব clear conception পেয়েছি, এভাবেঃ

***<u>Those which are forbidden for males and females alike:</u>**

1. Removing hair,
2. Cutting nails,
3. Using perfume after intering Ihram,

4. Intercourse and whatever leades to it such as getting marriage, looking with desire, kissing etc.
5. Wearing gloves,
6. Killing game.

***Those which are forbidden for male only:**

1. Wearing sewing germents,
2. Covering the head.

***That which is forbidden for female only**: There is only one thing, namely `Niqab' (veil), i.e., it is forbidden for female to wear over her face.

[History of Makkah: Shaikh Safiur Rahman, Darussalam.Page-134]

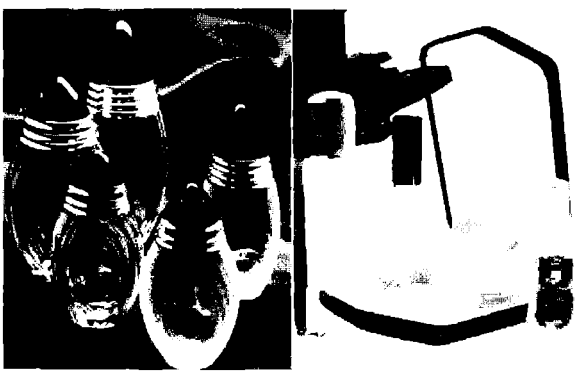

ইহরাম বাঁধার পর চুল বা নখ কাটা, শিকার করা বা হাত মোজা পরার মত সুগন্ধি ব্যবহার করাও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এক সাধারণ নিষিদ্ধ বিষয়।

পুরুষেরা ইহরাম বাঁধার আগে সুগন্ধি মেখে নিলে সমস্যা নেই, কেননা নবী(সঃ)বিদায় হজ্জের ইহরাম বাঁধার আগে সুগন্ধি মেখেছিলেন। সুঘ্রান যদি কাপড়ে বা শরীরে থাকে তাতেও অসুবিধা নেই। কিন্তু ইহরাম এর নিয়তের পর একেবারেই নিষিদ্ধ। আতর, সেন্ট, সুগন্ধী সাবান, যে কোন সুগন্ধী কসমেটিকস বা টয়লেট্রিজ এ নিষেধের আওতাভূক্ত। কিন্তু মহিলাদের ইহরাম বাঁধার অধিকাংশ সময় বাইরে কাটাতে হয় তাই তারা ইহরাম বাঁধার আগেও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না, পরেও না। কেননা মেয়েদের জন্য ঘরের বাইরে যেতে সুগন্ধি দেয়া হিজাবের পরিপন্থী।

ছোট্ট মুহরিম ঃ মুনযির মুনীফ

এক বছর সাত মাস বয়েসী মুনযির এখানে এসে প্রথম 'বিসমিল্লাহ' বলতে শিখল। ইহরাম বাঁধার পর ওকে তালবিয়া পড়ে শোনালাম। শুনে বলল,'লাব্বা','লাব্বা', 'আল্লা','আল্লা','বাবা','মাম'। কাফেলার সবচেয়ে কনিষ্ঠ মুহরিম মুনযির মুনীফ। মদীনা থেকেই সে তার বাবার মত ইহরামের পোষাক পরেছে। নিচের ইজারটি বেল্টের সাথে আটকে দিয়েছিলাম যাতে খুলে না যায়। কিন্তু গায়ের চাদর আলগা থাকায় বারবার

খুলে যাচ্ছিল। ওর আব্বুর সাথে যুলহুলাইফায় নামাযের জন্য দাঁড়ালে এক হাজ্জা ভাই নিজের সেফটিপিন দিয়ে সযত্নে ওর চাদর আটকে দেন। আল্লাহ তাকে জাযা দিন। মুনযিরের আব্বু মুনযিরের পক্ষ থেকে ওর উমরাহর ইহরাম বেঁধেছেন। হারামের মর্যাদাকে সামনে রেখেই এতসব করা; বড় হলে অবশ্য মুনযিরকে নিজের ফরয হজ্জ নিজেই আদায় করতে হবে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে মরুবালি উত্তপ্ত হয়ে উঠার কথা । কিন্তু সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা থাকায় সূর্যের দেখা নেই। এজন্য আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক। সকাল সাড়ে ন'টায় মদীনা ছেড়ে যুলহুলাইফা পৌঁছি দশটায়। এখন এগারটা। ছুটে চলছি মক্কার পানে। প্রায় ঘন্টাখানেক পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম তালবিয়ার সুমধুর আওয়াজ। ক্লান্ত দু'চোখে ঘুম নামছে অনেকের। এক, দুই জন করে নিঃশব্দ হতে হতে একসময় পুরো বাস নীরব। মুনযিরের আব্বু মধ্যরাত থেকে জেগে ইহরামের প্রস্তুতি নিয়েছেন। উনিও ঘুমাচেছন নিশ্চিন্তে। মুনযির জেগে আছে বলে এ নৈঃশব্দে আমারও জেগে থাকা। মুনযিরের একঘেঁয়েমী কাটাতে মদীনা থেকে কিছু খেলনা কিনেছিলাম। বাসে বসে ও এসব খেলনা গাড়ি, ট্রেন, প্লেন, বাস, বেলুন খেলা করে আর মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সময়মত খাবার খাইয়েছি। সেরেলাক, কেক, দুধ, বিস্কিট, আপেল। কখনো জ্যুস, খেজুর, কমলা এসব।

জার্নিতে ছোট শিশুদের বেশ ঠান্ডা লাগে। কখনো গরমে ঘাম শুকিয়ে আবার কখনও বেশী বাতাসে। ধুলাবালি ওড়ায় এবং এটা ওটা মুখে দেয়ায় পেটের সমস্যাও ঢের হয়। এজন্য বেশ সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হয়েছে। ঠান্ডা আর পেট খারাপের ঔষধ সবসময় সাথে রেখেছি। খাবার স্যালাইন রেখেছি। অল্প অল্প করে বার বার পানি বা জ্যুস দিয়েছি। মরুর আবহাওয়া আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী শুকনো। প্রচুর পানি না খেলে ছোট-বড় যে কারোই হঠাৎ পানিশূণ্যতা দেখা দিতে পারে। সবারই এখানে প্রচুর পানি এবং জ্যুস খাওয়া দরকার। অনেকে বাথরুমের সমস্যার কথা চিন্তা করে পানি খাওয়া কমিয়ে দেন এবং এতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এটা ঠিক নয়। এখানে বাস জার্নিতে কয়েক জায়গায় ব্রেক দেয়া হয়। আর যে কোন রেস্টুরেন্ট বা মাসজিদে টয়লেট available. সবসময় ব্যাগে বা পকেটে প্রচুর টয়লেট টিস্যু রাখলে আর সমস্যা হয়না।

মুনযিরকে একটু পর পর ন্যাপি বদলে, ভেজা টিস্যু দিয়ে হাত-মুখ-শরীর মুছে দেয়ায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। মাঝে মাঝে বাবা বাবা করে ওর আব্বুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও বেশীর ভাগ সময় সেঁটে আছে আমার সাথে। আমরা বাসের পেছনের লম্বা সিট পুরোটা নিয়েছিলাম। মুনযির ইচ্ছেমত শুয়ে বসে কাটাচ্ছিল। ওর জেগে থাকার পুরো সময়টা ওকে সঙ্গ দিতে হচ্ছিল, তাই ওর ঘুম ছাড়া আমার চোখের পাতা এক হবার কোন সুযোগই ছিলনা।

মরুর বুকে পথচলা

জেদ্দা থেকে মদীনা যাবার সময়টা ছিল মধ্যরাত। মরুর রুক্ষতা সেদিন চোখে দেখতে পাইনি। বরং বেশ শীতল এবং ঘুম ঘুম আরামের ভেতর দিয়ে পথটা পেরিয়েছি। আজকে অন্যরকম। মরুর ঊষর প্রকৃতিকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলাম । প্রশস্ত রাস্তার দু'পাশে ধূসর মরুমাটি ধূ-ধূ করছে। দিগন্তের ওপাশে গেলে যেন আকাশ ছোঁয়া যাবে। মাঝে মাঝে দু-চারটে কাঁটাঝোঁপ ছাড়া সবুজের ছিটেফোঁটা মাত্র নেই। খানিক পর পর পাহাড়ী ভূমি। দূরে পাহাড়, কখনো পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা। রাস্তার পাশে দু'চারটি উট, দুম্বা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ-জন চোখে পড়ছেনা তেমন।

মাঝে মাঝে প্রচন্ড ধূলিউড়া মরুঝড়ের ধূসর আবরণে চারিদিক ঢেকে যাচ্ছিল। সূর্যের দেখা নেই বলে আজ বাতাস শীতল। ধূলির জন্য জানালা আটকে রাখায় মাঝে মাঝে বাসের ভেতরটা গুমোট হয়ে উঠলে আমরা জানালা একটু করে খুলে দিতাম। তাতেই চোখ-মুখ ধূলোয় একাকার। এ সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ইসলামের সুবাতাস দিক্ বিদিকে ছড়িয়ে দিতে কতইনা শ্রম ঢেলেছেন এ মরুর বুকে! অতুলনীয়।

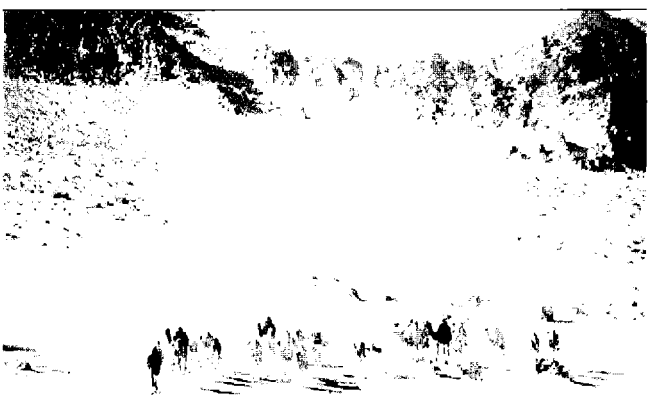

মরুর কঠিন প্রকৃতি, যাকে একেবারে কাছে থেকে না দেখে অনুভব করা কঠিন।

বাসের ভেতরে যিনিই সজাগ হচ্ছেন, তিনিই তালবিয়া পড়ে চলছেন। একজনের আওয়াজ অন্যদের জাগিয়ে তুলছে। তখন আবার সমস্বরে সবাই পড়ছেন। পড়তে পড়তে কণ্ঠ ঝিমিয়ে আসছে....হালকা ঘুম, আবার জেগে উঠা এবং পড়তে থাকা....এভাবে দুপুর গড়িয়ে গেল। বাসের দায়িত্বশীল ভাইরা এবং এজেন্সীর গাইডরা ঠিক করলেন যে, দিনের আলোয় মক্কা পৌঁছুতে হবে এবং কোথাও থামা হবেনা। শুকনো খাবার যা ছিল, তা দিয়ে লাঞ্চ সেরে নেয়ার চেষ্টা করলাম। তায়াম্মুম করে যুহর পড়ে নিলাম বাসেই। বেলা তিনটে নাগাদ বাস এক রেস্তোরাঁর সামনে থামলো। ড্রাইভার জানালো, তার খাওয়া ও বিশ্রাম দরকার। সুতরাং যাত্রাবিরতি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার নেই। অনেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন মেটাতে নেমে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরাও নামলাম।

জনশূন্য মরু প্রান্তরে মাঝারি আকৃতির একতলা রেস্তোরাঁটির ম্যানেজারসহ বেশীর ভাগ ষ্টাফ বাংলাদেশী-চট্টগ্রামের লোক। মেয়েদের জন্য একটা টেবিল পর্দাঘেরা, সেখানে বসে খেয়ে নিলাম। একজনের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার আমরা তিনজনে খেলাম। বড় একবক্স ভাতের সাথে তিন টুকরো সমান বড় আস্ত মাছের ভুনা। যে পরিমানে পরিবেশন করা হচ্ছে কেউই সম্পূর্ণ শেষ করতে পারছেনা। প্রচুর খাবার নষ্ট হচ্ছে। এটা এড়াতে পারলে খুব ভাল হত। অপচয়কারীর সাথে ইবলিসের যে ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে অনেককেই সচেতন বলে মনে হল না। উম্মাহর দারিদ্র ও পশ্চাৎপদতার এটিও একটি অন্যতম কারণ কিনা, মনের জানালায় এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে ঝুলে রইল।

রেস্টুরেন্টের পাশে কয়েকটি একতলা ঘর--স্টাফদের বাসা হবে হয়ত। এছাড়া চারদিক ফাঁকা- বালির সমুদ্র যেন। খোলা মাঠ পেয়ে মুনযিরের রিক্রিয়েশান হল চমৎকার ভাবে। মুনযির খুব ছুটোছুটি আর দৌড় ঝাঁপ করল। আমাদের সহযাত্রী ছোট্ট মেয়ে ফারাহ আর ওর বড়বোন সাফা ওদের ছোট্টবন্ধু মুনযিরের চঞ্চলতা উপভোগ করছিল বেশ মজা করে। তিনজনে বেশ জমলও। ওখানে অনেকগুলো বিড়ালকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেখে মুনযিরের আনন্দ আর ধরেনা।

"আপা। আপা। মিউ আন। ঐ যে মিউ।" সাফা আর ফারাহ তো হেসেই আকুল।

"হাজ্জা। হাজ্জা। ছোট্ট ভাইয়া, তুমি মিউ ধরবে কেন? তুমি ইহরাম বেঁধেছ না?"

প্রায় সাড়ে চারটায় বাস ছাড়ল। আসর এবং মাগরিবের নামায আমরা বাসেই পড়লাম। মক্কা পৌঁছাতে আমাদের সন্ধ্যা হলেও মাঝের এ যাত্রাবিরতির সময়টুকু মুনযিরের বেশ আনন্দে কেটেছে। পরবর্তী কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করার জন্য এ relaxation খুব প্রয়োজন ছিল।

O Allah! Here I'm [লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক]

দিনের আলোয় সাজানো স্বপ্নগুলো আবার নতুন করে রাতের আঙ্গিকে সাজাতে চেষ্টা করলাম। বিকেলের শেষ প্রান্তে Haram area begins লেখা বিশাল সাইনবোর্ড নজরে এল। মুহূর্তের মধ্যে সবার মাঝে নতুন প্রাণের সাড়া জাগল। উঁচুস্বরে 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক.....' ধ্বনিত হতে লাগল বাসজুড়ে। দু'পাশে আরো বাসভর্তি মানুষ; কেউ সাদা, কেউ বাদামী, কেউ একেবারেই কালো। এদের কেউ আফ্রিকান, কেউ ইংরেজ, কেউ আরব, কেউ তুর্কী, কেউ এশিয়ান -- নানা দেশের, নানা রংয়ের, নানা চেহারার, নানা ভাষাভাষী নারী আর পুরুষ। সবাই এক আল্লাহর অতিথি। কেউ মৃদুস্বরে কেউবা উচ্চস্বরে একই ধ্বনি উচ্চারণ করছে। সবারই চোখে-মুখে উপচে পড়া আনন্দে দীর্ঘপথ ভ্রমনের ক্লান্তি বুঝা যাচ্ছে না মোটেও। আল্লাহর অতিথিদল কাবার নিকটবর্তী হচ্ছে আর বেড়ে চলেছে তাদের আনন্দ-উদ্দীপনা।

তালবিয়ার উচ্চকিত আওয়াজ আর একবারও ঝিমিয়ে পড়েনি। চলতে থেকেছে, কখনো উঁচু কখনো মাঝারী আওয়াজে। প্রায় আধঘন্টা পর বাস এসে থামল একটি বহুতল

হারাম এলাকা
এখানকার মর্যাদাই আলাদা।
প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত।

ভবনের সামনে। এখানে লোক গণনা চলল বার কয়েক। বাসের সামনের সিট থেকে শুরু করে পেছন পর্যন্ত একবার, পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত আরেকবার–এভাবে বারবার গণনার পালা চলছিল। আমাদেরকে মুয়াল্লিমের ঠিকানা সম্বলিত একটি করে ব্যান্ড দেয়া হল। দেশে ফেরা পর্যন্ত একমাত্র এই ব্যান্ড-ই আমাদের পরিচয় বহন করবে। এজন্য আমাদের গাইড সর্বক্ষণ ব্যান্ডটি হাতে পরে থাকার জন্য এবং কোন অবস্থাতেই না খোলার অনুরোধ করলেন। বাস আসছে, যাচ্ছে, একের পর এক। এখানে আল্লাহর মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এক বোতল যমযম আর এক প্যাকেট করে শুকনো খাবার পরিবেশনের পরে বাস ছাড়ল। এর পরের সময়গুলোতে এক সুনিবিড় উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ বোধ করছিলাম যে কখন সেই মুহূর্তটি আসবে যখন আমি মহাসম্মানিত সেই গৃহের কাছে যাব আর আমার একমাত্র রবের কাছে প্রাণখুলে চাইতে থাকব যা কিছু আমার নিজের জন্য, আমার পরিবার, স্বজন, স্বজাতি ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর। ঠিক এরকম ভালবাসার টান আগে কখনো কোন বিষয়ের প্রতি অনুভব করেছি কিনা মনে পড়েনা।

মক্কার যত ভেতরে প্রবেশ করছি রাস্তাজুড়ে ততই ভিড় বাড়ছে। ইশার নামাযের পর পায়ে-হাঁটা ঘরমুখো মানুষের ভিড়, নানা দিক থেকে আগত হজ্জ কেন্দ্রমুখী বাসের বহর, দায়িত্বরত পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, ওয়াটার সাপ্লাইয়ার ট্যাংকার, খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বোঝাই ট্রাক কোনটা ভিড়ছে, কোনটা 'খালাস' 'খালাস' বলে চলে যাচ্ছে। ভিড় কেটে কেটে হাফ কিলোমিটার পথ পার হতে প্রায় একঘন্টা লেগে গেল। বাস যত এগুচ্ছে হৃদয়ের ততই ভেতর থেকে সাবলীলভাবে 'লাব্বাইক' ধ্বনি উৎসারিত হচ্ছে। হৃদস্পন্দনের মতই নিবিড় সে অনুভব।

আল্লাহর অতিথিদের শহর মক্কায়

পৃথিবীর প্রথম শহর বাক্কা বা মক্কা। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ(সঃ)এর প্রিয় জন্মভূমি। কুরআন নাযিল শুরু হবার শহর। প্রথম ইসলাম কবুলের শহর। সম্মানিত ঘরের নগরী। নিরাপত্তা ও শান্তির নগরী। সেই মহিমান্বিত নগরে প্রবেশ করে মহান আল্লাহর অতিথি

হবার সম্মান লাভ করতে যাচ্ছি ভাবতেই আনন্দে মন ভরে যাচ্ছিল। নিজ সন্তান, আপনজন এবং চেনাজানা যারা এ পর্যন্ত আসতে পারেননি তাদের জন্য প্রাণভরে দু'য়া করছিলাম যেন আল্লাহপাক তাদেরকে তাঁর সুরক্ষিত এই শান্তি, নিয়ামাত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য দান করেন।

মক্কায় প্রবেশের পর পুনরায় অনুভব করলাম, কোন অস্থিরতা নয়, এক ধীর-স্থির অকৃত্তিম নিবিড় আতিথেয়তা যেন আমাকে কাবার দিকে টানছে। যে কাবা পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর। যে ঘরকে সামনে রেখে বিশ্বের শত কোটি মানুষ রোজ রোজ আল্লাহর সমীপে বিনত হয়ে থাকি। যে ঘর ফিরিশতা জিবরাইল(আঃ) এর সহযোগিতায় প্রথম মানব প্রথম নবী হযরত আদম(আঃ)নির্মাণ করেছেন। পূনঃনির্মাণ করেছেন পিতা ইবরাহীম(আঃ)। শেষ নবী মুহাম্মদ(সঃ) যে ঘরকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি নিজে যে ঘরের তাওয়াফ করেছেন। আর আল্লাহপাক স্বয়ং যে ঘরের তাওয়াফ করা পছন্দ করেছেন। মনে হল এ টান কেবল এ ঘরের নয়, যিনি আমাকে অতিথি করে এখানে এনেছেন, তাঁর। কেননা, "আল্লাহ সম্মানিত কাবাগৃহকে মানব জাতির স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন।" [সূরা মায়িদাঃ ৯৭]

"এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহিমের জন্য বাইতুল্লাহর স্থান নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমার সাথে কোন শরীক করো না। আর আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, কিয়ামকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো। আর মানুষের নিকট হজ্জের আহ্বান জানিয়ে দাও। তারা প্রত্যেকে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও ক্ষীণকায় (ভ্রমণক্লান্ত)উটের পিঠে চড়ে তোমার কাছে আসবে, যাতে এখানে তাদের জন্য যে কল্যাণ রাখা হয়েছে তা তারা দেখতে পায়।" [সূরাহজ্জঃ ২৬-২৮]

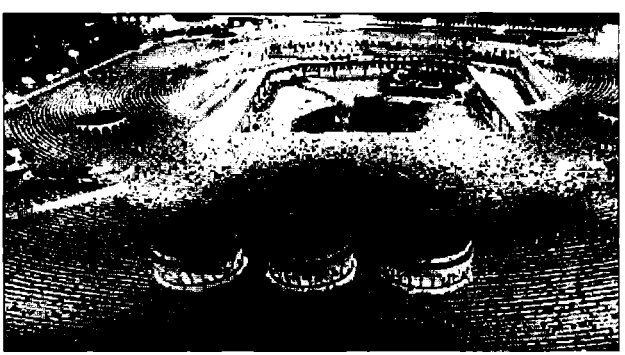

যতই এ ঘরের কাছে যাওয়া হয়, নিজ রবের প্রতি ভালবাসার অনুভব ততই যেন বাড়ে।

আল্লাহ আরও বলেন, "আর তারা যেন তাওয়াফ করে সম্মানিত প্রাচীন গৃহের।" [সূরা হজ্জঃ ২৯]

আর কোন ঘর পৃথিবীর বুকে নেই যার তাওয়াফ করা হয়। পৃথিবীতে কেবলমাত্র এ ঘরেই জান্নাতের পাথর রয়েছে। এ ঘরের তাওয়াফ ছাড়া আল্লাহর অতিথিদের হজ্জ সুসম্পন্ন হয়না। কাবামুখী না দাঁড়ালে নামায হয় না। মানব জাতির জন্য এটি সর্বপ্রথম

ঘর। এত সুপ্রাচীন ঘর পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আল্লাহপাক বলেছেন, "নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো মক্কায় অবস্থিত, যা বিশ্ব বাসীর জন্য হিদায়াত ও বরকতময়।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৯৬]

এই 'বাইতুল আতিক'–সম্মানিত প্রাচীন গৃহের ডাক হৃদয়ের ভেতর থেকে শুনছিলাম আর তাওয়াফের ব্যাকুলতা অনুভব করছিলাম। আর তখন তালবিয়ার প্রতিটি শব্দ অর্থবহ হয়ে আমার হৃদয়ে তোলপাড় করছিল। এভাবে তালবিয়ার হৃদয় নিংড়ানো অনুরণন আর অনুভবের রোমন্থন হতে হতে হতে.....হঠাৎ দেখি বাস থেমেছে। আমরা পৌঁছে গেছি! কাফেলা পরিচালক জনাব সালেহ আকবর ভাই হাসিমুখে আমাদের রিসিভ করলেন। রাত তখন আটটা।

গাইডদের সহযোগিতায় মিসফালাহ রোডে নির্ধারিত বাসায় লাগেজ তুলে রেখে আমরা তাওয়াফের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম। মুনযিরের শরীর স্পঞ্জ করে দিলাম। ন্যাপি, ড্রেস সব চেঞ্জ করে দিলাম। আমরাও পবিত্র হয়ে, ফ্রেশ ড্রেসড হতেই দেখি ইতিমধ্যে লোক এসে রাতের খাবার দিয়ে গেছে। মুনযিরকে খাওয়ালাম,আমরাও খাবার খেয়ে নিলাম। এরপর আমরা জনাবিশেক নারী-পুরুষ তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফের জন্য মাসজিদে হারামের দিকে এগিয়ে চললাম। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সারাদিনের জার্নির পর সাধারণতঃ এতরাতে ক্লান্ত শরীর ঝিমিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু এখানে একেবারেই ভিন্ন অনুভূতি। বিশ্রামের কোনরকম চাহিদা বা আগ্রহমাত্র অনুভূত হচ্ছিলনা। মুনযির আর মুনযিরের আব্বুরও একই অবস্থা। আমরা নই শুধু। গলিতে নেমে দেখি সদ্য আগত শত শত নারী-পুরুষ তালবিয়ার উচ্চারণের সাথে সাথে পায়ে হেঁটে চলেছে মাসজিদে হারাম অভিমুখে। আমাদের ছোট্ট মুনযিরের মত ইহরাম পরা শিশুর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়।

বড় রাস্তায় উঠে দেখি জনস্রোত বেড়ে চলেছে। যেন এক জাগরণ, এক উত্থান। এভাবেই যদি মুসলিম উম্মাহ জেগে উঠত! মানুষের নিজের গড়া জীবন পদ্ধতির পরিবর্তে নিজের স্রষ্টার দেখানো পথে, শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে,...জ্ঞান, মেধা আর উন্নত নৈতিকতার সৌষ্ঠব নিয়ে,.. পিছুটান ভুলে,...একযোগে,...

হজ্জের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি স্থানে মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং হিদায়াতের বারিধারা বর্ষণ করেন। কিন্তু, পরিতাপ সেই মানুষদের জন্য যারা সেই নিদর্শন ও হিদায়াত অর্জন ও সঞ্চয় করার এবং আজীবন ধরে রাখার সংকল্প বা নিয়াত করতে সচেতনভাবেই পিছপা হয়ে থাকেন। আর আল্লাহর হুকুমকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে উদাসীন আচরণ করতে থাকেন। ফলে আল্লাহর অতিথি হবার যে সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন সেই মর্যাদার স্থায়ী সুরক্ষা হয়না। নিজের জন্য এ অবস্থা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইলাম।

"রব্বানা, লা-তুযিগ্ 'কুলু-বানা, বা'য়দা ইয্ 'হাদাইতানা...." "হে আমার রব! সরল পথ দেখাবার পর আপনি আমার অন্তরকে সত্যলংঘন প্রবণ হতে দিবেন না। আপনার পক্ষ হতে রহমত দিন। নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৮]

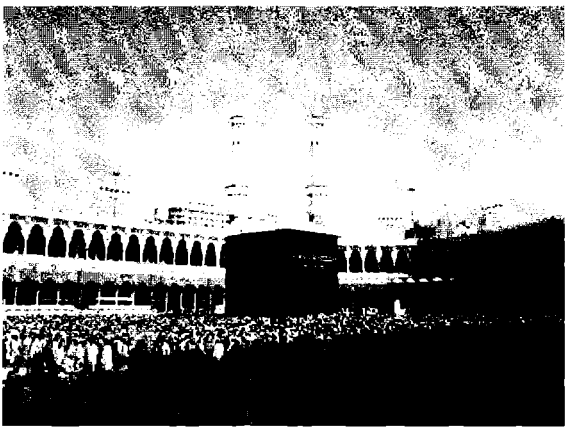

প্রথম দর্শনেই কাবাঘর চোখে এক শান্তির স্বপ্ন এঁকে দেয়। মনে হয় কত যুগ-যুগান্তরের চেনা!

গভীর আকুতি নিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আর তালবিয়ার ক্রমাগত উচ্চারণের একপর্যায়ে রাতের আলো-আঁধারীর ভেতর থেকে মাসজিদে হারামের একপাশের উঁচু প্রান্তসীমা আমার দৃষ্টিকে ছুঁয়ে দিল। যতই কাছে যাচ্ছি, ততই সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে তাওয়াফ ও নামায সমাপনকারী মানুষের ছোট বড় গ্রুপ আসছে। সামনে পেছনে কোথাও ফাঁকা নেই। কখনো পেছন থেকে এসে আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমরা ধীর পদক্ষেপে এগুতে থাকি, যাতে কেউ কষ্ট না পায়। মুনযির অবাক হয়ে জনস্রোত দেখে। হাততুলে ডাকে, "তাতা, মামা, দাদা, আন্না, নানা, ভাইয়া.....।" একবার মাম্ থেকে বাবা, আবার মাম্--ঘন ঘন কোল বদল করছিল সে। রাস্তার দু'পাশে দোকান-পাট জমজমাট। কে বলবে রাত এগারটা? মানুষের কর্মচাঞ্চল্য দেখে মনে হচ্ছিল সবে সন্ধ্যা নেমেছে।

মাসজিদে হারামের বাইরের চত্বরে পা রেখে হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত হল 'আলহামদুলিল্লাহ'। নদী, সাগর, পর্বত আর মরুভূমির দূর-দূরান্তের পথ পেরিয়ে, বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে এই সুপ্রাচীন, পবিত্রতম গৃহের হজ্জে আসার তাওফিক তিনি দিয়েছেন বলে। আমাদের হজ্জের সফরকে তিনি মঞ্জুর করেছেন বলে।

চাতাল পেরিয়ে মাসজিদে প্রবেশের দু'য়া পড়ে এক নং গেট *[বাদশাহ আব্দুল আজিজ]* দিয়ে ঢুকলাম। উত্তেজনায় দরদর করে ঘামছি। কয়েক কদম এগুতেই চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল আল্লাহর ঘর, প্রাচীন-সম্মানিত খানায়ে কাবা। এই আমার প্রথম দেখা। কিন্তু মনে হয়েছিল যেন আমার চিরচেনা এ ঘর। আমার অন্তরের সাথে এ ঘরের যোগ যেন যুগ-যুগান্তরের। অতি পরিচিত ভালবাসার এক গৃহের ছবি। আল্লাহর নিজ অতিথিদের জন্য একান্তভাবে সুরক্ষিত, পবিত্র ও প্রশান্তিময় এই ঘর। মানবজাতির

হিদায়াত ও কল্যাণের উৎস। শুধুমাত্র দর্শনকারীর জন্যেও যে ঘরে প্রবাহিত হয় রহমতের ফল্গুধারা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "প্রতিদিন কাবাঘরে ১২০টি রহমত নাযিল হয়। এ ঘরের তাওয়াফকারীর জন্য ৬০টি, কিয়াম ও ইতিকাফকারীর জন্য ৪০টি এবং এ ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধকারীর প্রতি ২০টি রহমত নাযিল হয়।" *[বায়হাকী ঃ ইসলামে হজ্জ ও ওমরা- পৃঃ ২৩৬]*

বারবার ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম কাবাঘরকে। দু'চোখের কোন্ গভীরে যে এই বরফ গলা নদী সুপ্ত ছিল আমি জানতাম না। "আল্লাহু আকবার"-- হৃদয়ের গভীর থেকেই অনুরণিত হল। মুনযিরের কচি দু'টি হাত আমার হাতের ভেতরে নিয়ে মেলে ধরলাম। আমার রবের কাছে চাইলাম– যা কিছু চাইবার ছিল। আমি তো জানিনা আমার কল্যাণ কিসে, কিন্তু তিনি জানেন। তাঁর কাছে চাইতে থাকলাম। বিশ্বের সকল মানুষের জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য, আমার মাতৃভূমির জন্য, আম্মা-আব্বা, মরহুম শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-সন্তান, ভাই-বোন ও তাদের পরিবারসহ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের জন্য, দ্বীনের কাজে নিয়োজিত সকল নেতৃবৃন্দ ও সঙ্গী সাথীদের জন্য, প্রতিবেশীদের জন্য, কবরে শায়িত নিকটাত্মীয়দের জন্য। চাইলাম নিজের জন্য। কচি শিশু-সন্তান সমেত হজ্জের সকল কাজ সুসম্পন্ন করায় তাঁর সাহায্য চাইলাম। হজ্জের এ সফরে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং পাচ্ছি–দু'য়া করলাম সকলের জন্য।

আগমনী তাওয়াফ

দূর-দূরান্ত থেকে যারা হজ্জ বা উমরার সফরে আসেন, ইহরাম বাঁধার পর তাদের প্রথম কাজ তাওয়াফ। অন্য যে কোন মাসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাকাত দুখুলুল মাসজিদ নামায আদায় করতে হয়। কিন্তু মাসজিদে হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করতে হয়। আগমনী তাওয়াফ হল "Inauguration of hajj". আমরা যারা উমরাহর ইহরাম বেঁধে এসেছি তাদের জন্য এই আগমনী তাওয়াফ ফরয।

উমরাহর তিনটি ফরয হলঃ ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া সায়ী করা। পবিত্রতা সহকারে তাওয়াফ করা জরুরী। হারামে প্রবেশের প্রতিটি গেটের বাইরে আন্ডারগ্রাউন্ড টয়লেট রয়েছে শত শত। আল্লাহর অতিথিদের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে clean করা হচ্ছে। চব্বিশ ঘন্টাই উন্মুক্ত। আমরা ভীড় এড়িয়ে চলার জন্য দোতলায় তাওয়াফ করব ভেবেছিলাম। গাইড মিজানুর রহমান ভাই বললেন, নীচেই তাওয়াফ করা যাবে।

আমরা লক্ষ্য করলাম, কাবাঘরের একেবারে কাছে ভীড় খুবই বেশী। কিন্তু একটু দূরের পরিধির দিকে সরে গিয়ে তাওয়াফ করলে, মনে হল ইনশাল্লাহ সমস্যা হবেনা। আমরা সাহস করে বুদ্ধি খাটিয়ে, বিপরীত দিক থেকে আসা জনস্রোত এড়িয়ে কাবার চত্বরে নেমে গেলাম। আমাদের ঠিক পাশে ছিলেন ঢাকা আগাসাদেক রোডের বাসিন্দা এক

দম্পতি কোহিনুর ভাবী আর দিদার ভাই। হজ্জের সফরেই পরিচয়। তারা দু'জনে হজ্জের কাজগুলোতে সবখানে আমাদের নিকটতম সাথী হয়েছিলেন। মুনযিরকে ভাবী

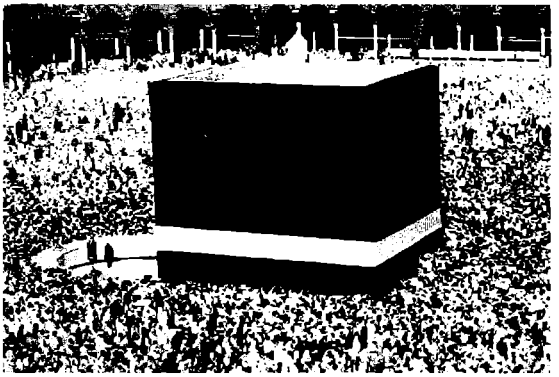

এমন মানুষের ভীড়ে তাওয়াফ করা প্রথমে মনে হয় খুবই কঠিন। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে সুশৃংখল ও ধীর-স্থির ভাবে নেমে গেলে, কঠিন নয় তেমন।

অনেক সময় take care করায় সহযোগিতা করেছেন সযত্নে । তাওয়াফ করার সময় মুনযির বেশীর ভাগই মাম্ কোলে থাকতে চাইছিল। একটু কষ্টকর, তবে আমার হিজাব maintain করার বেলায় protection হয়ে ছিল সে। কোলে শিশু দেখেই হাজ্জা পুরুষেরা একটু সরে গিয়ে জায়গা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কাজেই যতক্ষণ সম্ভব মুনযিরকে কোলে রেখেছি। আমার ডান দিকে ওর আব্বু, বাঁ দিকে মুনযির। মাঝে মাঝে মুনযিরকে ওর আব্বু কাঁধে নিয়েছেন। তখন আমি আমার কাঁধে ঝুলানো ব্যাগের support রেখে বাঁ দিকের লোকজনের স্পর্শ এড়িয়ে চলেছি। আমাদের দু'জনের ঠিক পেছনে কোহিনূর ভাবী আর ভাই। ভীড়ে যেন হারিয়ে না যাই সেজন্য শক্তভাবে পরস্পর হাত ধরে আমরা মাতাফ (কাবার আঙিনা) চত্বরে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে নামলাম।

হাজরে আসওয়াদ বরাবর ভীড় খুবই বেশী। হাজরে আসওয়াদ হল জান্নাতের একটি পাথর। ইবরাহিম (আ:) এর কাবাগৃহ নির্মাণকালে ফিরিশতা জিবরাইল (আ:) এটা সরবরাহ করেন। এখানে চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করা হয়। এত ভীড়, এখন তা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভীড়ে চুম্বনের ইশারা করারও প্রয়োজন নেই। বরং ডান হাত উঁচিয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার " বলে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। হাজরে আসওয়াদের কাছে যাবার জন্য হজ্জের পর যখন ভীড় কমে আসে তখন চেষ্টা করা যায়। কিন্তু হজ্জেও আগে এবং হজ্জের সময়ে

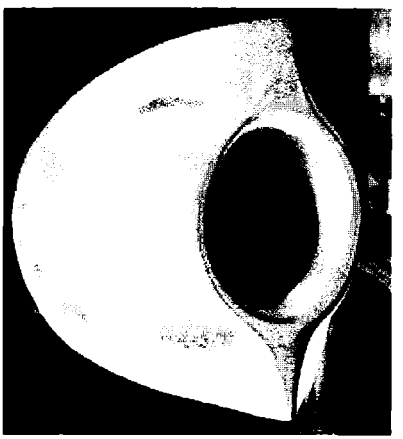

জান্নাতের পাথর ঃ হাজরে আসওয়াদ।

অন্যকে কষ্ট দিয়ে বা মহিলাদের নিজের পর্দা লঙ্ঘণ করে সে চেষ্টা করা নিরর্থক। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা:) এর তাওয়াফ ছিল এমন–"আয়িশা (রা:) পুরুষদের সংস্পর্শ এড়িয়ে তাওয়াফ করতেন। পুরুষের ভীড়ে মিশে যেতেন না । এক মহিলা তাঁকে বলেন,' চলুন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করি।' তিনি বললেন, "আমাকে ছাড়, তুমি যেতে চাইলে যাও ।" [সহীহ বুখারী:১৫১৩]

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ফরয বা ওয়াজিব নয়। একটি সুন্নাত। এর দ্বারা গুনাহ মাফ হবার কথা বলা আছে। জান্নাতের এ পাথর প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ সহজাত কিন্তু তাতে যদি মানুষকে কষ্ট দেয়া বা নিজ পর্দা ব্যাহত হয়, তবে তাতে গুনাহ মাফের চেয়ে হবে অনেক বড় গুনাহ অর্জন। গুনাহের কাজ করে সুন্নাত আদায় করা হারাম। নিষেধ। সুতরাং ফাঁকা পেলেই শুধু এ চেষ্টা করে দেখা যায়। তা না হলে ভীড় ঠেলে হাজরে আসওয়াদের কাছে যাওয়া উচিত নয়। প্রচন্ড ভীড় দেখে আমরা দু'য়াটি পড়ে হাজরে আসওয়াদ বরাবর ডান হাত তুলে তাওয়াফ শুরু করলাম। কাবাঘর বাঁয়ে রেখে হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ করে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত করলে তাওয়াফের একটি চক্র পূর্ণ হয়। পরবর্তী চক্র একইভাবে শুরু করে প্রথমবারের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। এভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ করলে তাওয়াফ সম্পন্ন হয়।

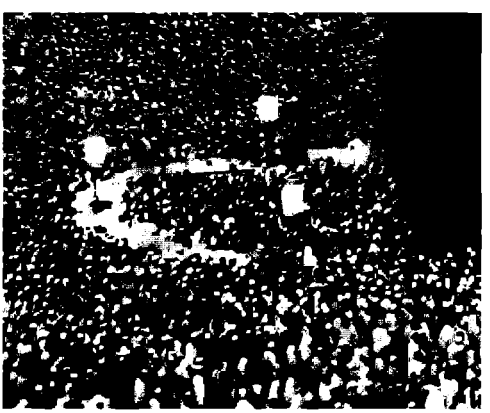

হাতিম কাবাঘরের অংশ। হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। কখনও কখনও হাতিমের ভেতরে সালাত আদায়ের সুযোগ দেয়া হয়। আর তখন প্রচন্ড ভীড় হয়ে থাকে। কারণ হাতিমের ভেতর সালাত আদায় মানে কাবাঘরের ভেতর সালাত আদায়। তবে একথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে, কোনভাবেই যেন আমরা কারো কষ্টের কারণ না হই।

তাওয়াফের সময় দু'য়া কবুল হয়। এসময়ে একেবারে নিশ্চুপ থাকা বা গল্পগুজব করা কোনটাই ঠিক নয়। সাধ্যমত দু'য়া করতে থাকলাম। তাওয়াফের সময় প্রতি চক্করে রুকনে ইয়ামানীর কর্নার থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত, অর্থাৎ দক্ষিণ দেয়াল বরাবর নিচের দু'য়াটি রাসূলুল্লাহ(সঃ) পড়েছেনঃ "রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্‌দুনিয়া- 'হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি 'হাসানাতাঁও ওয়াক্বি-না 'আযা-বান্ না-র।" অর্থাৎ,"হে আমাদের রব। আমাদেরকে আপনি পার্থিব জীবনে কল্যাণ দিন আর কল্যাণ দিন আখিরাতে। আর আগুনের শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন।" [সূরা বাকারা:২০১(আবু দাউদ১/৩৫৪, মুসনাদে আহমাদ৩/১১)]

এ দু'য়াটি সহীহ উচ্চারণে অর্থসহ শিখে নিয়ে তাওয়াফকালে পাঠ করলে সে তাওয়াফ হয়ে উঠে নিজ রবের সাথে এক প্রাণবন্ত আলাপচারিতা। যিনি মহান আল্লাহর সম্মানিত মেহমান হতে যাচ্ছেন তার জন্য এটা শেখা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু দেখলাম অনেক গ্রুপে একজন জোরে জোরে দু'য়া বলছেন, অন্যরা তাকে ফলো করছেন। আবার অনেকে প্রত্যেক চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দু'য়া, দু'য়ার বই দেখে পড়ছেন বা অন্যকে পড়াচ্ছেন। এভাবে বই দেখে পড়তে বা পড়াতে গিয়ে মনের অজান্তেই অন্যের পা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন।

হাদীসে কোথাও প্রত্যেক চক্রের জন্য ভিন্ন দু'য়া সুনির্দিষ্ট করা নেই। আবার বই দেখে পড়তে গিয়ে অন্যকে কষ্ট দেয়াও অনুচিৎ। নবী (সঃ)তাওয়াফকালে "রব্বানা আতিনা " দু'য়াটি পড়েছেন, তাই হজ্জ ইচ্ছুক প্রত্যেকের উচিৎ দু'য়াটি অবশ্যই সহীহভাবে পড়তে শেখা। সেই সাথে কুর'আন-হাদীসের অন্যান্য মাসনুন দু'য়াও যতটা সম্ভব শিখে যাওয়া দরকার। মাসনুন দু'য়া বেশী মুখস্থ না থাকলে যে কোন ভাষায় আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়া যায়। বিশ্বের হাজার হাজার ভাষা মানুষের মুখে তিনিই তুলে দিয়েছেন। তিনি সকল ভাষাভাষী মানুষের রব। সকল ভাষার মানুষের মনের কথাও তিনি জানেন। যে কোন বান্দা, যে কোন ভাষায়, যে কোন সময়, মনের গভীর থেকে আল্লাহকে ডাকলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন।

তাওয়াফের সময় যেহেতু দু'য়া কবুল হয়। তাই নিজ মাতৃভাষায়ই হোক, আর কুরআন-হাদীসের মাসনুন দু'য়াই হোক, দু'য়া করতে থাকা দরকার। সেই সাথে ইস্তিগফার, তাসবিহ, কুরআন তিলাওয়াতও করা যায়। তাওয়াফের শুরুতেই মুনযির 'মাম' 'মাম' (আম্মু,আম্মু) বলে আমার কাছে চলে এল। ওকে বেবী ক্যারিয়ারে ঝুলিয়ে দু'তিন চক্কর তাওয়াফ করতেই ওর ঘুম এসে গেল। বাকী চক্রগুলোতে ওর আব্বু কোলে নিয়েছিলেন। আমরা নির্বিঘ্নে দু'ঘন্টা সময়ের ভেতর তাওয়াফ শেষ করলাম। রাত তখন দেড়টা। মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগুতে গিয়ে নারী পুরুষের প্রবল স্রোত দেখে মনে হল, নারীর হজ্জে মাহরাম সংগীর আবশ্যকতা ইসলামের মহানুভবতারই পরিচায়ক।

বন্ধুর পদচিহ্ন ঃ মাকামে ইবরাহীম

পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন পদচিহ্ন পৃথিবীর বুকে আর কোথাও নেই। এ হচ্ছে আল্লাহপাকের ভালবাসার এক চমৎকার নিদর্শন। ইবরাহীম(আঃ)কে তিনি স্বীয় বন্ধু হিসেবে মর্যাদা দান করে কাবাঘর পূনঃনির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কাজ সম্পাদনে আল্লাহপাকের পক্ষ হতে যে অলৌকিক প্রযুক্তির সহায়তা ইবরাহীম(আঃ) পেয়েছেন, সেটাই মাকামে ইবরাহীম। এ এক জান্নাতী পাথর। এর উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম(আঃ) কাবাঘরের নির্মাণকাজ সুসম্পন্ন করেন।

"কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী এ পাথর উঁচু-নিচু হতো এবং ডানে-বামে ঘুরতে পারত।"[ঐতিহাসিক সায়িদ ঃ ইসলামে হজ্জও ওমরা, ৪৬৫পৃঃ] এ এক বিস্ময়কর মুযিযা। এটাও Miracle যে আল্লাহপাকের হুকুমে এ পাথরের উপর ইবরাহীম(আঃ)

এর পদচিহ্ন অংকিত হয়ে যায়, যা হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহর একত্ব ও ভালবাসার নিদর্শন হয়ে জেগে আছে।

তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকাত নামায ওয়াজিব [হানাফী মাযহাব]। অন্যান্য মাযহাব এ নামাযকে সুন্নাত বলে অভিহিত করেছে। মাকামে ইবরাহীম দু'য়া কবুলের একটি স্থান। আল্লাহপাক বলেন,"তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাও।"[সূরা বাকারাঃ ১২৫]

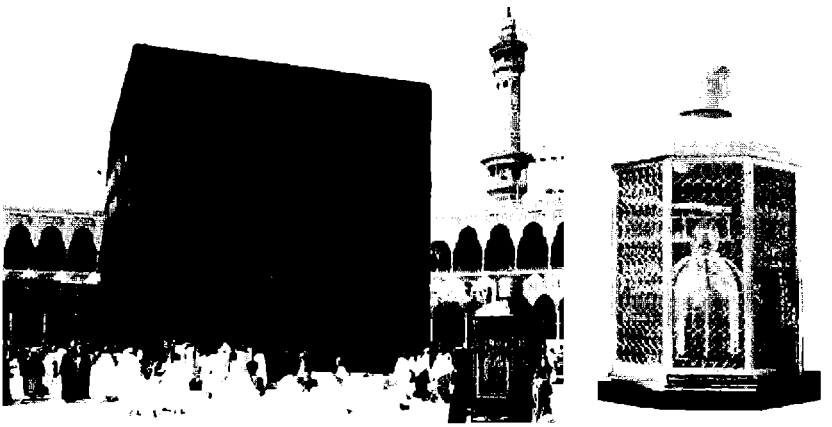

কাবাঘরের দরজার সামনে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচের দেয়াল বেষ্টিত মাকামে ইবরাহীম, জেগে আছে মহান আল্লাহর এক অনুপম নিদর্শন হিসেবে।

ইবনে উমার (রাঃ)থেকে বর্নিত,তিনি বলেন,নবী করিম(সঃ) মক্কায় উপনীত হয়ে সাত চক্কর তাওয়াফ সম্পন্ন করে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সাফার দিকে বের হয়ে গেলেন। ইবনে উমার বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর(সঃ) জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" [সহীহ বুখারী ১৫২৮, ৩য় খন্ড, ইফাবা প্রকাশন]

"নিঃসন্দেহে মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় তা তো মক্কায়। এটি বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। এতে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন মাকামে ইবরাহীম।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৯৬-৯৭]

কাবাগৃহের ১৪ মিটার উত্তর-পূর্বে মাকামে ইবরাহীমের অবস্থান। ভীড়ের জন্য এখানে জায়নামায বিছাতেই হিমশিম খাচ্ছিলাম। অবশ্য এখানে স্থান সংকুলান না হলে হারাম শরীফের যে কোন স্থানে এ নামায পড়া যায়। মুনযিরের আব্বুর আপ্রাণ চেষ্টায় হঠাৎ জায়গা পেতেই নামায শুরু করলাম। দিদার ভাই ও ভাবী এসময় পালাক্রমে মুনযিরকে রেখেছেন। যদিও মাত্র দু'রাকাত নামায আদায় করার মাঝে আরো ঝাঁকে ঝাঁকে

তাওয়াফকারীর পদভারে এলোমেলো হয়ে পড়ছিল আমার জায়নামায়ের অগ্রভাগ; তবু কাবার আঙ্গিনায় প্রথম সে নামায ছিল খুবই প্রশান্তির। এখনো জায়নামাযে দাঁড়িয়ে সেই অনুভূতির স্মরণ আমাকে আলোড়িত করে।

হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহিম পাথরদ্বয় সম্পর্কে রাসূলের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস (রাঃ) নিজ কানে হাত রেখে তিনবার বলেন, "আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি; হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীম এ দুটি জান্নাতের জ্যোতির্ময় পাথর ছিল, আল্লাহ যদি এ দু'টির জ্যোতি বিলুপ্ত না করতেন তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অথবা পশ্চিম ও পূর্ব দিগন্তে যা আছে সবই আলোকিত করে দিত।" [মুসনাদে আহমদ ২/২১৪: পবিত্র মক্কার ইতিহাস, শায়েখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী]

মাকামে ইবরাহীমের কাছে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) এর জীবনের ইতিহাস ঝলমল করে উঠে। আমার মনে হল হজ্জের ইতিহাসের সাথে ইবরাহীম (আঃ) এর জীবন এমন যুগপৎভাবে জড়িয়ে আছে, যা জানার উপরই হজ্জের সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

ইরাকের এক পৌত্তলিক বংশধারায় জন্ম নিয়েও ইবরাহীম(আঃ) ছিলেন সত্যানুসন্ধিৎসু। পূর্বপুরুষের পরম পূজনীয় এবং হাতে গড়া মূর্তির সামনে মাথা অবনত করার কোন কারণ, প্রয়োজন এবং ভিত্তি তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর প্রবল অনুসন্ধানী মন বললো, এ বিশ্বজগতের প্রকৃত সৃষ্টিকারী যিনি, আত্মসমর্পণ শুধুমাত্র তাঁর কাছে করা উচিৎ। তিনি খুঁজে বেড়ালেন সেই স্রষ্টাকে। আকাশের নক্ষত্র দেখে ভাবলেন,'এই আমার স্রষ্টা।' কিন্তু তা অস্তমিত হয়ে গেল। চাঁদ দেখে ভাবলেন,'এই আমার স্রষ্টা'। চাঁদও অস্তমিত হলো। যথারীতি সূর্যোদয় হলে তিনি ভাবলেন, 'যে শক্তিকে আমি খুঁজছি, সে চাঁদ নয় সূর্য।' অবশেষে সূর্যের অস্তায়ন দেখে তাঁর বিবেকের সকল দ্বার খুলে যেতে লাগল। বললেন, "আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।"[সূরা আন'আমঃ৭৭]

সূর্যাস্ত অবলোকন করার পর তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে জেগে উঠে এক অখন্ড প্রবল বিশ্বাস। 'নক্ষত্র নয়, চাঁদ নয়, সূর্যও নয়। যারা ডুবে যায় তারা কখনো স্রষ্টা হতে পারেনা।' "এইভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়।" [সূরা আন'আমঃ৭৫]

প্রত্যেক সুস্থ ও বিবেকবান মানুষই নক্ষত্র, চাঁদ আর সূর্যের উদয়াস্ত অবলোকন করে কিন্তু এই ব্যবস্থাপনা দেখে এর ব্যবস্থাপকের প্রতি আস্থাশীল হয়না সবাই, যেমন হয়েছিলেন ইবরাহীম(আঃ)। আল্লাহ বলেন, *"চোখতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।"*[সূরা হাজ্জঃ ৪৬]

ইবরাহীম(আঃ) স্বজাতির লোকদেরকে নিজের এই আত্মোপলব্ধির কথা জানালেন। বললেন, "আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরালাম, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।"[সূরা আন'আমঃ৭৯]

তাঁর মূর্তিপূজারী পুরোহিত পিতাকে দাওয়াত দিলেন–"হে পিতা! আপনি কেন সেসব জিনিসের ইবাদাত করেন যারা শুনেনা, দেখেনা, কোন উপকারও করতে পারেনা? হে পিতা, আমি সত্যজ্ঞান লাভ করেছি, যার সন্ধান আপনি পাননি। আমার পথে চলুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো। হে পিতা! আপনি কেন শয়তানকে অনুসরণ করছেন, শয়তান তো দয়াময় আল্লাহর অবাধ্য?" [সূরা মারইয়ামঃ ৪২–৪৪]
স্বজাতির লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ হল। রুষ্ট হল তাঁর পিতাও, বলল, "শোন্, এ পথ থেকে বিরত না হলে তোকে আমি পাথর মেরে হত্যা করবো।" [সূরা মারইয়ামঃ ৪৬]
কিন্তু তিনি দৃঢ় বিশ্বাসে অবিচল রইলেন। রাজশক্তি তাকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করল। ঈমানে অটল ইবরাহীম (আঃ) যা চাইবার, আল্লাহর কাছেই চাইলেন। আল্লাহর নির্দেশে আগুন তাঁর কোন ক্ষতি করলনা। তাঁর মর্যাদার উত্তরণ ঘটল। এরপর তিনি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দাওয়াত নিয়ে ছুটে যান দিগ্বিদিকে। ইরাক থেকে সিরিয়া, সেখান থেকে ফিলিস্তিন, মিশর আবার ফিলিস্তিন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তানের পিতা হন। আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা আসে নতুন রূপে ভিন্ন প্রকৃতিতে। প্রিয়তম স্ত্রী আর সন্তানকে মক্কার নির্জন ও ঊষর মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করার আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেন। এরপর পরীক্ষা হয় কঠিনতর। পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাতেও তিনি সফল হন।

"এবং স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীমকে তার প্রভূ কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলোতে সে উত্তীর্ণ হলো। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করছি। সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য হতেও? আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।" [সূরা বাকারাঃ ১২৪]

এভাবেই ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর selected মানুষ হয়েছিলেন। শুধু কি তাই? আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠায়, তিনি একাই এত কাজ করেছিলেন, যা সম্মিলিতভাবে এক জাতি করে থাকে। বিষয়টি আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন, "ইবরাহীম নিজেই ছিলেন এক উম্মাহ। আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ। এবং তিনি কখনও মুশরিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর নিয়ামাতের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাকে বাছাই করে নেন এবং সরল সঠিক পথ দেখান।" [সূরা নাহলঃ ১২০-১২১]
"সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম জীবন কার, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করে? এবং ***আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন***।" [সূরা নিসাঃ ১২৫]

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা নেয়ার পর আল্লাহ তাকে কাবাঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। নির্মাণের স্থানও চিহ্নিত করে দেন । আসমানী প্রযুক্তি--মাকামে ইবরাহীম দান করেন। কাবাগৃহ নির্মাণে তিনি পুত্র ইসমাঈল(আঃ)এর সহযোগিতা নেন। আর নির্মাণ সুসম্পন্ন করার পর এ পাথরখন্ডে দাঁড়িয়েই দু'আ করেন," হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।" [সূরা বাকারাঃ১২৬]

মাকামে ইবরাহীম ঃ পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন পদচিহ্ন। এ হচ্ছে আল্লাহপাকের ভালবাসার এক চমৎকার নিদর্শন।

এ দু'য়া যে কোন ভাল কাজের সমাপনে আমরাও করতে পারি। সেই বন্ধুর, সেই ধৈর্যশীল, সত্যবাদী আর সংগ্রামী নবীর পদাংক আল্লাহপাক নিদর্শন হিসেবে হাজার হাজার বছর ধরে টিকিয়ে রেখেছেন। কেবলমাত্র দুটো পায়ের ছাপ নয়, আল্লাহর মেহমানদের সামনে মাকামে ইবরাহীম, তাঁর প্রতি নির্ভরতায় ও আনুগত্যে ইবরাহীম (আঃ)এর পদাংক অনুসরণের এক প্রবল প্রেরণা। মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামায পড়ে খানায়ে কাবার দিকে তাকিয়ে দু'চোখের দৃষ্টি কতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল, মনে নেই। চোখ ফেরানো যায়না।

বরকতময় পানির উৎস ঃ যমযম

পৃথিবীর কোথাও নেই এমন ফল্গুধারা। যে ধারা একাধারে তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা মেটায়, আবার রোগেরও নিরাময় করে। জনমানবহীন মরুর বুকে এক বিশ্বজনীন স্থায়ী মিলন মেলা গড়ে উঠেছে, যে পানির উৎসকে কেন্দ্র করে, তা হল যমযম।

এক নিঃসঙ্গ নারীর আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তাঁর সাহায্যের উপর নির্ভরতাকে কেন্দ্র করে তৈরী হয়েছে যমযম কূপের ইতিহাস। পবিত্র নগরী মক্কায় যে সকল নিদর্শন আল্লাহ তার অতিথিদের আতিথেয়তার জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন তন্মধ্যে 'যমযম' একটি। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার এক অতুলনীয় নিদর্শন এটি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যমযমের মূল উৎস জান্নাত' [ইসলামে হজ্জ ও ওমরা] যতই উত্তোলন করা হোক না কেন যমযম কুপে পানির level সবসময় সমান থাকে। ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হজ্জ ও উমরাকারী আকণ্ঠ পান করেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে যান তার পরেও পানি শেষ হয়না, কমেনা এবং পানির স্তর উঠানামাও করেনা।

আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম (আঃ) প্রিয়পুত্র ইসমাঈলসহ প্রিয়তমা স্ত্রী হাজেরা (রাঃ) কে নির্জন মরুপ্রান্তরে রেখে যাবার পর, দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন, "হে আমাদের রব! আমি তৃণগুল্মহীন এক উপত্যকায় স্বীয় বংশধরের একটি অংশকে আপনার পবিত্র ঘরের কাছে অভিবাসিত করলাম। এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। এতএব আপনি কিছু মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে

দিন এবং ফল-মূল দ্বারা এদের রিযিকের ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৩৭]

যখন সঙ্গে থাকা খেজুর ও পানি ফুরিয়ে গেল, তখন মা ও শিশু উভয়ে প্রবল তৃষ্ণা-ক্ষুধায় ছট্‌ফট করছিলেন। শিশুকে উপত্যকাভূমিতে শুইয়ে রেখে পানির খোঁজে মা উঠেন সাফা পাহাড়ে। চারিদিকে দৃষ্টি মেলেন। না, কোথাও নেই। দৌড়িয়ে যান প্রায় ৩৯৫ মিটার দূরে মারওয়া পাহাড়ে। এভাবে দু'পাহাড়ের মাঝে দৌড়িয়ে সাতবারে প্রায় পৌনে তিন কিলোমিটার দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেন। এরপর শিশুর অবস্থা দেখার জন্য উপত্যকার দিকে তাকাতেই তিনি শিশু ইসমাঈলের নিকটে এক ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর ফিরিশতা। সেই ফিরিশতা পায়ের গোড়ালী বা ডানা দিয়ে আঘাত করলে মাটি ফুঁড়ে পানি নির্গত হতে শুরু করে। মা হাজেরা হাতের আঁজলা দিয়ে পানি নিয়ে মশক ভর্তি করেন। পানির উৎসের চারিদিকে বাঁধ দিয়ে দেন। এরপর ঐ পানি নিজে পান করেন এবং শিশুকে দুধপান করান। "অতঃপর ঐ ফিরিশতা মা হাজেরাকে বলেন, মৃত্যুর ভয় করবেন না। কারণ এখানে আল্লাহর ঘর আছে, যে ঘর এই শিশু ও তার পিতা পূনঃনির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয়জনদের ধ্বংস করেন না।" [বুখারী ৩৩৬৪, সংগৃহীত পবিত্র মক্কার ইতিহাস সম্পাদনায়ঃ সফিউর রহমান মুবারকপুরী]

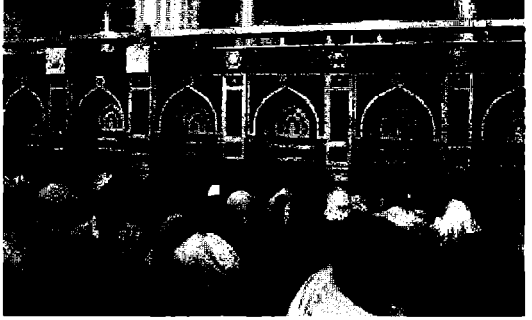

যমযম ঃ
মাকামে ইবরাহীম থেকে আরো একটু পূর্বদিকে বরকতপূর্ণ যমযমের অবস্থান। *কল্যাণকর দু'আ করে যমযমের পানি পান করা সুন্নাত।*

মাকামে ইবরাহীম থেকে আরো একটু পূর্বদিকে বরকতপূর্ণ যমযমের অবস্থান। মূল কুপটির চারিদিকে দেয়াল ঘিরে রাখায় কুপটি এখন আর দেখা যায়না। কুপ থেকে পাইপের মাধ্যমে হারাম শরীফের সর্বত্র যমযমের পানির সার্বক্ষনিক সরবরাহ রয়েছে। স্বাভাবিক উষ্ণ এবং শীতল দু'রকম পানির কল যথাক্রমে লাল ও সবুজ চিহ্নিত করা আছে। পানির সার্বক্ষনিক সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং শীতল করার প্রক্রিয়াটি computer- নিয়ন্ত্রিত। এ পানি এমনিতেই জীবাণুমুক্ত। তার পরেও extra sterilization-এর জন্য Ultraviolet ray ব্যবহার করা হচ্ছে। এই treatment এর কারণে অবশ্য যমযম পানির স্বাদ, গন্ধ, রঙ বা কোন গুণগত পরিবর্তন হয়না। ইসমাঈল (আঃ) এর মা হাজেরা (রাঃ)-এর জন্য যে যমযম প্রেরিত হয়েছিল, পানির

সেই উৎসমূল আজও অবিকল তাই রয়েছে। [তথ্যসূত্রঃ At the Service of Allah's Guests: KSA Ministry of Information, page:87]

কল্যাণকর দু'য়া করে যমযমের পানি পান করা সুন্নাত। রাসূল(সঃ) যমযম পানের আগে বলতেন 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কল্যাণকর জ্ঞান, সকল রোগের নিরাময় এবং প্রশস্ত রিযিক কামনা করছি।' আমরাও দু'য়া করলাম। এরপরে যমযমের পানি আকণ্ঠ পান করলাম।

উত্তম সবরের নজীর ঃ সাফা-মারওয়া

যমযম পানের পর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, উদ্বেগ সব যেন ভুলে গেলাম। এক সুগভীর স্বস্তি বোধ আর প্রশান্ত মনে সায়ী শুরু করার জন্য আমরা সাফা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সাফা ও মারওয়া পাহাড় ঃ

আল্লাহর জন্য মা হাজেরার সবরের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

এই মধ্যরাতেও বিরাম নেই। সদ্য আগত ইহরাম পরা মানুষ স্রোতের মত শামীল হচ্ছে তাওয়াফে। সায়ীর জন্য সাফা পাহাড়ে উঠছে, আবার স্রোতের মতই মারওয়ার দিকে ছুটছে। এদের মধ্যে যুবক বয়সী যেমন আছে, বৃদ্ধ ও কিশোরও রয়েছে। আর নারীর সংখ্যা সমান নাকি কিছু কম-বেশি বুঝা যাচ্ছিল না। তবে সায়ীতে তাওয়াফের চেয়ে ভীড় কিছুটা কম। কারণ, সায়ী উমরাহর একটি রুকন। যারা আরো আগেই উমরাহ সম্পন্ন করেছেন, তারা ইচ্ছেমতো নাফল তাওয়াফ করছেন। উমরাহ শেষ করে ইহরাম মুক্ত হবার পর হজ্জের আগে ও পরে যখন খুশী, যতবার খুশী নাফল তাওয়াফ করা যায়, শুধু নামাযের জামায়াত দাঁড়াবার সময় ছাড়া। নাফল তাওয়াফের পর কোন সায়ী নেই। সায়ী শুধু উমরাহ ও হজ্জের ফরয তাওয়াফের পর। সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটি দু'য়া কবুলের স্থান। সায়ী করার জন্য আমরা সাফা পাহাড়ে উঠলাম। কাবার দিকে ফিরে দু'য়া করে সায়ী শুরু করলাম। আল্লাহপাকের আয়াত ভেসে উঠল মনে, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত।" [সূরা বাকারা ঃ ১৫৮]

পাহাড় আল্লাহপাকের সৃজন কৌশলের অন্যতম নিদর্শন। আর সাফা-মারওয়া পাহাড় দুটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মা হাজেরার সুকঠিন পরীক্ষার নিদর্শন। অন্যদিকে আল্লাহর

পক্ষ থেকে মা হাজেরা, শিশু ইসমাঈল এবং সমগ্র বিশ্বের মানুষের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন।

আল্লাহর অতিথিরা সাফা পাহাড় হতে মারওয়া, মারওয়া হতে সাফা, এভাবে সায়ীতে রত । সায়ীর সময় সবুজ চিহ্নিত স্থান শুধু পুরুষদেরকে দ্রুত অতিক্রম করতে হয় আর মহিলাদের স্বাভাবিক গতিতে।
সাফা হতে মারওয়া এক সায়ী এবং মারওয়া হতে সাফা এক সায়ী।

সবর মানে চুপচাপ বসে না থাকা, হতাশ হয়ে না পড়া। বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যের প্রত্যাশায় প্রানান্তকর চেষ্টা, আমৃত্যু সাধনা। মা হাজেরা দিশেহারা হননি। পানি ও দুধের অভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানের প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখেও নিরাশ হননি। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা বুকে নিয়ে তিনি যে কী পরিমাণ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কী পরিমাণ ধৈর্য সহকারে সাফা থেকে মারওয়া আবার মারওয়া থেকে সাফায় সাতবার দৌড়িয়েছেন তাঁর সেই কষ্ট আজ যৎসামান্য হলেও উপলব্ধি করা যায় সায়ী করার সময়ে। এই দুপুর রাতে সায়ী শুরু করতেই যখন মুনযির জেগে উঠে ওর আব্বুর কোল থেকে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন মা হাজেরার সেই সুকঠিন ধৈর্যের পাহাড়কে আমি আমার সীমাবদ্ধ উপলব্ধি দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগুতে থাকলাম সামনে।

দু-পাহাড়ের মাঝের দূরত্ব প্রায় ৩৯৫ মিটার। প্রথমে সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গেলে এক চক্র আবার মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে আসলে দুই চক্র এভাবে সপ্তম চক্র শেষ হয় মারওয়ায় গিয়ে। সাতবার সায়ীতে মোট দূরত্ব হয় প্রায় পৌনে তিন কিলোমিটার। নারীদের সায়ীতে কোন দৌড় নেই, শুধু হাঁটা। যতই ক্লান্তি বা শরীরের ব্যথা আমার হাঁটার গতিকে শ্লথ করতে চেয়েছে, ততই হৃদয়ের গভীর থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে দু'য়া উৎসারিত হয়েছে। আর তখন আমি সেই কষ্টকে অতিক্রম করে চলার শক্তি পেয়েছি।

উমরাহ শেষ হলে

সায়ীর শেষ প্রান্ত মারওয়ায় দাঁড়িয়ে দু'য়া করার জন্য ভীড় লেগে আছে। আমরা ভীড় এড়ানোর জন্য মারওয়ায় পৌঁছে দাঁড়ালাম না। দু'য়া করতে করতেই বেরিয়ে আসলাম। হারাম শরীফের উত্তর ও পশ্চিম দিক ঘুরে পূর্বপাশে এক নং গেটের কাছাকাছি আসতেই এখানে গ্রুপের অনেককে দেখতে পেলাম। আমাদের ২০/৩০ জনের গ্রুপটা একসাথে তাওয়াফ শুরু করলেও আমরা পাঁচ জন ছাড়া সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আমাদের

মত অন্যরাও তাওয়াফ-সায়ী সেরে পূর্বনির্ধারিত স্থানের কাছে সাথীদের অপেক্ষায়। ভাইদের থেকে একটু দুরে বোনেরা গুচ্ছাকারে বসেছে। মুনযিরের আব্বু গেইটের ভেতর স্যু র‍্যাকে রাখা আমাদের জুতার ব্যাগ আনতে গেছেন। পথিমধ্যে আপাদমস্তক হিযাবে ঢাকা স্মার্ট এক তরুনী, 'আসসালামু আলাইকুম' বলে আমার প্রায় পথরোধ করে দাঁড়ায়।

আমি ঝট্ করে জবাব দিলাম, 'ওয়া 'আলাই কুমুসসালাম'।

মেয়েটি বলল, Excuse me, I wanna to gift something to your baby. এমনভাবেই অ্যাপ্রোচ করল যেন আমার কত চেনা। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মেয়েটি খুবই সৌজন্যতার সাথে একটি প্যাকেট ধরিয়ে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি দ্বিধাবোধ করছিলাম, কিন্তু তাকে বুঝতে না দিয়ে খুব সহজভাবেই বললাম,

-- জাযাকাল্লাহু খাইর। Where are you from, sister ? আমার সাড়া পেয়ে মনে হল সে আনন্দিত।

--From Turkey. And you ?

--Bangladesh.

--Nice to meet you.

--Nice to meet you too.

--Turkey or Bangladesh it doesn't make any difference where we live in. We are sister in Islam. We are all together muslim Ummah, is'nt ? বলে সে হাসলো। আমিও হাসলাম। বললাম,

--That's true you are my sister in Islam and also guest of Allah (SWT) here. আমার জবাবে তাকে খুবই খুশী দেখাল। বলল,

--You are so lucky because, you're performing hajj with your baby, and your baby also lucky too.

বললাম,-'আল'হামদুলিল্লাহ। And you, too.

এরপর সে সবিস্তারে তার হজ্জে আসার Background আমাকে বলেছিল।

বিয়ের পরে বান্ধবীরা কেউ আমেরিকা, কেউ ইংল্যান্ড গেছে to enjoy honeymoon. কিন্তু সে ও তার Husband ঠিক করল হজ্জ করবে। তার ভাষায় Honeymoon is simply a temporary enjoyment. But we both want permanent award. এরপর খুব বিনীতভাবে দু'য়া করতে বলল, For having a baby, যে কিনা মানবতার কল্যাণে কাজ করবে আর উম্মাহকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে শক্তিশালী করবে ।

--Certainly. প্রত্যুত্তরে মুচকি হেসে সালাম জানিয়ে বিদায় নেয় Turkey বোনটি।

আমাদের উমরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এখন কাজ হল চুল কেটে ইহরাম খোলা। আমাদের আগেই Plan ছিল মুনযিরের আব্বু সেলুনে তার নিজের চুল কাটাবেন, এরপর আমার

আর মুনযিরের চুল বাসায় গিয়ে কেটে দিবেন। ইহরাম মুক্ত ব্যক্তিকে দিয়েই চুল কাটাতে হয়।

রাতের দুই প্রহর পেরিয়ে গেছে। তখনও দেখি আল্লাহর অতিথিরা নানা দেশ থেকে আসছে ক্রমাগত। তবে প্রথম রাতের চেয়ে ভীড় কমেছে। সাথী বোনদের সাথে শেয়ার করে সঙ্গে রাখা বিস্কিট আর তুর্কী বোনের গিফট করা স্ন্যাকস ও ফল খেলাম মুনযিরসহ। চত্বরে কিছু সময় বসে থাকায় পায়ের ধরে আসা ভাবটা কেটে গেল। হারাম শরীফের আশেপাশে অসংখ্য সেলুন। মুনযিরের আব্বুর চুল কাটা হলে আমরা বাসার দিকে চললাম। বাসায় আমাদের ফ্যামিলি রুমে মা ও ছেলের চুল কাটা হয়ে গেলে, আল্লাহর শুকরিয়া করলাম। ফযরের নামায পড়েই শুয়ে পড়লাম। বিশ্রাম ছাড়া যেন আর চলার জো নেই।

সূর্যোদয়ের পথ

মানুষের চলাচলের শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। ঘড়ি দেখলাম, ৮.৪৫। প্রথমে কেমন অন্যরকম লাগছিল। কোথায় আছি, দিন না রাত, সকাল না বিকাল কিছু মনে আসছিল না। এসি সম্বলিত রুমটাতে কোন জানালা না থাকায় কিছু বুঝাও যাচ্ছিল না। লাইট জ্বালিয়ে ঘুমন্ত মুনযির আর ওর বাবার চুলহীন মাথার দিকে চোখ পড়তেই সব মনে পড়ল। প্রচন্ড রকম ব্যস্ততায় কেটে গেছে গত চব্বিশটি ঘন্টা। ধাতস্থ হবার পর যখন মনে হল একটি নতুন সূর্য উদিত হয়েছে, তখন সেই নতুন দিনের আলোয় কাবাকে দেখার জন্য মনটা আনচান করে উঠল।

মুনযিরের ঘুম ভাঙ্গলে, নাস্তা সেরে আমরা হারাম শরীফে চলে এলাম। তখন বেলা দশ কি সাড়ে দশ। প্রাণভরে কাবাকে দেখবো বলে Escalator-এ উঠে ছাদে চলে আসলাম। ছাদ থেকে সকালের রোদে ঝলমল কাবাঘর ও তার চারিপাশে আবর্তিত তাওয়াফকারীদের চলমান স্রোত দেখে এক আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি অংকুরিত হল ভেতরে।

হৃৎপিন্ড শরীরের মধ্যস্থলে থেকে সমস্ত দূষিত রক্তের সার্বক্ষণিক পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে, সেই পরিশোধিত রক্ত সারাদেহে সারাক্ষণ Circulate করতে থাকে। কাবা গৃহকে কেন্দ্র করে মানবজাতির একটি বিরাট অংশের এই যে আবর্তন, মুসলিম উম্মাহর জন্য যেন একটি পরিশোধন ব্যবস্থা। ফিজিক্যালি দেখলে, সে রকম একটা অনুভূতি আসে। আর এর অন্তর্নিহিত দিকটি এরকম, একমাত্র সার্বভৌম সত্ত্বা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য নিশ্চিত সম্মান, নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রতীক হিসেবে তিনি নিজে এ কাবাঘরকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একে প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা মূলতঃ তাঁর সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করে জীবনের চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজকর্ম-সবকিছু maintain করার প্রশিক্ষণ দেয়া। বিষয়টি কুরআনে এভাবে বিবৃত আছেঃ "আল্লাহপাক কাবাকে সম্মানিত ঘর হিসাবে, মানব জাতির নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা সহকারে স্থাপন করেছেন।" [সূরা মায়িদা ঃ ৯৭]

কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে মানবজাতির সিজদা এবং প্রদক্ষিণের পরম্পরা ঃ

উম্মাহর জন্য এক পরিশোধন ব্যবস্থা, এক সুন্দর প্রশিক্ষণ- ব্যবস্থাপনা।

ছাদে আমাদের নামায, কাবা দর্শন আর দু'য়া চললো পর্যায়ক্রমে। বারটায় যুহরের সালাতের পর আমরা রুমে ফিরলাম। মদীনার মত এখানেও মুনযিরের যত্ন ও চাহিদাগুলো মিটিয়ে যখনই সময় পেয়েছি কাবায় ছুটে গেছি। মুনযিরের চাঞ্চল্য সামাল দিয়ে যখন যতটুকু পেরেছি। যে ওয়াক্তে মুনযির ঘুমিয়ে ছিল বা ওর প্রিপারেশান কমপ্লিট ছিলনা, সে সময়গুলোতে ওর আব্বুকে আগেভাগে হারাম শরীফে নামাযের জন্য পাঠিয়ে আমি বাসায় নামায পড়েছি।

আমার হারামে ভিজিটের একেক দিন একেক বিষয়ে চিন্তা, অনুভূতি কাজ করেছে। নতুন চিন্তা ও অনুভূতিগুলো বাসায় এসে কুরআন ও হাদীসের মূল ভাবের সাথে মিলিয়ে যাচাই করে নিয়েছি। যেগুলো মিলাতে পেরেছি সেগুলোই শুধু প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। যাতে, উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা আল্লাহর Supremacy এবং Sovereignty গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আর হজ্জকে জীবনের প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য হিসেবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন করে নিয়ে বিশ্বমানের leadership উম্মাহকে যেন উপহার দিতে পারে। এর প্রয়োজনীয়তা দেড় হাজার বছর আগের Micro Society-তে যেমন ছিল আজকের Macro Society-তে অধুনা Globalisation এর যুগেও অবিকল তেমনি আছে। আমাদের বস্তুগত ও দ্বীনি জ্ঞান, সামাজিক আচরণ, যোগ্যতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে বিশ্বমানে উত্তরণ ঘটাতে হলে, সঠিক নিয়াতে হজ্জের এ বিশ্বসমাবেশে অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। মুসলিম বিশ্বের বহু দেশের ছেলেমেয়েরা বিয়ের আগেই হজ্জ সম্পন্ন করে। এদের অনেকের মনোভাব এরকমই যে উপার্জনের প্রথম টাকাগুলো হজ্জের জন্যই খরচ করবে।

আমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের আলোয় উদ্ভাসিত নতুন পৃথিবী চাই। ঘুমন্ত উম্মাহকে আত্মসচেতন ও জাগ্রত করতে চাই। এ জন্যই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে নতুন প্রজন্মের ভেতরে মজবুত ঈমান ও তাকওয়া সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত রাখা দরকার। আগামী দিনের নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব করতে চাইলে এখন থেকেই আমাদের নতুন

প্রজন্মকে নতুন সূর্যোদয়ের পথ চিনিয়ে দিতে হবে গভীর মনোযোগ, নিষ্ঠা আর যত্নের সাথে।

মক্কায় দিনযাপন

মুনযিরকে কোলে করে পাহাড়ের উপরে আবাসিক হোটেলের তিনতলায় উঠানামায় কষ্ট হচ্ছিল। তার উপর আমাদের রুমে এটাচড্ বাথরুম না থাকায় করিডোর সংলগ্ন গণ-টয়লেট ব্যবহার করতে কষ্টটা ছিল কয়েকগুণ বেশী। সেখানে পর্দার সমস্যা ছিল, পরিচ্ছন্নতারও। এটাচড্ বাথরুমের বাসার জন্য কাফেলা পরিচালককে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, বাসা বন্টন প্রায় শেষ, তবুও চেষ্টা করবেন।

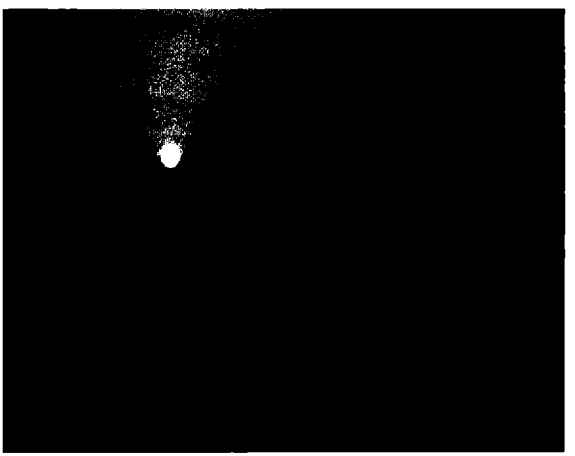

জাবালে রাহমাত ঃ
আরাফাতের ময়দানের উত্তর প্রান্তে এ পাহাড়ের অবস্থান।

পরদিন ২৮ ডিসেম্বর। ফযরের পর নাস্তা সেরে ঝটপট রেডি হয়ে বেরিয়ে এলাম। আজ আমরা হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো যিয়ারাহ বা ভিজিট করতে যাচ্ছি, হজ্জের পূর্বপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৌড়ে এঁকেবেঁকে বেশ মজা করে নামছে মুনযির। দারসিন্দি-২ এর বাসা থেকে দু'মিনিটের মধ্যে মিসফালাহ রোডে জান ফার্মেসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওখানে গ্রুপের অনেকেই জড়ো হয়ে, বাসের অপেক্ষায়। নানা ধরণের ফল বোঝাই ভ্যান মক্কার পথে-প্রান্তরে বার বার চোখে পড়েছে। এখানে পৃথিবীর তাবৎ ফলের সমারোহ দেখে আমার মনে হয়ে যায় ইবরাহীম(আঃ) এর দু'য়ার কথা। পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলের ফল পাওয়া যাবে মক্কায়। এ যেন আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর বন্ধু ইবরাহীম(আঃ) এর দু'য়ার জবাব।

বাস আমাদেরকে নিয়ে গেল মক্কা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে আরাফাতের ময়দানে যেখানে দাঁড়িয়ে মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন। জাবালে রাহমাতের পাদদেশে মুনযিরকে নামিয়ে দিলাম। ও দৌড়-ঝাঁপ করল। উটকে আদর করল। ওর আব্বু উঠলেন পাহাড়ে। মন ছুটে বেড়াল ইতিহাসের পাতায় পাতায়। তখন ছিল এক ধূ-ধূ বিরান মাঠ আর এখন আরাফার ময়দানে সারি সারি নিম গাছ ছায়া দিচ্ছে। পানির সার্বক্ষণিক সাপ্লাই রয়েছে। আরাফা থেকে বাসে করে মুজদালিফা, মিনা এবং জামরা

পর্যন্ত গেলাম। হজ্জের কোন কাজ কখন কোথায় কিভাবে করতে হবে গাইড জনাব আব্দুল বাকী ভাই সে বিষয়ে নির্দেশনা দিলেন।

চলন্তবাস থেকে পাহাড়ের পাদদেশে নির্মিত প্রায় সাড়ে বারশ বছরের প্রাচীন 'নাহরে জুবাইদা' দেখেছিলাম, যা এঁকেবেঁকে আরাফা, মিনা এবং মক্কার পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মক্কা শহরে প্রবেশ করেছে। এর উৎসমুখ রয়েছে মক্কা থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হুনাইন ভ্যালিতে। এ ক্যানেলটি নির্মাণ করেন আব্বাসীয় খলিফা হারুনূর রশীদের স্ত্রী বেগম জুবাইদা। প্রায় বারশত বছর ধরে এ ক্যানেল মক্কার বাসিন্দা ও হজ্জযাত্রীদের নিত্য ব্যবহার্য পানি সরবরাহের উৎস হিসেবে চালু ছিল। সময়ের আবর্তনে এবং নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে পানির প্রবাহ শুকিয়ে গেলেও একজন মুসলিম নারীর প্রশাসনিক দক্ষতা, মানব-কল্যাণ ও সমাজসেবার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে পাহাড়ের ঢালে আজও জেগে আছে নাহরে জুবাইদার পুরু দেয়াল।

নাহরে জুবাইদা ঃ এক মুসলিম নারীর প্রশাসনিক দক্ষতা ও মানব-কল্যাণের স্মৃতিচিহ্ন।

হেরা পাহাড়
মানবতার চিরায়ত মুক্তি ও কল্যানের বারতা নিয়ে কুরআনের প্রথম অবতরণ এখানেই হয়েছিল।

ফেরার পথে আমরা জাবালে নূর বা হেরা পাহাড় দেখতে পেলাম। এ পাহাড়েই রাসূল (সঃ) এর উপর মহান আল্লাহর পক্ষ হতে চিরন্তন হিদায়াতের আলোকবর্তিকা আল-কুরআন নাযিল হতে শুরু করেছিল। আমি চলন্ত বাস থেকে জাবালে নূরের দিকে

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্মরণ করছিলাম রাসূলের প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা(রাঃ) এর ত্যাগ ও বিচক্ষণতার কথা।
খাদিজা(রাঃ) ছিলেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি নবী মুহাম্মদ(সঃ)-এর দাওয়াত কবুলকারী প্রথম ব্যক্তিত্ব। এমন একজন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের Entrepreneur, যার সমস্ত সম্পদ নিবেদিত হয়েছিল ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য। অতি দরদী ও ত্যাগী একজন স্ত্রী। রাসূলের সত্যপথ সন্ধানের সাধনায় সহযোগিতা করার প্রয়াসে মরুর এই পাথুরে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনিই রাসূলের দৈনন্দিন খাদ্য-পানীয় সরবরাহের সুকঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন। রাসূল(সঃ) খাদিজা(রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিবৃত করেছেন এভাবে, "মারইয়াম ছিলেন অতীত নারী সমাজের শ্রেষ্ঠ, আর খাদিজা বর্তমান নারী সমাজের শ্রেষ্ঠ।" [সহীহ বুখারী ঃ ৩৫৩৩]
আবু হুরাইরা(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরাইল (আঃ) এলেন। বললেন, "হে রাসূল, এই যে, খাদিজা একটি পাত্র বয়ে আনছেন, যাতে খাদ্য বা পানীয় রয়েছে, তিনি এলে তাকে তার রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং জান্নাতের এক মনিমুক্তা খচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দিন যেখানে কোন শোরগোল, কষ্ট ও ক্লান্তি থাকবেনা।" [সহীহ বুখারী ঃ ৩৫৩৮]
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সেই মা-খাদিজার পদাংক আমার সামনে মেলে ধরে আছে হেরা পাহাড়, আমি অভিভূত বোধ করছিলাম। হজ্জের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমার সামনে থাকায় পাহাড়ে উঠার এবং কাছে থেকে দেখার তাৎক্ষণিক ইচ্ছেটা সংবরণ করলাম।

যিয়ারাহ থেকে ফিরে আমি বাসায় আসলাম, মুনযিরকে take care করতে। মুনযিরের আব্বু হারাম শরীফে চলে গেলেন। যুহরের নামাযের পর এসে বললেন, - 'একটা বাসার খোঁজ পেলাম, এটাচড্ বাথ, পুরুষ ও মহিলাদের থাকার আলাদা রুম।' মুনযিরের দেখাশোনার জন্য আমাদের এক সঙ্গে থাকাই সুবিধাজনক ছিল কিন্তু বাথরুম আর পর্দার সমস্যা টলারেট করার মত নয়। কাফেলা পরিচালক বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন এর চেয়ে ভাল বাসা জোটাতে পারলেন না বলে। ভেবে চিন্তে বললাম- 'আমার আপত্তি নেই।'
- 'তাহলে এক্ষুনি যেতে হবে। দুইরুমে দু'টো মাত্র বেড খালি। ক্রমাগত হাজীরা আসছেন, দেরী হবে না Fill-up হতে।'
ঝড়ের গতিতে লাগেজ গুছালাম। কাফেলার গাইড মাশরুর ভাই আসলেন। বললেন, "শোয়েব ভাই, লাগেজ কমান। যতটুকু না হলেই নয়। ঐ রুমে লাগেজের জায়গা নেই।"

আবার সব লাগেজ খুলে শুধু জরুরী জিনিসগুলো ব্যাগে নিলাম। এখন দু'জনের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, কাপড়, সাবান, টুথপেষ্ট, শুকনো খাবার, প্লেট-গ্লাস পর্যন্ত সব আলাদা হয়ে গেল। এখানে মদীনার চেয়ে শীত কম বলে হালকা পাতলা শীতের কাপড় হাতে রাখলাম। বাকী সমস্ত লাগেজ নীচতলার গোডাউনে মাশরুর ভাই নিজ দায়িত্বে রেখে দিলেন।

এই মিসফালাহ রোডেই সুপরিচিত ঢাকা ও চিটাগাং হোটেল এবং যমযম হোটেলের পাশে দারসিন্দি-১ এর নীচ তলার পাশাপাশি দু'টো রুমে আমাদের লাগেজ পৌঁছে দেয়া হল। এখানে এসে শুভাকাঙ্খী কোহিনূর ভাবীকে পেলাম। ফ্লোরে কোন গ্যাপ ছাড়া পর পর ছয়টি ফোমের বিছানা পাতা। একটিতে আমি মুনযিরসহ, আমার পাশেরটিতে কোহিনূর ভাবী। আরো চারজন বয়স্ক খালাম্মা রয়েছেন রুমে। দু'জনের রুম আলাদা হওয়াতে মুনযিরকে take care করায় ওর আব্বুর এতদিনের সযত্ন সহযোগিতার সুযোগটুকু হারাচ্ছি ভেবে খুব চিন্তিত বোধ করেছিলাম আর মনে মনে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা করছিলাম। যখন দেখলাম কোহিনূর ভাবী স্বেচ্ছায় সানন্দে দু'হাত বাড়িয়ে সহযোগিতা করছেন, তখন মনে হল আল্লাহ তার বান্দাদেরকে এভাবেই সাহায্য করেন। আজও আমি এই বোনটির জন্য অন্তর থেকে দু'য়া করি আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন।
খালাম্মাদের একজন ডায়াবেটিস আর তিনজন হাইপ্রেশারের পেসেন্ট। উনারা মক্কার হঠাৎ গরম, হঠাৎই শীতল- এ আবহাওয়ায় নিজেদের এডজাস্ট করতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। তার ওপর মুনযিরের সহজাত চাঞ্চল্যে, খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করেই ফেলতেন। ব্যাপারটা আমি সহজভাবে নিলেও মুনযির খুব মন খারাপ করত। কান্নাকাটি করত।

খোলামেলা পরিবেশে অভ্যস্ত মুনযির বাইরে বেরুনোর জন্য ব্যাকুল থাকত। বাইরে যাবার জন্য বাবার সাথে মাম্‌কে ওর চাই। তাই গোসল, খাওয়া আর ঘুম ছাড়া বাদবাকী সময়টা ওকে নিয়ে ঘরের বাইরেই কাটাতে হত। হারাম শরীফে গেলেই খুব খুশী। আমার সাথে নামায পড়ে, দু'য়া করে। যতক্ষণ ওখানে থাকা যায়, আপত্তি নেই। আমরা নামাযে গেলে একবারে দু-তিন ওয়াক্ত নামায সেরে ঘরে ফিরি।
আমাদের উপরে তিনতলায় সাফা আর ফারাহদের রুম। দু'তলায় কিচেনে মুনযিরের খিচুড়ি রান্নার সুবাদে গেলে প্রতিদিনই ওদের সাথে কথা হয়। মাঝে মাঝে এসে ওরা মুনযিরের সাথে খেলে। আমি ফযরের নামায পড়েই কিচেনে যাই। দেরী হলে ফারাহদের কুক চলে আসে। বড় ফ্যামিলি হওয়ায় ওরা স্পেশাল কুক রেখে পছন্দমত বাজার, রান্না-বান্না করাচ্ছে। মদীনায় মুনযিরের খাবার রান্নার জন্য আমাদের যে কুকারটি দেয়া হয়েছিল, মক্কায় এসে আর সেটা পাইনি। কোনভাবে মিস্‌প্লেস হয়ে গেছে। এখানকার রুমে সেটার স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভবও ছিলনা। আমরা অবশ্য দু-বেলা এজেন্সী পরিবেশিত বাংলাদেশী খাবার খেয়েছি স্বাচ্ছন্দে। খাবার খুবই পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত। পরিমাণে একটু বেশীই হত। রাতের বাড়তি খাবার ফ্রিজে রেখে দিতে হত, যা দিয়ে মাঝে মাঝে সকালের নাস্তাও হয়ে যেত। আবহাওয়া খুবই শুষ্ক বলে খাবার এখানে সহজেই নষ্ট হয়না।

পরীক্ষার এক Field মক্কা

নামাযের এক ঘন্টা আগে হারাম শরীফে হাজির থাকতে পারলে বেশ স্বাচ্ছন্দে বসা যায়, নয়তো জায়গা মেলা ভার। আধ ঘন্টা আগে গেলে স্থান হয় বাইরের চাতালে। পনের

মিনিট আগে গেলে সদর রাস্তায়। হজ্জের দিন ঘনিয়ে আসছে, ভিড় বাড়ছে। ঘন্টায় ঘন্টায় আসছেন নতুন অতিথিরা। যে বেলা সময়াভাবে হারাম শরীফের ভেতরে ঢুকতে পারিনি সে-বেলা উঠে গেছি মক্কা টাওয়ারে। হারাম শরীফের বাইরের আঙিনা ছুঁয়ে নির্মিত মক্কা টাওয়ার হলো বিশাল এক শপিং মল, এর সাথেই ফাইভস্টার হোটেল 'হিলটন'। এই হোটেলের তিন এবং চার তলায় পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের ফ্লোর আছে। এখান থেকে হারাম শরীফের জামায়াতে অংশ নেয়া যায়। সদর রাস্তার পাশ থেকেই Escalator-এ উঠে এই ফ্লোরে পৌঁছা যায়। যেদিন প্রথম হিলটনের ফ্লোরে নামাযের জন্য গেলাম, সেদিনকার অভিজ্ঞতাটুকু ছোট্ট কিন্তু গভীর।

মুনযিরের আব্বু আমাকে Escalator-এর কাছে পৌঁছে দিয়ে হারাম শরীফের দিকে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন, ' তিন বা চার তলায় উঠে নামাযের ফ্লোর একটু খুঁজে নাও। খুঁজে না পেলে বাসায় ফিরে যেও। ছোট বাচ্চা নিয়ে রাস্তার উপরে নামাযে না দাঁড়ানোই ভাল।'

আমি উপরে উঠে কর্তব্যরত গার্ডদের জিজ্ঞেস করে মহিলাদের নামাযের ফ্লোর পেয়ে গেলাম। বড় ডোর নক্ করতেই খুলে গেল। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই পরিস্কার ইংরেজিতে বললো এক নারীকণ্ঠ, "No entrance with baby" মুনযিরের দিকে ইংগিত করল সে। আমি বিনীতভাবে সালাম জানিয়ে বললাম, "No problem, sister. My baby is clean, dressed with pampers. Please allow me to in."

মহিলাটি পুনরায় দ্বিগুণ দৃঢ়ভাবে বললো, "No entrance with baby." এভাবে নিষেধ করার কারণে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি ছোট ছোট পদক্ষেপে নামাযের কক্ষ থেকে বেরিয়ে প্রশস্ত লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম- 'কোথায় যাব'।

ইতোমধ্যে হারাম শরীফের আযান হয়ে গেল। আযানের পাঁচ মিনিট পরই নামায শুরু হবে। আমি দাঁড়িয়ে আযান শুনছিলাম। সামনে-পিছনে, ডানে-বামে তাকিয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। ডানদিকে নামাযের কক্ষ, আমার সামনে কিবলার দিকে দু'টো চলন্ত escalator. বাঁয়ে বিশাল বড় কাঁচের দেয়াল। পেছনের করিডোর দিয়ে কিছু লোক যাতায়াত করলেও সামনের দিকটায় লোকের চলাচল নেই। বেশ বড় ফাঁকা স্পেস। আমি আমার চাদর ও জায়নামায বিছিয়ে বসলাম। আশ-পাশে কেউ নেই। মুনযিরকে ওর চাদরে বসিয়ে দিলাম খেলনা দিয়ে। ঝরঝর করে আমার মনের চাওয়া গুলো নিবেদিত হতে থাকলো আল্লাহ পাকের কাছে। আমি যেন আবারও এই হারামে আসতে পারি, কাছে যেতে পারি। হতে পারি ঘরের তাওয়াফকারী, কিয়ামকারী-বারবার ....।

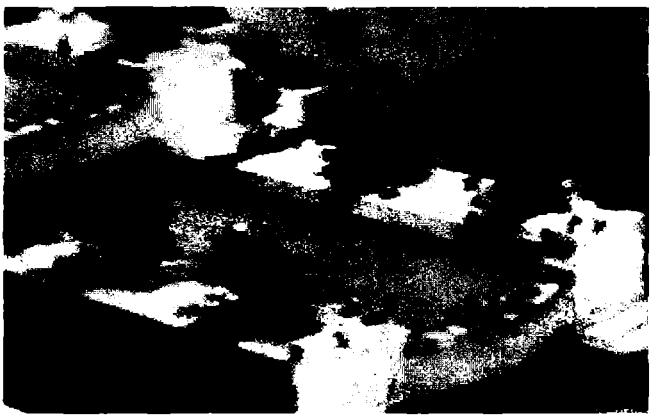

মক্কা হিলটনের পাশে কৃত্রিম ঝরনায় পানির সন্ধানে কবুতরের ঝাঁক।

ইতোমধ্যে ইকামাত শুরু হতেই আমি লক্ষ্য করলাম পেছন থেকে দলে দলে মহিলারা এসে আমার পাশে এবং পেছনে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেছেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া জানালাম। নামায শেষ করা পর্যন্ত মুনযির বাঁ দিকে কাঁচের দেয়ালের পাশে খেলা করছিল। বাইরে একটা artificial ঝরনা আছে, ঝাঁক ঝাঁক কবুতর ওখানে পানি খাচ্ছে। মুনযির অবাক চোখে এসব দেখছিল। একটি কবুতর পানি খেতে গিয়ে ঝরনায় ডুবে মরে গেলে তা দেখে মুনযির খুব মন খারাপ করেছিল। এরপর বহুবার ওখানে নামাযের জন্য গিয়েছি। জায়গাটা মুনযিরের খুবই familiar হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য শেষের দিকে নামায শুরু করলে ছুটোছুটি করতো। পেছন দিকে গার্ড ছিল, তারা দেখতো ওকে।

Escalator

সামনের দিকে গিয়ে চলন্ত escalator-এ উঠার কোশেশ করাতে আমাকে নামায ছেড়ে ওকে ধরতে হয়েছে কয়েকবার। স্মৃতিটা মনে হলে, কত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাকে তাঁর ঘরে নিয়েছেন, সেকথা ভেবে এখনও আমি শুকরিয়ায় বিনত হই।

এই মক্কা হিলটন টাওয়ারে নামায পড়তে যেয়ে জ্ঞানের এক খনি আবিষ্কার করলাম। নামায সেরে ঘুরে ফিরে মুনযিরকে শপ গুলো দেখাই। ওখানকার বুক শপে গিয়ে দেখি বিশ্বমানের সব ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীস সংকলন। ঘন্টার পর ঘন্টা বই ঘাঁটাঘাটিতে মুনযিরের কোন ক্লান্তি নেই। ওর আব্বুও তেমন। শিশুদের উপযোগী নবীদের জীবনভিত্তিক historical বইগুলো চমৎকার। উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে কয়েকদিনে বেশ কিছু rare বই কেনারও সুযোগ হয়েছিল।
মক্কায় মোবাইলের যে সিম দুটো আমরা কিনেছিলাম সেগুলোর নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। এ জন্য অনেক সময়ই এমন হয়েছে হাতে মোবাইল থেকেও প্রয়োজনমত ফোন করতে না পারায় মুনযিরের আব্বুর সাথে আমার বেশ communication gap হয়ে যেত। এ জন্য ভাল নেটওয়ার্ক আছে দেখে শুনে এমন সিম কেনা দরকার ছিল। হজ্জের সফরে খুব ভাল পারফরমেন্স এর জন্য সফরসঙ্গীদের regular communication খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোহিনূর ভাবীর আন্তরিক সাহচর্যে যখন দেখলাম মুনযির কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে, তখন একদিন ওকে ঘুম পাড়িয়ে কোহিনূর ভাবীর তদারকীতে রেখে তাওয়াফ করতে গেলাম আমরা দু'জনে। ফিরে এসে শুনি মুনযির চাচীর সাথে বেড়াতে গেছে। অল্পক্ষণ পর ফিরলে শুনলাম, মুনযির মিনিট পনের হয় ঘুম থেকে উঠেছে। তখন কোহিনূর চাচী বলেছেন, "তোমার মাম আর বাবা তাওয়াফ করতে গেছেন। একটু পর আসবেন। চলো আমরা সাফা'পুদের রুম থেকে বেড়িয়ে আসি।" সে ঘাড় কাত করে সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম এ সহজতার ধারা যেন অব্যাহত থাকে।

মধ্যরাতের কাবায়

নতুন রুমে আসার পর পর মুনযিরের বেশ ঠান্ডা লেগে গেল। হাঁচি-কাশি আর অল্প অল্প সর্দি। খাবারে দারুন অরুচি। ঘুমাতে গেলে বাবা মাম্ দু'জনকেই চাই। ফলে ঘুমেরও অনিয়ম শুরু হল। এক রাতে ন'টার দিকে ঘুমিয়ে গেল মুনযির। রুমের অন্যরা তখনও জেগে। যে যার কাজে ব্যস্ত। কেউ খাচ্ছেন, কেউ গল্প করছেন। বিনীত অনুরোধ করলাম, জোরে শব্দ না করার জন্য। কিন্তু কে সেদিকে দেখবে? গল্প আর হাসির শব্দে মুনযির জেগে গেল। কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে কান্নাকাটি করছিল। অনেক চেষ্টা করেও আর ঘুম এলনা ওর। দুধ খেয়ে সারাঘর জুড়ে খেলাধুলা শুরু করল। ইতিমধ্যে অন্যরা ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু মুনযিরের চাঞ্চল্যে অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকলে আমি বিব্রতবোধ করেছিলাম।

বাধ্য হয়ে পাশের রুমের দরজা নক্ করে মুনযিরের আব্বুকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। সব শুনে আমাদের সাথে নিয়ে বেরিয়ে আসলেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে হারাম শরীফে চলে এলাম। বাইরের চত্বরে বহুলোক বিছানা করে রাত্রিযাপন করছে। cleaner van ময়লা নিয়ে যাচ্ছে। পড়ে থাকা জুতা-স্যান্ডেল, ব্যাগ, কাপড় সবকিছু তুলে নিয়ে আঙিনা সাফ করছে। ডিটারজেন্ট দিয়ে ফ্লোর পরিস্কার করছে। মিষ্টিগন্ধ নাকে আসছে। ছোট ট্রাকটরের মত মটর আসছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে, আরেকটি এসে মুছে নিচ্ছে।
রুকনে ইয়ামানীর দিকের গেট দিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। এখন মুনযির খুবই খুশী। দু'হাত তুলে দু'য়া করলো আমাদের সাথে। মহান আল্লাহর হেদায়াত ও কল্যাণের প্রতীক কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে তাঁর অতিথিরা। কিয়ামকারীরা কাবার আঙিনায় রুকু এবং সিজদায় বিনত হয়ে আছে। আমাকে মহিলাদের একটি সারির পাশে দাঁড় করিয়ে মুনযিরকে নিয়ে ওর আব্বু তাওয়াফ করতে গেলেন। আমি আমার ভালবাসার ঘরকে সামনে রেখে ভাবছি যিনি এ ঘরকে মানুষের কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর ভালবাসা নাজানি কত!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে লক্ষ মুমীন সিজদাবনত। এটাও তাঁর এক অনন্য নিদর্শন যে তিনি কাবাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে রেখে এ ঘরের অভিমুখী হয়েই তাঁর আনুগত্য প্রকাশের কল্যাণকর নিয়ম শিখিয়েছেন। অন্য কোন দিকে সিজদাই গ্রহণযোগ্য নয়। ইউরোপের এক ননমুসলিম বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্মে মুসলমানদের কাবামুখী সিজদার কল্যাণের physical দিকটি উন্মোচিত করা হয়েছে, যে তথ্যটি একসময় ইন্টারনেট থেকে পেয়েছিলাম। সেখানে দেখানো হয়েছে মানবদেহ দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া হতে যে সব পজিটিভ তড়িৎ-চুম্বকীয় কম্পন রিসিভ করে, তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানবদেহের নিস্তারের উপায় হল, মাটিতে একাধিকবার মাথা ঠেকানো। এরফলে শরীর সফলভাবে আধানমুক্ত হয়। ব্যবস্থাপনাটি, বজ্রপাত হতে নিরাপদ রাখতে বিল্ডিং-এ ব্যবহৃত আর্থ কানেকশানের মত।
দুটো বিস্ময়কর ব্যাপার তার গবেষণায় বেরিয়ে এসেছেঃ
১. বালুময় ভূমিতে কপাল ঠেকানো বেশী কার্যকরী, এবং
২. এ ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক চার্জ সর্বাধিক পরিমাণে মুক্ত হবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে কপাল ঠেকালে।

এক অমুসলিম বিজ্ঞানীর গবেষণায় যে কল্যাণের কথা এখন প্রকাশ পাচ্ছে ইসলাম তার অধিক প্রকাশ করেছে হাজার বছর আগে যে "আল্লাহ সম্মানিত কাবাগৃহকে মানব জাতির স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন।"(সূরা মায়িদাঃ ৯৭)

মক্কাস্থিত কাবাঘর পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কাবামুখী হয়ে সিজদা করার নিয়ম প্রথম মানব আদম (আঃ)থেকেই আল্লাহ শিখিয়েছেন। মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সব জানেন আর তাই তিনি বলে দিয়েছেন কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ। বিজ্ঞান যুগ পরম্পরায় তার গবেষণায় সেই জ্ঞানের কিছু অংশবিশেষ

জানতে পারে। ইসলাম বলে দিয়েছে এমন অনেক বিষয়ই আজ বিজ্ঞান প্রমান করেছে। একজন মুমীন ব্যক্তি আল্লাহকে মহাবিজ্ঞানী বিশ্বাস করায় তার জন্য বিজ্ঞানের গবেষণায় সাফল্যলাভ অধিকতর সহজ নয়কি? লৌহ-প্রযুক্তিতে সাফল্য লাভ করেছিলেন আল্লাহর নবী দাউদ(আঃ), আজকের বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তিতে সুযোগ্য হয়ে ইসলামের সুবাতাস আমরা কি ছড়িয়ে দিতে পারিনা? ইসলামকে মেনে জীবনযাপনের কারণে একজন মুমিন মহাজ্ঞানী আল্লাহর সুনির্ধারিত কল্যাণসমূহ জেনে হোক না জেনে হোক পেয়ে যায়;

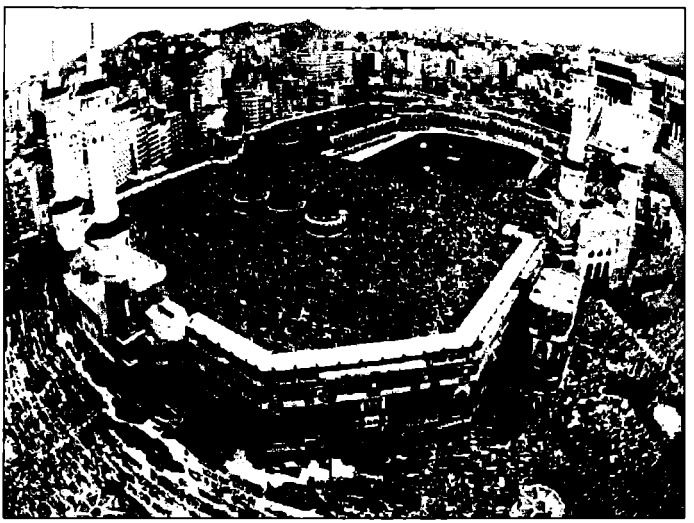

কাবাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মানব জাতির জন্য কল্যাণের এক প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়ে মানবতার সুখ,শান্তি, সমৃদ্ধি,উন্নতি এবং সর্বকালের মানুষের মঙ্গলের যে আহবান আল্লাহ করেছেন, তাতে কি বিবেক সাক্ষ্য দেয় না যে আল্লাহই আমার একমাত্র মালিক, অন্য কেউ নয়?

কিন্তু অন্যদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলায়, মানবতার কল্যাণ করায় যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সুদক্ষ অবদান রাখতে সক্ষম হওয়া কি উম্মাহর জন্য খুবই প্রয়োজন নয়? নিচের আয়াতটিতে আল্লাহ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেনঃ *"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে বা দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে, আখিরাতের আশংকা রাখে এবং পালনকর্তার রহমতের প্রত্যাশা করে, সেকি তার সমান যে এরূপ করেনা? বলুন, যারা জানে আর যারা জানেনা উভয়ে কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান।"[সূরা আল যুমারঃ৯]*

ততক্ষণে রাত বারটা পেরিয়েছে। আমি সালাতকারীদের মাঝে শামীল হয়ে গেলাম। নামায শেষে আবার তাকিয়ে আছি। মাথার উপর লক্ষ তারার ঝিকিমিকি। আমার সামনে সম্মানিত ঘর, যা কখনো নিঃসঙ্গ হয়না। গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রমালার পরিভ্রমনের মতই মানবজাতির একাংশ যে গৃহকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে সমাপ্তিহীন স্রোতধারার

মত..... একদল শেষ করতেই আরেক দল, এভাবে কিয়ামাত পর্যন্ত জারী থাকছে প্রদক্ষিণের এ পরম্পরা। মানব জাতির মধ্যে কাবাঘর প্রদক্ষিণের এ পরম্পরা জারী রাখার এই যে, একক ব্যবস্থাপনা- এটা তাঁর একমাত্র রব হবার সুগভীর নিদর্শন বহন করে। পৃথিবীর আর কোনও স্থাপত্য নিদর্শন নেই যেখানে প্রদক্ষিণের এমন ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। এই মধ্যরাতে এইখানে এসে কী যে ভাল লাগার অনুভূতি হয়েছিল তা প্রকাশের ভাষা নেই। একসময় অনুভব করলাম, আশেপাশে অগণিত কান্নার অনুচ্চ রব। নিজের ক্ষুদ্রতা আর মহান আল্লাহর অর্পিত দায়িত্বের বিশালতা উপলব্ধি করার, জীবনের অজস্র ভুল ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে তাঁরই সমীপে বিনত তনু ও মনে নিজেকে পেশ করার এক দুর্লভ সময় এই মধ্যরাত। এ সময়ে নিজেকে প্রভুর নৈকট্যে সঁপে দেয়ার, নিজের সকল চাওয়া পাওয়ার মিনতি প্রকাশের এ অনুশীলন যখন যেখানেই থাকিনা কেন একান্তভাবেই প্রয়োজন।

কাবার দিক থেকে বয়ে আসা হিমেল বাতাস গোটা শরীর ও মনকে জুড়িয়ে দিল। মুনযির তাওয়াফের মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে ওর আব্বু ওকে আমার কাছে রেখে তাওয়াফ শেষ করতে গেছেন। চত্বরে শিশির পড়ছে। হারাম শরীফের ভেতরে গিয়ে ওকে পাশে শুইয়ে রেখে নামায সেরে নিলাম। ঘন্টাখানেক পর আল্লাহর লক্ষ লক্ষ অতিথিরা তাহাজ্জুদের জামায়াতে শামীল হবে। এজন্য ধোয়া-মোছা চলছে।

সাহায্য ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়

৩১ ডিসেম্বর ২০০৫, বছরের শেষ দিন। মাগরিবের নামায পড়ে হারাম শরীফের ছাদে, লালিমা মাখা আকাশের নিচে দেখছি আনন্দের জোয়ার জেগেছে। এইমাত্র যিলহজ্জের চাঁদ উঠেছে। ৮ যিলহজ্জ হবে জানুয়ারী এর ৮ তারিখ। সেদিন থেকেই মিনায় camping শুরু। দেশের ফোন পেলাম একে একে কয়েকটি। মুনযিরের নানাভাই, খালামনি, চাচু এবং কামাল ভাই ফোন করেছেন। আমরা সবার কাছে দু'য়া চাইলাম যেন সুন্দরভাবে, সহীহভাবে, নিরাপদে হজ্জ সুসম্পন্ন করতে পারি। আব্বা ও আপার সাথে কথা বললাম। বড়মেয়ে উমামা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল শুনে হারামের ছাদে বসে প্রাণভরে দু'য়া করলাম যেন আল্লাহপাক ওকে পূর্ণ সুস্থ করে দেন। গত দু'মাসে যে সমস্যাটা ধরা যাচ্ছিল না অথচ সে ব্যথায় খুবই কষ্ট পাচ্ছিল; সেটা আমরা চলে আসার কয়েকদিন পরই ধরা পড়ে এবং আমরা হজ্জ সেরে দেশে ফেরার দু'সপ্তাহের মধ্যে **Appendicitis** অপারেশন সফলভাবে সুসম্পন্ন হয়। আমরা হজ্জে থাকাকালে উমামাকে হসপিটালাইজ করায় ওর খালু ডাঃ মনোয়ার হোসেন আর খালামণি ডাঃ খালেদা নাসরিনের সার্বক্ষণিক তদারকীর কথা ভুলে যাবার মত নয়। সেই সাথে ছিল উমামার নানা-নানু আর বড়মামীর সযত্ন পরিচর্যা। ওর এক বছরের বড় মামাত বোন মাহজুবার হসপিটালে ওকে দিনভর সঙ্গ দেয়া ছিল সেই সেবা যত্নেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হসপিটালে দেখতে গিয়েছিলেন ওর ফুফী ও চাচা-চাচীরাও। হসপিটাল থেকে রিলিজ হবার পর বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়ানো আর excursion এ মাতিয়ে

রেখেছিলেন ওদের চাচা। এভাবেই আসে আল্লাহর সাহায্য। সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। একটি বিপন্ন পরিস্থিতিতে বাবা-মায়ের অনুপস্থিতি যেন তারা বুঝতেই দেননি আমাদের সন্তানকে। তাদের সকলকে আল্লাহপাক উত্তম প্রতিদান দিন।

হজ্জের সফরে বের হয়ে যে আল্লাহর সাহায্য আমি আরও কতবার কতভাবে পেয়েছি, সেটা বর্ণনা করা আমার সাধ্যে নেই। তবে হজ্জের ফিল্ডে বড়ভাই ডাঃ কিউ এম ইকবাল হোসেনের উপস্থিতি ঐ সময়ে আমাদের জন্য আল্লাহর অনেক বড় আরেকটি সাহায্য ছিল। দেশে থাকতে উনার হজ্জে আসার সম্ভাবনার কথা শুনেছিলাম তবে confirm ছিলনা। ফোনে আব্বার কাছে শুনেছিলাম বড়ভাইয়ের ফ্লাইট ১ জানুয়ারী। ট্রানজিট থাকায় মক্কায় পৌঁছাচ্ছেন ৩ জানুয়ারী। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

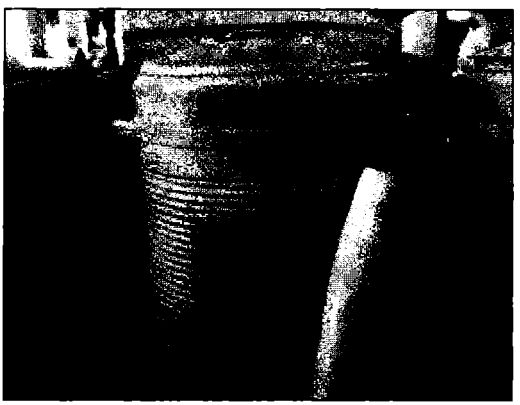

*যমযমের পানি হারাম শরীফের সবখানেই সাপ্লাই দেয়া হয়। শুধুমাত্র **'NOT COLD'** লেখা কন্টেইনারে নরমাল তাপের পানি থাকে। জানা না থাকায় কষ্ট করে ঠান্ডা পানিই অনেকে খান, এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন।*

৩১ ডিসেম্বর রাতে বেশ জ্বর আসল আমার। যমযমের frozen পানি হারাম শরীফে গেলেই খাচ্ছিলাম। তখনও জানতামনা যে সবুজ চিহ্নিত কলে নরমাল পানির ব্যবস্থা আছে। ফলে গলাব্যথা আর কাশি শুরু হয়েছিল আগেই। শরীরে বেশ ভাঙ্গচুর নিয়ে কাটালাম পরের দিন ১ জানুয়ারী ২০০৬, বছরের প্রথম দিনটি। মুনযির আমার শুয়ে থাকাটা সহজভাবে নিতে পারছিল না। কান্নাকাটি করছিল। ওর আব্বু ওকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাইরে গিয়েই আবার মাম্ মাম্ করে ফিরে আসছিল। কোহিনূর ভাবী চেষ্টা করেছেন ওকে এটা ওটা খাওয়াতে। বাসায় আমি অসুস্থ হলে মুনযিরের দেখাশোনায় ওর বড় ভাইবোনরা সহায়তা করে। খুব ফিল করছিলাম।
এইস খাচ্ছিলাম। জ্বর কমলে উঠে নামায, খাওয়া, মুনযিরের পরিচর্যা, খাওয়ানো সারতে না সারতেই আবার জ্বর আসছিল। ২ জানুয়ারী রাত পর্যন্ত এভাবেই চল্‌লো। সে রাতে মুনযিরও অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাতভর বমি করল। সাথে হালকা জ্বর, কাশিও অল্প অল্প ছিল আগে থেকেই। ওদিকে নিয়মিত গার্গেল করে, এ্যালাট্রোল খেয়েও আমার নিজের গলাব্যথা আর কাশির কোন বিরাম নেই। সারারাত প্রায় নির্ঘুম কাটলো। পরদিন ৩ জানুয়ারী সকালে ন'টার দিকে প্রায় এক কিলোমিটার পথ হেঁটে মুনযিরের আব্বুর সাথে

হিযরাহ রোডে অবস্থিত বাংলাদেশ হজ্জ মিশন এর হসপিটালে গেলাম। ওখানে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তার আমাকে দেখলেন এবং Antibiotic ঔষধ লিখে দিলেন। কিন্তু মুনযিরকে দেখাতে চাইলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বললেন যে, "এখানে শুধু বড়দের চিকিৎসা করা হয়, শিশুদের ব্যবস্থা নেই।" অসুস্থ শরীরে বাচ্চা কোলে নিয়ে এক কিলোমিটার পথ হেঁটে আসতেই শরীর ভেঙ্গে আসছিল, এখানে বাচ্চাকে ডাক্তার দেখাতে পারবোনা শুনে মনটাও ভেঙ্গে পড়ছিলো কষ্টে। সংযত থেকে বিনীত উচ্চারণে অনুরোধ জানালাম,

-"Please, আপনি শুধু ওর chest দেখুন। কোন infection আছে কিনা বলুন। কোন প্রেসক্রিপশান লিখারও প্রয়োজন নেই। শুধু দেখে বলুন, antibiotic শুরু করা প্রয়োজন কিনা।"

ডাক্তার আমার অনুরোধ রাখলেন। ওকে চেক করে বললেন, "কফ খুব বেশী। তবে কোন ইনফেকশন নেই। সতর্কতামূলক হিসাবে antibiotic শুরু করতে পারেন।"

হসপিটাল থেকে ফিরতি পথে চোখ মেলে দেখে নিলাম। এই রোডটিই নবী (সঃ) এর হিযরাতের পথ। প্রিয় নবীজির (সঃ) প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনা অভিমুখে হিযরাতের সেই কন্টাকাকীর্ণ পাথুরে পথটিই আজকের এই হিযরাহ রোড। কত ত্যাগ, কত সবর, হিকমত আর আনুগত্যকে ধারণ করে তৈরী হয়েছে এই পথের ইতিহাস! আল্লাহর আনুগত্যের পথকে সকল পথের উপর প্রাধান্য দেয়ার স্মরণিকা। আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদানের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে নিজের স্বজন ও সম্পদের মায়ামোহ ত্যাগ করে নতুন দিগন্তে ছুটে চলার এই পথ। মক্কা থেকে মদীনা উত্তরে হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সঃ) মক্কা থেকে উত্তরদিক দিয়ে না বেরিয়ে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে দক্ষিণে রওয়ানা হয়ে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে হিকমতের সাথে চলার যে অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত রেখেছেন তার নমুনা এই হিযরাহ রোড। বর্তমানে এ রোড মদীনা পর্যন্ত প্রায় চারশ বিশ কিলোমিটার এবং ছয় লেন বিশিষ্ট। [At the service of Allah's guests: page-129]

আজকের হিযরাহ রোড। ইসলামের শত্রুদের কড়া নজরদারিতে সেদিন এ পথ ছিল সত্যিই কন্টকাকীর্ণ। আল্লাহর নির্দেশে রাসুল (সঃ) নিজের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে এ পথ ধরেই মদীনায় হিযরাত করেছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়সে ওহী পেয়ে আল্লাহর দিকে আহবানের কাজ শুরু করতেই কুরাইশ বংশের লোকেরা তাদেরই সবচেয়ে বিশস্ত 'আল-আমীন'কে প্রত্যাখ্যান করে বসলো।

বংশ পরম্পরায় লালিত মাটি-পাথরের মূর্তির পূজা-অর্চনার পাশাপাশি পৃথিবীর তাবৎ কুকর্ম করে বেড়াত যারা, তাদের প্রাণে সত্যের প্রতি, প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি সাড়া দেয়ার, অন্তরের রুদ্ধ দ্বার খুলে দেয়ার ন্যূনতম কোন আগ্রহ জাগেনি। ফলে স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী জীবন যাপন পদ্ধতি পরিহার করে মুহাম্মদ(সঃ) এর নেতৃত্বে পথ চলায় নিজেদের সদিচ্ছার অভাবটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় বাধা। একই কারণে আল্লাহকে একমাত্র সার্বভৌম সত্তা বলে মেনে নেয়া তাদের জন্য সহজ ছিলনা। হিদায়াতের জন্য যারা হৃদয়ের দরজাকে একেবারে খুলে দিয়েছিলেন, তারাই সত্যের আলো দেখতে পেয়েছেন। বাদবাকীরা তাদেরই 'আল-আমিন' এর উপর খড়গহস্ত হয়ে তাঁকে চিরতরে নির্মূল করার অভিযান চালিয়েছে। তাদের এহেন কার্যকলাপের ক্ষতি থেকে আল্লাহর রাসূলকে এবং দ্বীনকে হিফাজতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই রাসূলের প্রতি আসে হিযরাতের নির্দেশ।

রাতের অন্ধকারে কুরাইশদের কড়া নজরদারি এড়িয়ে নিজ জন্মভূমি, বসতবাটি, আপনজন সব কিছুর উপর আল্লাহর নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন মদীনার পথে। নিজ সংগী আবুবাকর (রাঃ) যখন শংকা প্রকাশ করেন যে কেউ তাদেরকে খুঁজে পেলে কী বিপর্যয়ই না ঘটাবে, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আশ্বাস দিয়ে সাহসী করে তোলেন যে, "হে আবুবাকর! তুমি সেই দু'ব্যক্তির ব্যাপারে কী মনে কর যাদের সঙ্গী তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ!!" [সহীহ আল বুখারীঃ ৩৬৫৩]

মক্কার দক্ষিণে সওর পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে থাকার একপর্যায়ে কুরাইশের লোকেরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে গুহামুখে গিয়েও আল্লাহর অনুগ্রহে মাকড়সার আর কবুতরের বাসা দেখে ফিরে যায় এবং হন্যে হয়ে অন্যত্র খুঁজে বেড়ায় মহানবী(সঃ)কে। এ আরেক বিস্ময়কর মুযিযা। হিযরাহ রোডের পাশেই আল্লাহর সাহায্যের এক আলোকিত নমুনা বুকে নিয়ে মাথা উঁচু করে জেগে আছে জাবালে সওর। আল্লাহর নির্দেশ পালনে ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসলেই যে সাহায্যের দিগন্ত তিনি উন্মোচিত করেন জাবালে সওর তারই নিদর্শন।

হিযরাহ রোডের পাশে জাবালে সওর ঃ যে পাহাড়ের গুহায় নবীজি (সঃ) আল্লাহর আশ্রয় আর নিরাপত্তা পেয়েছিলেন।

আবু বাকর (রাঃ) এর মত অনুগত, আলী (রাঃ) এর মত নির্ভীক সহচরগণ হিযরাতের ঐ হিকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যে করিৎকর্মা ভূমিকা রেখেছিলেন, তার নীরব ইতিহাস যেন কানে কানে বলে চলেছে এই হিযরাহ রোড। আমি সেই স্বর্ণালী ইতিহাসের পাতা উল্টাতে উল্টাতে কখন যে এক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ঘরে পৌঁছে গিয়েছি টেরই পাইনি।

রুমমেটদের কাছে শুনলাম, ভিজিটর এসে ফিরে গেছেন। মুনযিরের আব্বু সালেহ ভাইকে ফোন করে জানতে পারলেন, এই কাফেলারই একটি গ্রুপের সাথে বড়ভাই এসে পৌঁছেছেন এবং আমাদের খোঁজ নিয়েছেন। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। হজ্জ-সফরের সবচেয়ে কঠিন সময়গুলো সামনে রয়েছে। সঠিক guideline কঠিনতাকে সহজ করে। বড়ভাইয়ের চার/পাঁচ বছর সৌদি আরবের রিয়াদে কিং খালেদ হসপিটালে চক্ষু-বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি হজ্জ ও উমরাহর অভিজ্ঞতাও হয়েছে কয়েকবার। আমার আব্বা-আম্মার পরিবারে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আহবানকারী হিসেবে প্রথমেই বড়ভাইয়ের নাম চলে আসে। ইসলামী পরিবেশ তৈরীতে আব্বা-আম্মা গোড়া থেকেই ছিলেন অত্যন্ত সজাগ আর পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে বড়ভাই ছিলেন অগ্রণী। তিনি আমাদের ভাইবোনদের দ্বীনি-জ্ঞান ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির ব্যাপারে খুবই উদ্যোগী ছিলেন। এ জন্য তিনি সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন পরিবারের সবাইকে। হজ্জের এ সফরে তার সাহচর্য মনে হল আল্লাহর এক বিরাট সাহায্য হিসেবেই আমি পেতে যাচ্ছি, যা আমার ভাবনার চেয়ে বেশী।

আমাকে রুমে পৌঁছে দিয়ে মুনযিরের আব্বু হারাম শরীফে গেলেন। আমি যুহরের নামায পড়ে মুনযিরকে ঔষধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিলাম। এ সময়ে রুমের বাইরে বড়ভাইয়ের গলার আওয়াজ পেলাম। মুনযির ছুটে গেল। আমিও বেরিয়ে দেখা করলাম। মুনযির সালাম দিয়ে ভাঙ্গা গলায় ডাকলো, "মামা, মামা।"
তিনি আমাদের অসুস্থতার কথা রুমমেটদের কাছে ইতোমধ্যে শুনেছেন। বরাবরই বড়ভাই খুব সংবেদনশীল। উনাকে মন খারাপ করতে দেখে বললাম, "এইতো, ঔষধ খাচ্ছি। ইনশাল্লাহ ভাল হয়ে যাব।"
প্রেসক্রিপশান দেখলেন। বললেন, "ঔষধ ঠিক আছে। এদিক্কার আবহাওয়া এমনই। গতকাল থেকে আমারও জ্বর।"
ইহরামের ড্রেস পরা দেখে বললাম, "আপনি কখন পৌঁছালেন? তাওয়াফ করেছেন?"
বললেন -"ভোরে ফযরের সময় পৌঁছেছি। ফযর পড়ে তাওয়াফ করেছি। তবে ইহরাম খুলিনি। ইহরাম খুলবো হজ্জের পর, 'ইফরাদ' হজ্জের নিয়াত করেছি তো সেজন্য।"

রুমের বাইরের প্যাসেজটি খুবই সংকীর্ণ। লোকজন যাওয়া আসা করছিল বলে এখানে বেশী সময় দাঁড়ানো যাচ্ছিলনা। বড়ভাই আমাকে ভেতরে যেতে বলে পাশের গলিতে দারসিন্দি-৩ এ নিজ রুমে চলে গেলেন। একটু পর আবার এসে আমাকে ক্যানভর্তি জ্যুস আর ভাবীর পাঠানো বরফি দিলেন, নিয়মমত ঔষধ আর ভালভাবে খাওয়া দাওয়া

করতে বলে চলে গেলেন। মুনযিরের আব্বু নামায থেকে ফিরে আসলে বড়ভাই আসার কথা বললাম, উনিও শুকরিয়া করলেন। দুপুরে খাওয়ার পর মুনযিরকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মুনযিরের আব্বুর সাথে বড়ভাইকে দেখতে উনার রুমে গেলাম। কিন্তু উনাকে রুমে না পেয়ে ফিরে আসতে হল। বিকেলে 'আসরের পর বড়ভাই আসলে শুনলাম আমাদের relative পারভিন আপা আর ডাঃ আখতার ভাই হজ্জে এসেছেন। আমরা সবাই মিলে উনাদের হোটেলের রুমে গিয়ে দেখা করে আসলাম। আমাকে দেখে পারভিন আপা খুব খুশির প্রকাশ করলেন। নিজ হাতে চা-নাস্তা খাওয়ালেন।

বাসায় ফিরে দেখি কোহিনূর ভাবীর জ্বর। আমার আগেও দু'জন খালাম্মার জ্বর হলো। রুমের পরিবেশটাও স্বাস্থ্যকর ছিলনা। আর মক্কার মরু আবহাওয়ায় রাতে শীত দিনে বেশ গরম পড়ছিল যেটায় আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না তেমন। তার ওপর সারাদিন এসি চলায় শিশু ও বৃদ্ধসহ আবহাওয়াটা কারোর জন্যই সুসহনীয় ছিল না। জ্বর থেকে মোটামুটি রুমের কেউই আর বাদ রইল না। চারিদিকেও সবারই কমবেশী জ্বর-ঠান্ডা লেগে আছে। হারাম শরীফেও একই অবস্থা দেখলাম। আমি দু'দিন পর একটু সুস্থবোধ করলাম। বড়ভাইর জ্বরও কমেছে। মুনযিরের জ্বর কমল কিন্তু কফ, কাশি, বমি বেড়ে গেল। বড়ভাই পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে মুনযিরকে দেখালেন। তিনি বললেন, 'এটা মক্কার প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রভাব। যমযমের পানি খাওয়াতে থাকুন। আর কিছুর দরকার নেই।'

পরদিন দেখলাম যে যমযমের পানিও মুনযির পেটে রাখতে পারছেনা। ক্রমাগত বমি আর কাশিতে সে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। হজ্জের বাকী মাত্র তিনদিন। সুস্থিরভাবে হজ্জের কাজ করার জন্যই মুনযিরের সুস্থতা খুব জরুরী ছিল। ৫ জানুয়ারী 'আসরের নামাযের পর টাকশালের মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট জনাব আমিনুল ইসলাম আসেন। উনি হজ্জ গাইড হিসেবে প্রায়ই আসেন মক্কায়। পথঘাট চেনা তার। মুনযিরকে ভালভাবে চেক আপের ব্যবস্থা করার জন্য ওর আব্বুই উনাকে ফোন করেছিলেন। আমিনুল ইসলাম ভাই বললেন, "স্যার, দু' কিলোমিটার পথ, ভাবী হাঁটতে পারবেন তো?"
মুনযিরের আব্বু বললেন, "কী, পারবে না, ইনশাল্লাহ পারবে।"
আমি বললাম, "ইনশাল্লাহ"।

হারাম শরীফ পেরিয়ে আরো খানিকটা পথ হেঁটে মারওয়া পাহাড়ের থেকে বেশ দূরে শামিয়া এলাকায় একটি মেডিকেল সেন্টারে আমাদেরকে উনি নিয়ে গেলেন। ডাক্তার মুনযিরকে দেখলেন, ঔষধ একটু বদলে দিলেন। যখন বাসায় ফিরছি, দেখি হারাম শরীফে মাগরিবের আযান হচ্ছে। আমাকে বাসায় যেতে বলে মুনযিরের আব্বু হারাম শরীফে ঢুকলেন। কোলে অসুস্থ বাচ্চা থাকায় নামাযের জন্য হারামে ঢুকলাম না। যখন তখন ওর বমি আর কান্নাকাটিতে অন্য নামাযীদের বিঘ্ন ঘটার আশংকায়। মনকে কষ্ট করে মানিয়ে নিয়ে বাসার পথ ধরলাম আর দু'য়া করলাম আল্লাহপাক যেন এবার সুষ্ঠুভাবে হজ্জ সমাধা করার এবং পরবর্তীতে আবার এখানে আসার, নির্বিঘ্নে নামাযে

শামীল হবার তাওফীক দেন। যিনি আমাকে এতটা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে জীবনের ফরয হজ্জ সুসম্পন্ন করার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছেন, তিনি ইচ্ছে করলেই আমার ঐ রকম ঐকান্তিক চাওয়াগুলোও পূরণ করবেন। এ প্রত্যয় আমাকে আজও চলার পথে বড় বড় স্বপ্ন দেখায়।

আল'হামদুলিল্লাহ, পরদিন মুনযিরের কাশি একটু কমল। বমিও কমে আসল। যমযমের পানি আর ঔষধ চালিয়ে যেতে থাকলাম। হজ্জের পুরো সফরে এভাবে আল্লাহর অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি। সাহায্য আসেতো আল্লাহর পক্ষ থেকেই, আসে আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। আবার কষ্টের পরীক্ষাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, এখানেও উত্তরণের সাহায্য তিনিই করেন।

হজ্জের প্রস্তুতি

৬ জানুয়ারী জুম'য়ার দিন। আগামী দিনটি পার হলেই হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় এসে যাচ্ছে। ৭ জানুয়ারী সন্ধ্যার আগেই ব্যাগ গুছিয়ে নিতে হবে। ৮ জানুয়ারী থেকে মিনায় camping শুরু হবে।

মক্কা এখন আল্লাহর মেহমানে টইটম্বুর। পৃথিবীর সবচাইতে কর্মব্যস্ত শহর। হারাম শরীফে আজকের ভীড় অবর্ণনীয়। ১২.১৫তে জুম'য়ার নামায। ১১.৩০ এ হারাম শরীফে এসেও ভেতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য মনে হল। বাইরের চাতালেও লোকের ভিড়। চোখের পলকে সদর রাস্তা পর্যন্ত ব্লক হয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের চাপ এড়াতে আমরা মক্কা টাওয়ারে ঢুকে গেলাম। মহিলাদের ফ্লোরে দাঁড়াবার জায়গাও মিলল। নামায শেষ হতেই মুনযিরের আব্বু আমাকে মোবাইল ফোনে বললেন, নেমে আসতে। -"এক্ষুনি। নাহলে দু'ঘন্টার আগে বাসায় ফেরা সম্ভব নয়।"

Escalator আমাকে আধ মিনিটে গ্রাউন্ডে পৌঁছে দিল। হালকা স্রোতের মত মানুষ ফিরছে। নিচে নেমেই মুনযিরের আব্বুর সাথে দ্রুত হাঁটা দিলাম। কিছুদূর যাবার পর ভিড়ের চাপ একটু বেশী মনে হল। চট্ করে আমি মহিলাদের একটি গ্রুপের সঙ্গ নিলাম। আমার বামে মহিলাদের গ্রুপটি, ডানে মুনযিরকে কাঁধে নিয়ে ওর আব্বু। ভীড়ের চাপ থেকে যেভাবে তিনি আমাকে আগলে রেখেছিলেন, এখানে কিছু মহিলা সফরসঙ্গী ছাড়া একা বের হয় কী করে তা আমি ভাবতেও পারছিলাম না। সাত মিনিটের পথ পার হতে প্রায় ষাট মিনিট সময় লেগে গেল। মাথার উপর তীব্র রোদ অন্যদিকে ভীড়ের চাপ। ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েই উত্তীর্ণ হতে হল।

রুমে এসে দেখি আর কেউ তখনও পৌঁছেনি। আধঘন্টা পরে রুমের অন্য সবাই আসলে একসাথে দুপুরের খাবার খেলাম। আমরা বলাবলি করছিলাম যে, হজ্জের আগে আর এত ভীড় ঠেলে হারাম শরীফে নামাযের জন্য যাওয়া আমাদের মহিলাদের ঠিক হবেনা।

'আসরের নামায পড়ে রুমের সবাই একসাথে বসে হজ্জ বিষয়ক হাদীস নিয়ে আলোচনা করলাম। হজ্জের বিষয়ে তাদের প্রশ্নগুলো টুকে নিলাম। মহিলাদের পক্ষ থেকে অনুরোধে প্রশ্নোত্তরের জন্য মুনযিরের আব্বু সম্মত হলেন। বাদ ইশা, এক রুমের মাঝে

পর্দা টানিয়ে দুই রুমের পুরুষ ও মহিলারা সবাই বসলেন। প্রশ্নের মাধ্যমে অস্পষ্টতাগুলো দূর করে নেয়ার পর মনে হলো হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি সবাই বেশ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথেই নিচ্ছেন।

ঐতিহাসিক মিনা প্রান্তরে

৭যিলহজ্জ, সকাল থেকে রুমের সবাই পালা করে ধোয়াধুয়ি এবং গোসল সেরে নিলাম। বিকেলের মধ্যেই আমাদের সবার ইহরাম-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। এক নজরে হজ্জের ফরয-ওয়াজিবগুলো বই দেখে ঝালিয়ে নিলাম। শরীর ও মনের পবিত্র অনুভূতি নিয়ে সবাই এখন অপেক্ষায়। বিকেলে ব্যাগ গুছালাম। আগামী দিন ৮যিলহজ্জ, জানুয়ারী ২০০৬ এর ৮ থেকে ১২ পর্যন্ত পাঁচদিন তাঁবুবাসের জন্য নিজের এবং মুনযিরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বোঝা নেহায়েত কম হলনা। আমাদের বলা হয়েছিল, ব্যাগটি যেন পিঠে বা কাঁধে বহনযোগ্য হয়। যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছি তবু আমারটা বেশ বড় হল। মুনযিরের আব্বু ক্যানভর্তি যমযমের পানি সংগ্রহ করে আনলেন, সঙ্গে নেয়ার জন্য। দোকান থেকে শুকনো ফল, খেজুর, মুনযিরের সেরিয়াল, দুধ কিনলেন। লাগেজ টেনে নেয়ার জন্য একটি চার চাকার ট্রলি(অ্যারাবিয়া) কিনে আনলেন। সব ব্যাগ ব্যাগেজ অ্যারাবিয়াতে তুলে পুশ করলে ক্যারি করার ঝামেলা থাকবেনা।

সন্ধ্যায় বড়ভাই আসলেন। সাথে অনেক ফল, জ্যুস, লাবান [প্রিজার্ভ করা লিকুইড চিনিহীন দই]। বললেন, "মিনাতে টি-স্টল ছাড়া দোকানপাট তেমনটা নেই। এগুলো হাতে রাখা দরকার।"

রাত্রি বারটার পর যে কোন সময় ডাক আসলেই যেন নেমে আসা যায়, সেভাবে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। শিয়রের পাশে তল্পিতল্পা বেঁধে রেখে রাতে সবাই early bed করলাম। রাত প্রায় তিনটের দিকে দরজায় করাঘাত শুনে ঘুম ভাঙ্গল। শুনলাম মুনযিরের আব্বুর ডাক, "ইহরাম বেঁধে সোজা নেমে এস। সবাইকে নামতে বল।"
ডাকাডাকি শুনে রুমের সবাই জেগে উঠল। পালাক্রমে উযু সেরে দু'রাকাত নামায পড়ে সবাই একসাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। সমস্বরে দু'য়া পড়লাম- "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান"।
দু'য়া নিজ ভাষায়ও করা যায়: "হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করার সংকল্প করছি। আমার জন্য একাজ সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা কবুল করুন।" উমরাহ এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধার নিয়ম একই, হজ্জের বেলায় শুধু"হাজ্জান "শব্দটি যুক্ত হয়।
মুনযিরকে ইহরামের ড্রেস পরিয়ে দিলাম। অ্যারাবিয়া টেনে নিয়ে রুমের বাইরে গিয়ে দেখি বড়ভাই এসেছেন। আমাকে বললেন, "তুমি মুনযিরকে নিয়ে শোয়েব ভাইয়ের সাথে ধীরে সুস্থে আস। বাচ্চা নিয়ে চলাফেরায় তাড়াহুড়া না করাই ভাল।"

আমার হাত থেকে অ্যারাবিয়া নিয়ে উনি চলে গেলেন বাসের খোঁজ নিতে। মুনযিরের আব্বু ইহরামের পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে আসলে মুনযিরকে কোলে দিলাম। মুনযিরের পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধলেন ওর আব্বু। মুনযির তখনও গভীর ঘুমে মগ্ন। সবাই যার যার মাহরিমের সাথে রওয়ানা হয়েছেন। আমরাও বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম।

আজকে মক্কার চিত্র একেবারেই অন্যরকম। রাত বারটার পর থেকে দুপুর বারটার মধ্যে হজ্জে আগত প্রায় পঁচিশ লক্ষ মানুষ পালাক্রমে গিয়ে হাজির হবে camping-এ, মিনায়। বাসের পর বাস, নিমিষে ভর্তি হয়ে মক্কা ছেড়ে মিনা অভিমুখে যাচ্ছে। আরেকটি আসছে, সাথে সাথে ভরে চলে যাচ্ছে। "লাব্বাইক" ধ্বনিত হচ্ছে বাসের ভেতর। আবার শব্দটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলে যাচ্ছে। এভাবে বেশ ক'টি বাস চলে গেল, আমরা উঠতে পারলামনা। ভাইদের আপ্রাণ চেষ্টায় প্রায় আধঘন্টা পর বাসে উঠার সুযোগ মিলল। মক্কা থেকে মিনার দূরত্ব ৭/৮কিলোমিটার। যানজট মাড়িয়ে মিনায় পৌঁছাতে আমাদের প্রায় ঘন্টা লেগে গেল। বাস থামলো তাঁবুর দোরগোড়ায়। তখন ভোর পাঁচটা। ফযরের আযান হচ্ছিল। বিশাল তাঁবুতে আমাদের অবস্থানস্থল বুঝে নিয়ে তাঁবুর ফযরের জামায়াতে শামীল হলাম।

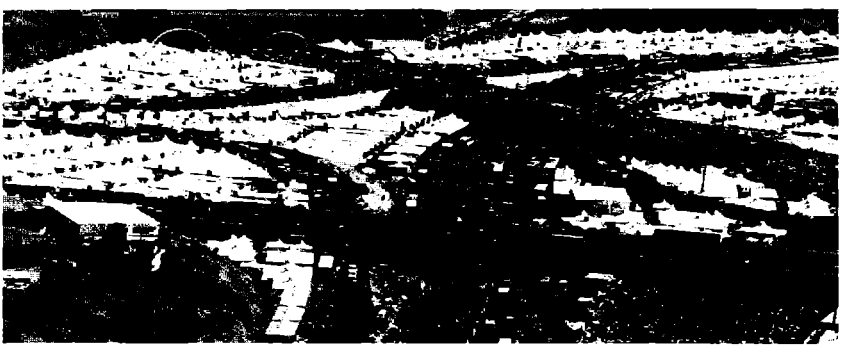

তাঁবুর শহর মিনা। যেন এক জিহাদের ময়দান।

আজ ৮যিলহজ্জ, হজ্জের কার্যক্রম শুরু করার দিন। এ দিনকে 'তারউইয়া'র দিন বলে, যার অর্থ পানি সংগ্রহের দিন। তখন হজ্জের দিনগুলোর জন্য মিনার তাঁবুতে প্রচুর পানি সংগ্রহ করে রাখা হত, যাতে বাকী পাঁচদিন চলতে পারে। হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত সকলে আজ মিনায় সমবেত হবে। আজ যুহর থেকে ৯ যিলহজ্জ ফযর পর্যন্ত এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় 'কসর' করে আদায় করা হজ্জের একটি সুন্নাত। হজ্জের এ সফরে নামায কসর করে আদায়ের এ ব্যবস্থা ইসলামের মানবিকতা ও সার্বজনীনতার নিদর্শন।

হারিসা ইবনে ওয়াহব খুযায়ী (রাঃ) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী (সঃ) মিনাতে আমাদের দু'রাকাত নামায পড়ান। এসময় আমরা সংখ্যায় এত বেশী ছিলাম, যা আগে কখনো ছিলামনা। সেই সাথে ছিলাম নিরাপদ ও নিঃশংক।" [সহীহ বুখারীঃ১৫৪৪]
আগামী দিনটি ৯ যিলহজ্জ। এ দিনটি আরাফায় এবং রাতটি মুযদালিফায় যাপনের পর, ১০ যিলহজ্জ সকালে মিনায় ফিরে আসতে হবে। এদিনে বড় জামরায়৭টি কংকর মেরে পশু কুরবানী করার পর চুল কেটে প্রাথমিক হালাল হতে হয়। তাওয়াফে যিয়ারত করার পর সম্পূর্ণ হালাল হওয়া যায়। তাঁবুতে ফযরের নামাযের পর সকালের নাস্তা পরিবেশিত হল। আজকের সারাদিনের প্রোগ্রাম জানিয়ে দেয়া হল। পুরুষ ও মহিলাদের পাশাপাশি দু'টো বিশাল তাঁবুর মাঝখানে পায়ে চলা পথ। পুরুষদের তাঁবুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত হবে। মহিলাদের তাঁবুতে সাউন্ড বক্স দেয়া আছে। মহিলারা ইচ্ছে করলে নিজ জায়গা থেকে জামায়াতে শামীল হতে পারবেন। সকালে দু'ঘন্টা, বাদ মাগরিব ঘন্টাখানেক হজ্জ প্রশিক্ষন ও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মিনায় অবসর সময় পেয়ে গল্প করে বা শুয়ে বসে সময় কাটিয়ে দেয়া শোভনীয় নয়। পবিত্র ও সম্মানিত একটি স্থান মিনা। কুরআনে বর্ণিত সম্মানিত নবী ইবরাহীম(আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ)এর জীবন-ইতিহাসের সংগে মিনার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মিনায় কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরীর এক সুন্দর সুযোগ রয়েছে। বিদায় হজ্জে নবী(সঃ) এর মিনায় অবস্থানকালে, আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে পবিত্র কুরআনের **সূরা নাসর** নাযিল হয়। নাযিলের স্থানে বসে সূরাটির অধ্যয়ন উপলব্ধিতে ভিন্ন রকম সাড়া জাগায়। হারাম শরীফে বসে মক্কী সূরা আর মাসজিদে নববীতে মাদানী সূরার গভীর অধ্যয়নেও এক অভূতপূর্ব অনুভূতি দেখেছি মনকে তোলপাড় করতে। অর্থ না বুঝে কেবল তিলাওয়াতে এ অনুভূতি আসে না।

মিনা ঃ
আল্লাহর অতিথিরা মিনার তাঁবুতে পাঁচদিন অবস্থান করে হজ্জের ফরজ-ওয়াজিবগুলো সম্পন্নে তৎপর হন।

আল্লাহর অতিথিরা প্রায় পাঁচদিন এখানে তাঁবুতে অবস্থান করে হজ্জের কাজগুলো সম্মিলিতভাবে সমাধা করেন। ফলে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার উত্তম সুযোগ মিলে। পারস্পরিক সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন, স্যাকরিফাইস, শেয়ার করার মনোভাব, অপরকে অগ্রাধিকার দান, সেবা, অন্যের সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলী চর্চার বিপুল সুযোগ এখানে তৈরী হয়ে যায়। এখানে

উপস্থিত প্রায় সবাই আল্লাহর জন্যই সমবেত হচ্ছে। ফলে সবারই মাঝে ইসলামের মৌলিক আমল আখলাক অনুসরণের একটা ন্যূনতম প্রচেষ্টা থাকে। তাই যেসব ভাই বোনেরা ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেন, কুরআনের জ্ঞান রাখেন অথবা দ্বীন বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন–অন্ততঃ এটুকু বুঝেন, মিনায় তাদের কাজ হল অন্যদের দাওয়াত প্রদান করা এবং দ্বীনের অনুসরণে সচেতন করে তোলা। কারণ, এমন অনেকেই এখানে আসেন, যাদের আর্থিক সঙ্গতি হয়েছে কিন্তু দ্বীনকে বাস্তবায়ন করার চেতনা জাগ্রত হয়নি এখনও। সুযোগ করে তাঁবুর সাথীদের সাথে নিয়ে কুরআনের আলোচনা এবং দ্বীনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করা যায়। দ্বীনকে জীবনের সর্বত্র মেনে চলার অপরিহার্যতা তুলে ধরা যায়।

মিনা দু'য়া কবুলের একটি স্থান। উঠতে, বসতে, শুতে–সকল অবস্থায় মাসনুন দু'য়া পড়ে, জিহবাকে যিক্‌র ও দু'য়ায় সিক্ত রেখে, কুরআন পাঠ করে এবং আল্লাহর কাছে চাইবার আবেদন পেশ করে মিনার এ পবিত্র সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। তালবিয়া উচ্চারণ তো ইহরাম বাঁধার পর থেকে চলবেই। সেই সাথে ৯ যিলহজ্জ ফযরের পর হতে তাকবীর পাঠ যোগ হবে।

প্রথমবারে মদিনা থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা আসার আনন্দটা যেরকম ছিল, এবার মিনা আসার বেলায় অনুভূতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সেটা ছিল আনন্দদায়ক সূচনা, এখন হজ্জের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান সমূহ প্রত্যক্ষ করা, সেগুলোর কল্যাণ ও নিদর্শনসমূহ উপলব্ধি এবং আত্মস্থ করার চেষ্টায় এক দায়িত্বশীল একাগ্রতা কাজ করছে হৃদয়ের ভেতর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শত কোটি মানুষের ভেতর থেকে পঁচিশ লক্ষ লোককে তাঁর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য এবারে বাছাই করলেন। সেই সিলেক্টেড ব্যক্তিদের একজন আমি, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় মন টইটম্বুর হয়ে উঠে ।

সকালের নাস্তার পর মুনযিরের আব্বুর সাথে বাইরে বের হলাম। পরিবেশ চেনার জন্য, জানার জন্য চারিদিকে হাঁটলাম। তাঁবুর অবস্থান, লোকেশান, নাম্বার, খাবার পানি, বাথরুমের ব্যবস্থাপনা––সবকিছু ভালভাবে দেখে এলাম। সকালের ফুটফুটে আলোয় ঝলোমলো চারিদিক। উঁচু উঁচু পাহাড়ের বেষ্টনীতে ঘেরা মিনার উন্মুক্ত প্রান্তর। এখানে আকাশ যেন অনেক বিশাল। পাহাড়গুলো বৈচিত্রে ভরপুর। কোনটা উঁচু, কোনটা নিচু, কোনটা ধূসর, কোনটা লালচে আবার কোনটা কালো। আল্লাহর সৈনিকদের সমবেত হবার জন্য অতুলনীয় সৌন্দর্যের উপত্যকায় নির্মিত তাঁবুর সারি। চমৎকার ব্যবস্থাপনা। পাশাপাশি দু'সারি তাঁবুর মধ্যখানে পায়ে চলা পথ। কয়েক সারি তাঁবুর পর বড় হাইওয়ে। স্থায়ীভাবে নির্মিত তাঁবুগুলোর কয়েকটির পর পর গুচ্ছাকারে ১০/১৫টি টয়লেট। পাশে উযুর ব্যবস্থা। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সব আলাদাভাবে দেয়ালে ঘেরা। তারউইয়ার দিনে দূর থেকে পানি বয়ে আনার কষ্ট এখন আর করতে হয়না। পাহাড়ের ঢালে হাসপাতাল, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, আইন-শৃংখলা বাহিনীর স্থাপনা ইত্যাদি রয়েছে। মিনায় রয়েছে মাসজিদে খায়িফ। এটি এমন এক ঐতিহাসিক

মাসজিদ, "যাতে ৭০জন নবী-রাসূল নামায আদায় করেছেন।"[বুখারীঃ ৪৬৬৩-পবিত্র মক্কার ইতিহাসঃ দারুসসালাম]

মিনায় অতুলনীয় সৌন্দর্যের উপত্যকায় সারি সারি তাঁবু, ডানদিকে মাসজিদে খায়িফ এর একাংশ।

মুনযির মক্কার সীমিত পরিসর থেকে মিনার উন্মুক্ত পরিবেশে এসে আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। তাঁবুর ভেতরটাও বেশ বড় । দু/তিন'শ লোকের স্থান সংকুলান হয় অনায়াসে। মুক্ত বাতাসে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে ইচ্ছেমত দৌড়-ঝাঁপ আর খেলা-ধুলায় মহাব্যস্ত হয়ে পড়ায় মুনযিরকে মনে হচ্ছিল পূর্ন সুস্থ। অথচ তখনও এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ চলছে ওর।

তাঁবুতে অনেক চেনাজন পেলাম। নতুন পরিচয় হল অনেকের সাথে। বড় আপার ননদ পারভিন আপাকে তাঁবুতে পেলাম। খুলনা এবং রাজশাহীর দু'জন দ্বীনিবোনকে পেলাম। কোহিনূর ভাবীসহ ঢাকা-মদীনার সহযাত্রী বোনেরা তো ছিলেনই। বড়ভাইর সাথে উনার শিক্ষক পিজি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান, সার্জারী অনুষদের ডীন জনাব ডাঃ সালেহ উদ্দিন সস্ত্রীক এসেছেন। পরিচয় হল সালেহ খালাম্মার সাথে। খালাম্মা মুনযিরকে 'নানু' ডেকে আদর করছিলেন। মুনযির তো আগে থেকেই বয়স অনুযায়ী আপা, ভাইয়া, নানু, দাদু, চাচী ডেকে অনেককে আপন করেছিল। ঔষধ খেতে দারুন আপত্তি ওর। সালেহ নানুর নাক টিপে ঔষধ খাওয়ানোর কৌশলটা বেশ কাজে লাগল। এরপর প্রতিবেলা ঔষধ খাওয়াবার সময় হলেই মুনযির ডেকেছে 'নানু','নানু'। নানুও মুনযিরকে ঔষধ খেতে সাহায্য করেছেন পরম যত্নে।

সকালের প্রোগ্রামে কাফেলা পরিচালক সালেহ আকবর ভাইয়ের অনুরোধে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুনযিরের আব্বু দারসে কুরআন পেশ করেন। বিদায় হজ্জে নাযিলকৃত কুরআনের সর্বশেষ আয়াত সূরা মায়িদার ৩নং আয়াতটির আলোচনায় ইসলামের সার্বজনীনতা, চিরন্তনতা এবং পরিপূর্নতার দিকটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। সন্ধ্যার প্রোগ্রামে রিয়াদ ও মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক, "হজ্জের তাৎপর্য" এবং "রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবনে হজ্জ" বিষয়ে আলোচনা রাখেন। প্রশ্নের জবাব দেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর অধ্যাপক জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম।

পুরুষদের তাঁবুতে আলোচনা হয়েছে মহিলারা মাইক্রোফোনে শুনেছেন, লিখিত প্রশ্ন করেছেন। বাকী সময় নামায খাওয়া ও বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে মহিলাদের সাথে ছোট ছোট গ্রুপে দ্বীনের নানা বিষয়ে মত বিনিময় হয়েছে।

রাতে খাওয়ার পর উন্মুক্ত আকাশের নিচে দল বেঁধে হাঁটলাম। বিকেলে মুনযিরের আব্বুর সাথে হেঁটে গিয়ে জামরায় যাবার পথ পর্যন্ত দেখে এসেছি। নিরাপত্তা বাহিনীর হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছে দিনরাত। ছোট-বড় টিস্টল থেকে আওয়াজ আসছে–'শাই','শাই'('চা','চা')। আকাশ জুড়ে রঙ-বেরঙের তারার ঝিকিমিকি। আল্লাহপাকের সৃজনশৈলীর এক নিপুণ পরিচয় এঁকে জেগে আছে মিনার আকাশ। আকাশের একপ্রান্তে একফালি চাঁদ। চাঁদটি ৯ যিলহজ্জের। মিনা আজ আনন্দে টইটম্বুর এক তাঁবুর শহর। আগামীকালের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শুরু হবে আরাফার দিন–মূল হজ্জের দিন। যে দিনটির ক্ষমা ও মুক্তির প্রত্যাশায় জীবনের সব পিছুটান ভুলে ব্যাকুল প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন আল্লাহর লাখ লাখ অতিথি। চারিদিকে ঈদের আনন্দ। আসন্ন দিনটি শ্রম ঝরাবার দিন। পরবর্তী রাতটি মুযদালিফার পাথুরে উপত্যকায় খোলা আকাশের নিচে নিদ্রা যাপনের রাত। বিশ্রাম প্রয়োজন, ঘড়ির কাঁটা দশ ছুঁতেই ঘুমাবার প্রস্তুতি নিলাম।

আরাফাহ ঃ ক্ষমা ও মুক্তির ময়দান

অনেক ভোরে ফযরের আযান শুনে ঘুম ভাঙো। নামাযের পর নাস্তা সেরে আমরা রেডি হয়ে রইলাম। মিনা থেকে আরাফার দূরত্ব ১৪ কিলোমিটারের মত। মুযদালিফার জন্য হালকা বিছানাপত্রও সাথে নিতে হল। খাওয়ার পানি, জ্যুস, শুকনো খাবার, সে সঙ্গে বাচ্চার জিনিসপত্র সব মিলে ব্যাগ ভারী হয়ে উঠল। বড়ভাই আর মুনযিরের আব্বুর হাতে সব বোঝা ছেড়ে দিয়ে আমার কোলে মুনযিরকে নিলাম।

পরিকল্পিত ভাবেই ওর জন্য পুশ চেয়ারটা আনা হয়নি। শুনেছিলাম, বাচ্চা কোন কোন সময় পুশ চেয়ারে বসতে নাও চাইতে পারে। তখন সেটা একটা বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম সেরকমই। অনেক সময় ধরে বেল্ট দিয়ে পুশ চেয়ারে আটকে রাখায় বাচ্চা একসময় একঘেঁয়ে ও বিরক্ত হয়ে কান্না-কাটি করতে থাকে ক্রমাগত। বিষয়টি শিশু বা অভিভাবক কারও জন্যই সুখকর নয়। মুনযির যখন যেখানে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে চেয়েছে, হেঁটেছে। যখন ক্লান্তিবোধ করেছে বা ঘুম পেয়েছে, তখনই কেবল ওকে কোলে বা বেবী ক্যারিয়ারে ঝুলিয়ে নিয়েছি। এতে আমার নিজের কিছুটা কষ্ট হলেও শিশুর জন্য সফরটা হয়েছিল শান্তিদায়ক। শিশুর স্বস্তি ও শান্তি লাভ করাটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য এবং অনুগ্রহ ছিল।

মিনার প্রশস্ত রাস্তায় জনসমুদ্র ভেঙে পড়েছে। জোয়ারের মত নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলে নেমে এসেছে। রাস্তায় যেদিকে তাকাই আল্লাহর অতিথিদের আরাফা অভিমুখে ছুটে চলার এক আনন্দোজ্জ্বল অভিব্যক্তি। কেউ বাসে, কেউ পদব্রজে.....রওয়ানা

হয়েছেন আরাফার পথে। চলৎশক্তিহীন কিছু মানুষ চোখে পড়ল, হুইল চেয়ারে করে যাচ্ছেন। মনে হল জীবনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ফরযটি পরে করার জন্য রেখে দিয়ে কিছু মানুষ নিজকে কতই না কষ্টে নিমজ্জিত করে ফেলেন।

তাঁবুর কাছেই রাস্তায় আমরা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সকাল আটটা থেকে। এখানে বাস এসে থামার সাথে সাথে ভর্তি হয়ে জলদি ছেড়ে যাচ্ছে । এত ভীড় ডিঙিয়ে আমার মত অনেক মহিলাই বাসে উঠতে পারছেন না। কোন কোন বাস আগে থেকেই ভরে আসছে। অনেকে বাসে ঝুলেই রওয়ানা হয়ে গেলেন। ১৪ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া কঠিন এবং অপ্রয়োজনীয়। এখানে দেখা হল ঢাকার গুলশানের অতি পরিচিত বোন রাইসা আপার সাথে। উনিও স্বামী আর ছেলে সহ আমার মত ভীড় কমার অপেক্ষায়। আমাদের সংগী পুরুষেরা একা হলে যে কোনভাবে চলে যেতে পারতেন। ডাঃ সালেহ স্যার ও খালাম্মাকে সুযোগ বুঝে এক বাসে তুলে দেয়া গেল। পারভীন আপাও আখতার ভাই সহ আরেক বাসে উঠে চলে গেলেন। চেনা মহলের কোহিনূর ভাবীরা আর রাইসা আপারা ছাড়া আমাদের সাথে আর কেউ নেই। সালেহ আকবর ভাই বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন, "চিন্তার কিছু নেই, ইনশাআল্লাহ সময়মতই আরাফায় পৌঁছে যাবেন।"

ঘন্টাখানিক দাঁড়িয়ে, কিছুসময় টি-স্টলের টুলের উপর বসে ধৈর্য আর প্রতীক্ষার পরীক্ষা দিতে থাকলাম। অবশেষে যখন বাসে উঠি, তখন বেলা এগারোটা। এখানের পরীক্ষা আরও কঠিন। তিন-চারটি সিট মাত্র খালি ছিল। কিছু সময় বসে, কিছুসময় দাঁড়িয়ে, সিট শেয়ার দিয়ে সামনে চলতে থাকলাম। মিনা থেকে বের হয়ে বাস ড্রাইভার আরাফার পথ হারিয়ে ফেলল। এখানে জালের মত ছড়ানো রাস্তা। আরাফার পথ হারিয়ে বাস ফিরে ফিরে একই রাস্তায় ঘুরছিল। যাত্রীরা বুঝতে পেরে মুয়াল্লিমকে ফোন করলে তিনি রাস্তা বাতলে দিলেন।

আরাফার কাছাকাছি এসে দেখি পায়দল হাজীদের ভীড়ে রাস্তা প্রায় ব্লক। যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পায়দল সফর করার কোন বিশেষ গুরুত্ব কোন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়নি। কিছু মানুষ পায়ে হেঁটে হজ্জ করাকে ভালো মনে করেন, কিন্তু কুরআন-হাদীসে এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি। স্বয়ং রাসূল(সঃ) উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে হজ্জ করেছেন।

"আরাফাতের ময়দানে নবী (সঃ) একটি উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন।"
[সহীহ বুখারীঃ ১৫৪৯]
"আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত নবী (সঃ) এর সওয়ারীর পেছনে বসেছিলেন উসামা বিন যায়িদ(রাঃ)। [সহীহ বুখারীঃ ১৫৭২]"
"মুযদালিফা থেকে যাত্রাকালে নবী (সঃ) ফযল বিন আব্বাস (রাঃ) কে তাঁর সওয়ারীর পিঠে বসিয়ে নিলেন।" [সহীহ বুখারীঃ ১৫৭১]

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত, নবী করিম(সঃ) এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের উপর ভর করে হেঁটে যেতে দেখে বললেন, "তার কি হয়েছে?" তারা বলল, "তিনি পায়ে হেটে হজ্জ করার মানত করেছেন।" রাসূল(সঃ) বললেন, লোকটি নিজেকে কষ্ট দিক আল্লাহ তা'য়ালার এর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তিনি তাকে সওয়ার হয়ে চলার জন্য আদেশ করেন। [সহীহ বুখারীঃ ৩য় খন্ড, ১৭৪৩]

আর্থিক সমস্যা বা যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে কেউ হেঁটে যেতে বাধ্য হলে নিশ্চয়ই আল্লাহপাক তাকে এরজন্য পুরস্কৃত করবেন কিন্তু, ইচ্ছাকৃতভাবে হেঁটে যাওয়াতে বেশী সওয়াব মনে করার কোন কারণ নেই। আল্লাহপাক বলেন,

"লোকদেরকে হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দাও। তারা প্রত্যেকে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং শীর্ণকায় [দীর্ঘ ভ্রমনের ফলে ক্লান্ত ও শীর্ণ] উটের পিঠে চড়ে আসবে, যাতে এখানে তাদের জন্য যেসব কল্যাণ রাখা আছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে।"[সূরা আল-হজ্জঃ ২৭- ২৮]

আয়াতটি থেকে পায়ে হাঁটা বা বাহনে চড়া কোনটিরই বিশেষ গুরুত্ব ফুটে উঠেনা। বরং হজ্জের গুরুত্ব ও আহবান ফুটে উঠে। যে যেভাবে পারে নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ইবাদাতে সেভাবেই যেন সে ছুটে আসে। কোন আমল আল্লাহর পছন্দনীয় হওয়ার জন্য অধিক কষ্ট করা জরুরী নয়। বরং খুলুসিয়াত ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা জরুরী। শ্রমের পরিমানের ভিত্তিতে সওয়াব নয় বরং নিষ্ঠা কত গভীর ছিল এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ যথাযথ অনুসৃত হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে সওয়াব বা পুরস্কার দেয়ার কথা বলা আছে। রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর পশু টেনে নিতে দেখে বলেন, "আরোহণ করে নিয়ে যাও।" সে বলল, "এ তো কুরবানীর পশু।" নবী (সাঃ) বলেন তাতে কী? তুমি আরোহণ কর।" একথা তিনবার বলেন **[সহীহ আল বুখারী ঃ ১৫৭৩ ও ১৫৭৪ নং হাদীস; বর্ননা কারী আবু হুরাইরা (রাঃ) এবং আনাস (রাঃ)]**

পদাতিকদের সুযোগ দিতে গিয়ে বাস আগাচ্ছে খুবই ধীরে। সামনেও গাড়ীর বহর। খোলা পাহাড়ী উপত্যকায় দুপুরের রোদ খাঁ খাঁ করছে। শীতকাল হলে কী হবে, বাসের ভেতরে গরমে অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা। কেউ কেউ খুবই ক্লান্ত। বৃদ্ধ বয়েসীরা রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে আনা ক্যানভর্তি পানি, জ্যুস, ফলমূল প্রায় শেষের পথে। এখানে প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সম্মানিত মেহমান। এক টুকরো ফল, একটু পানি বা জ্যুস পাশের দু-চার জনের সাথে শেয়ার না করে খেতে ইচ্ছে করেনা। চেনা হোক বা অচেনা। শিশুর জরুরী খাবারটুকু ছাড়া সব সাবাড় হলে ফুডব্যাগটা বেশ হালকা হয়ে গেল। বাসের ভেতরে আমার সাথে মুনযিরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ বসে থেকে একসময় আমার কোলে ঘুমিয়ে গেল। কিছুসময় পর ঘুম ভাঙ্গল এবং কান্না শুরু করল। কষ্ট যতই হোক, আরাফা আল্লাহপাকের ক্ষমা ও রহমতের ময়দান। কাজেই বিনয় ও বিনম্র চিত্তে আরাফায় প্রবেশ করা উচিৎ। সেকথা স্মরণ করে, ধৈর্যের এ পরীক্ষায় উত্তরণের সাহায্য আল্লাহর কাছেই চাইতে থাকলাম।

মক্কা-আরাফার পথ ঃ আল্লাহর অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত।

তখন বেলা দুটো। **ARAFAT STARTS HERE** লেখা বিশাল সাইনবোর্ড গোচরীভূত হতেই তাকবীর ও তালবিয়ার আওয়াজ উচ্চকিত হতে থাকল। ধুলি-ধূসরিত, ঘর্মাক্ত, পিপাসার্ত এবং ক্লান্ত অতিথিরা কষ্ট এবং চেষ্টার চূড়ান্তে পৌঁছে অবশেষে পথ খুঁজে পাবার আনন্দে, পেছনের সব কষ্ট যেন নিমিষেই ভুলে গেলেন। বাস আরো আধঘন্টা থেমে থেমে চলার পর আর এগুতে পারছেনা। ট্রাফিক পুলিশের আধা আরবী-ইংরেজী মেশানো কথা থেকে বুঝা গেল, বাংলাদেশের ক্যাম্প এখনো দু'কিলোমিটার দূরে। বাসে বসে থাকলে যে কত সময় লাগবে, বলা কঠিন। তাঁবুতে মুয়াল্লিম পরিবেশিত খাবার ও বিশ্রামের সুযোগ হয়। যুহরের ওয়াক্তে আরাফায় যুহর-'আসর একত্রে কসর করে পড়া ওয়াজিব। এটা আদায় করতে চাইলে বাসে বসে সময় কাটিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। কারণ এখানে তিনটায় 'আসরের সময় হয়।

আরাফার সীমার বাহিরে অবস্থান করলে হজ্জের ফরয আদায় হবেনা। আমরা সীমার ভেতরে ঢুকে গিয়েছি। কাজেই, সময়ের স্রোতকে আর বয়ে যেতে দিতে আমাদের মন মানছেনা। কেউ কেউ তাঁবুতে পৌঁছার আগে বাস থেকে নামতে রাজী হচ্ছেন না। বড়ভাই আর মুনযিরের আব্বু বাসের সহযাত্রীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, "যুহরের শেষ সময়ে এসে, তাঁবুতে পৌঁছার অপেক্ষায় থেকে, নামায এবং উকুফের দু'য়া–দুয়েরই সময় বিলম্বিত করায় কোন ফায়দা নেই। কেননা আমরা আরাফায় উকুফের উদ্দেশ্যে এসেছি, তাঁবু খোঁজার জন্য নয়।" যে ক'জন একমত হলেন তাদেরকে সহ আমরা নেমে গেলাম। স্থানটি ছিল এমন এক দেশের তাঁবুর পাশে, যাদের ভাষার একবিন্দুও আমাদের কারো বোধগম্য হলনা, এমনকি তাদের মুখের স্বাভবিক উচ্চারণে তাদের দেশের নামটা পর্যন্ত দূর্বোধ্য ঠেকল। কোন ধরণের পরিচয় বা কম্যুনিকেশান ছাড়া তাদের তাঁবুতে আমাদের প্রবেশ করা সৌজন্যের পরিপন্থী হবে দেখে ক্যাম্পের পাশেই আমরা অবস্থান নিলাম। একটু খুঁজতেই টয়লেট পাওয়া গেল। জলদি উযু করে এলাম। ক্যাম্পের পাশে নিমগাছের নিচে এক আযান ও দুই ইকামাতে জামায়াতের সাথে যুহর-'আসর কসর করে আদায় করলাম আমরা।

বড়ভাই কয়েক বক্স দুম্বার বিরিয়ানি কিনে আনলেন। আমরা তড়িঘড়ি ক্ষুধা মিটালাম। সূর্য গড়িয়ে চলছে, আরাফাতে উকুফের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আরাফাতে উকুফের কাজই হলো দু'য়া। ময়দানে অনেক অতিথিরা ইতোমধ্যেই দু'য়ার ইবাদাতে একাত্ম হয়ে গেছেন। নিজকে নিজের রবের একান্তে সমর্পিত করে জীবনের সকল চাওয়া আর স্বপ্ন-সাধ তাঁরই সমীপে পেশ করতে থাকার যে আকুতি মিনতি আর অশ্রুপাতের অনর্গল ধারা আমি আরাফায় প্রত্যক্ষ করেছি, তার উপমা কেবল আরাফার ময়দান এবং দিনটি নিজেই।

আল্লাহর কাছে চাইবার স্বপ্ন-পূরণের দিন ঃ

আরাফার দিন।

দু'য়ায় মগ্ন হবার জন্য একটু আড়াল খুঁজে বের করলাম। দুই সারি থেমে থাকা গাড়ীর বহরের মধ্যখানের ফাঁকা জায়গায় চাদর বিছিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসলাম। ইতিমধ্যে মুনযিরকে গোসল করিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। মুনযিরের জন্য ওর বড়মামা বিরাট এক কাগজের কার্টন যোগাড় করলেন। কার্টনের ভেতরে মুনযিরের সব খেলনা সাজিয়ে দিতেই এক সুন্দর খেলাঘর হয়ে গেল। খেলাঘরের ভেতরে মুনযিরকে বসিয়ে রাখলাম। আলহামদুলিল্লাহ। টানা দু'ঘন্টা সময় সে খুব আনন্দের সাথেই এনজয় করল, যেটা অন্য কখনো কোন জায়গাতেই সম্ভব হয়নি। মাঝে মাঝে আবার দু'য়ার ভঙ্গিতে হাত তুলেছে। উকুফে আরাফায় গভীর অভিনিবেশ [Concentration] সৃষ্টির প্রয়োজনে মুনযিরের এ রকম সুস্থিরতা খুবই জরুরী ছিল। যেটা আমি আল্লাহর কাছে বারবার, দু'য়া কবুলের জায়গাগুলোতে বিশেষভাবে চেয়েছি। এখানে যখন আমার চাওয়ার সাথে আল্লাহর দান যোগ হল, তখন দেখলাম যে তিনি এতই সম্মানিত সত্তা যিনি তার বান্দার মিনতি রাখেন আর কল্যাণকর কাজে তাঁর বান্দার জন্য সাহায্যের দ্বার খুলে দেন। এর পরের ঘটনাটুকু দারুন মজার। উকুফ শেষ করে উঠে লক্ষ্য করলাম, মুনযিরের খেলাঘরের ছড়ানো খেলনার আশে পাশে জ্যুসের প্যাকেট, বোতল ভর্তি মিনারেল ওয়াটার, ছোট খেজুরের বক্স, আপেল, নাশপাতি, সুইটলাইম, মাল্টা জমে স্তুপ হয়ে আছে। মুনযির সেসব ধরে খেলছে, দেখছে আর বলছে, 'মানা'! 'মানা'! --মজা! মজা! কে, কখন এসব গিফট করেছে, চোখেও পড়েনি যে অন্ততঃ ধন্যবাদ জানাব।

রাসূল(সঃ) আরাফাতে হাত তুলে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কিবলামূখী দাঁড়িয়ে দু'য়া করেছেন। বড়ভাই সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। দু'য়া করার স্বপ্নপূরণ হল এ দিন। আম্মা-আব্বা,স্বামী-সন্তান, সকল আত্মীয়-স্বজন, দ্বীনি ভাইবোন ও প্রতিবেশী প্রত্যেকের কথা স্মরণ করে দু'য়া করলাম। নিজের জন্য করলাম। যেসব নিকটজন কবরে শায়িত আছেন–দাদা-দাদী, নানা-নানী, শ্বশুর-শাশুড়ি, মুনযিরের ছোটমামা ও ছোটচাচা আরও যাদের কথা মনে হয়েছে সবার আখিরাতে মুক্তির জন্য দু'য়া করেছি। হজ্জ-পরবর্তী জীবনকাল যেন আল্লাহর পরিপূর্ন আনুগত্যের জীবন হয়, আবারও যেন সৌভাগ্য হয় আল্লাহর ঘরে আসার–সেই দু'য়া করলাম। এছাড়া যারা যারা দু'য়া করার অনুরোধ রেখেছিলেন–তাদের জন্যও করেছি। মাতৃভাষায় করেছি, কুরআনের ভাষায় করেছি–যত দু'য়া মনে এসেছে। প্রাণভরে দু'য়া করতে পারায় মনটা আনন্দে ভরে উঠল। সূর্যাস্তের পর আমরা রওয়ানা হলাম মুযদালিফার পথে। আরাফা থেকে বিদায় নিলাম। এ যেন বিদায় নয়, জীবনের আরেকটি নতুন অধ্যায় সূচনা করার হাতছানি।

'ইসলাম একমাত্র দ্বীন'-এর এক নিদর্শন : আরাফা দিবস

আল্লাহর ক্ষমাশীলতাকে অনুভব করার ময়দান আরাফা। হজ্জে আগত ব্যক্তির মনে ক্ষমাপ্রাপ্তির আকাংখা উত্তাল হয় এদিনে। এদিনের এত সম্মান, মর্যাদা, পবিত্রতা যেমন সশরীরে প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করা যায়, তেমনি জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর মনোনীত বিধান ইসলামকে বাস্তবে মেনে চলার মধ্য দিয়েই তাঁর ক্ষমা ও কল্যাণ পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করার সুযোগ লাভ হয়। "তোমাদের নিকট আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো তবে এরপর কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা। সে জিনিস হল, আল্লাহর কিতাব।" [সহীহ মুসলিমঃ হুজ্জাতুন নাবী অধ্যায়]

এই supreme truth প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিনে, সেটিই হল আরাফা দিবস। এ দিনটি আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দিন। দু'য়া কবুলের একটি দিন। নবী করিম (সঃ) বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম দু'য়া হল আরাফা দিবসের দু'য়া। আর যে উত্তম কথাটি এদিনে আমি বলি ও নবীরা বলতেন তা হল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা– শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।––একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁর এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [তিরমিযি শরীফঃ ৩৫৮৫]

মাঠ-ময়দান পৃথিবীতে একটি দুটি নয়, অসংখ্য। কিন্তু আরাফা এমনই এক ময়দান যেখানে অবস্থান ছাড়া আল্লাহর মেহমানদের হজ্জ হয়না। "হজ্জ হলো আরাফা।" [মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৩৫]

দিন, বছরে তিনশ পঁয়ষট্টিটি। কিন্তু সর্বাধিক মর্যাদা আরাফা দিবসের। আরাফায় উকুফ করার ইবাদাত কেবলমাত্র ৯ যিলহজ্জ তারিখেই হয়। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিস সৃজনশীলতার নিদর্শন। আরাফার ময়দান আল্লাহপাকের সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার নিদর্শন।

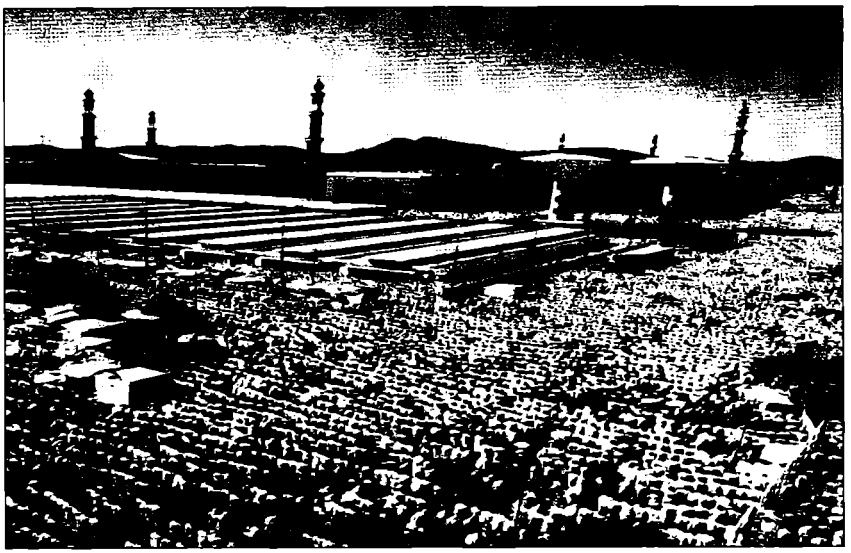

মাসজিদে নামিরা ঃ আরাফায় যেখানে নবী (সঃ) এর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছিল। এ মাসজিদের একাংশ আরাফার সীমার বাইরে বলে উকুফের সময় তা খেয়াল রাখা জরুরী। কেননা, উকুফকালে আরাফার সীমার বাহিরে যাওয়ার অনুমোদন নেই।

হজ্জের নিয়াত হল 'ইহরাম বাঁধা'। আর দুটি ফরয তথা রুকন হল ঃ 'আরাফায় অবস্থান' করা এবং 'তাওয়াফে যিয়ারাহ'। তাওয়াফে যিয়ারাহ ১০ থেকে ১২ যিলহজ্জ এর যে কোন দিনে, যে কোন সময়ে করা যায়। কিন্তু আরাফায় উকুফ কেবল ৯যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ভেতরেই করতে হয়। তবে কেউ অপারগতায় ১০ যিলহজ্জ ফযরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় উকুফ করলেও হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এর পরে করলে হজ্জ বাতিল হবে এবং পরবর্তী বছর অবশ্যই পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, "হজ্জ হচ্ছে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করেছে সে হজ্জ পেয়েছে।"

[আবু দাউদ, তিরমিযি, সুনানে নাসায়ী, ইবনে মাযাহ–সিয়াহ সিত্তাহর এ চার গ্রন্থেই হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে]।

নবী(সঃ) তাঁর বিদায় হজ্জে, সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফা অভিমূখে রওয়ানা হন। বর্তমানে যেখানে মাসজিদে নামিরা, সেখানে তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছিল। [মাসজিদে নামিরার কিছু অংশ আরাফার বাইরে কাজেই উকুফের সময় তা খেয়াল রাখতে হয়]। সেই তাঁবুতে তিনি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান করেন। সূর্য ঢলে পড়ার পর তিনি নিজ উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে এ ময়দানের মধ্যবর্তী উঁচু স্থানে পৌঁছান। সেখানে সমবেত হয়েছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত এক লাখেরও বেশী মানুষ। এ

জনমন্ডলীকে সাক্ষী রেখে তিনি যে বিশ্বজনীন বিদায় ভাষণ দেন, তা আজও উম্মাহর অনুপ্রেরণার উৎস।

আল ইয়াওমুল আরাফা ঃ

৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় ভাষণ দিয়েছিলেন। এই দিবসের শ্রেষ্ঠত্ব বছরের অন্য সব দিনের চেয়ে অনেক বেশী। মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা, এ দিনের মতই সম্মানের।

"শোন! আজকের এই দিন, এই শহর, এই মাস যেমন হারাম (পবিত্র ও সম্মানিত), তোমাদের জান- মাল, ইয্যত- আবরুকে আল্লাহপাক তেমনি পরস্পরের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।" [সহীহ বুখারী : ১৬৩৩] এ ছিল ভাষণের ভূমিকা। এরপরে তিনি যে কথা গুলো বলেন, তাতে উম্মাহর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেনঃ

"তোমাদের পরে কোন উম্মাহ নেই কেননা, আমার পরে কোন নবী নেই। কাজেই নিজ রবের ইবাদাত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সংরক্ষণ করবে, রমযানে রোযা রাখবে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সম্পদের যাকাত দিবে, নিজ রবের ঘরে হজ্জ করবে, তোমাদের মধ্যকার উলিল আমরের আনুগত্য করবে। এমন করলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" [ইবনে মাযাহ: সূত্র-আর রাহীকুল মাখতুম পৃঃ ৫১৩]।

বিদায় ভাষণে তিনি আরও যা বলেছেন, তার সারাংশ *হলঃ এই উম্মাহ সর্বশেষ সুতরাং সার্বজনীন সত্ত্বা আল্লাহপাকের represent করার কাজ বা খিলাফাতের দায়িত্ব সার্বজনীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র সার্বভৌম সত্ত্বা বিধায় তাঁর আনুগত্যের (ইবাদাতের) দিকে ধাবিত হওয়াই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির চাবিকাঠি। সালাতের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা উম্মাহর সামাজিক গতিশীলতার নিয়ামক হবে। রোযা তৈরী করবে সংযম ও তাকওয়া। অর্থনীতি হবে যাকাত ভিত্তিক। বিশ্বজনীনতা, উম্মাহ বোধ বা*

corporate feelings তৈরী করবে হজ্জ। উলিল আমর বা উম্মাহর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে যাকে নির্বাচিত করা হবে–তার আনুগত্য দ্বারাই আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা হবে। সর্বোপরি মৃত্যু-পরবর্তী জীবন বা আখিরাত হবে নিজ রবের সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও জান্নাত প্রাপ্তির জীবন। এই হলো Complete code of life. মানুষ যা কিছু করে থাকে, মানুষের যা কিছু করার প্রয়োজন হয়, কিভাবে সেসব কিছু করবে – তার সবটুকু এর মধ্যে আছে। পরিপূর্ন Guide line.

বিদায় হজ্জের এই ঐতিহাসিক ভাষন শেষ হলে, পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ *"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাত-অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"*(সূরা মায়িদাঃ ৩)

এ আয়াতের ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনা রয়েছে এরকমঃ তারিক বিন শিহাব(রাঃ) থেকে বর্ণিত। ইহুদীরা উমার (রাঃ) কে বলল, 'আপনারা এমন একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, আয়াতটি যদি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত তবে সেদিনটিকে আমরা ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করতাম।' উমার (রাঃ) বললেন, "অবশ্যই আমি জানি, কখন তা অবতীর্ণ হয়েছে আর আল্লাহর রাসূল (সঃ) তখন কোথায় ছিলেন। দিনটি হল 'আরাফাহ দিবস'। আমরা সেদিন আরাফার ময়দানে ছিলাম। আয়াতটি হলঃ "আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আতমামতু 'আলাইকুম নি'য়মাতি ওয়া রদ্বী-তু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।" -- "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নি'য়ামাত, অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। [সূরা মায়িদাঃ৩]" **[সহীহ আল বুখারীঃ ৪৬০৬নং হাদীস]**

আরাফার দিনটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাহদের প্রতি তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ও নিয়ামাত পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির দিবস। Complete code হবার জন্য" Personal life code, dress code, food code, family life code, civil code, criminal code, business code, friendship code, property code, international relation code ...ইত্যাদি যত প্রকার code হতে পারে, সব ইসলামে আছে। code অনুসারে চলার মাঝেও ভুলত্রুটি হতে পারে। সেজন্য সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহর ক্ষমা, কারা কিভাবে পাবে সেই code-ও রয়েছে। আরাফার দিবসটি হচ্ছে সেই দিন, যেদিন মানুষ স্বীয় রবের ক্ষমতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চায়। এ দিনের ক্ষমা লাভের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামাতকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করার প্রয়াস পায়।

নবী করিম(সঃ) বলেছেন, "এমন কিছু গুনাহ আছে, যা আরাফাতের ময়দানে না দাঁড়ালে বিদূরিত হয়না। সেদিন তথায় মানবমন্ডলীর উপর আল্লাহতায়ালার এত বেশী

রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে যে, তা দেখে শয়তান হতাশ ও নিরুদ্যম হয়ে পড়ে।" **[সহীহ আল বুখারীও সহীহ মুসলিমঃ ইসলামে হজ্জও ওমরা, ২৯৪পৃঃ]**
নবী(সঃ) আরও বলেছেন,"আরাফাতের দিন আল্লাহপাক সকল ফিরিশতাদের ডেকে বলেন দেখ, আমার বান্দাগণ কিভাবে বহুদূর দেশ হতে এসে আজকের আরাফার ময়দানে ধুলাবালির সাথে মিলিত হয়েছে! তোমরা সাক্ষী থাকো, যারা আমার ঘর যিয়ারত করতে এসে এত কষ্ট স্বীকার করছে, আমি তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দিলাম। তখন অভিশপ্ত শয়তান কপাল চাপড়ে অনুতাপ করতে থাকে।" **[বুখারী, মুসলিমঃ ইসলামে হজ্জও ওমরা, ২৯৪পৃঃ]**

আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আরাফাতের দিনে মহান আল্লাহ যত সংখ্যক বান্দাহকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, তার চেয়ে বেশী মুক্তি দেন এমন দিন আর দ্বিতীয়টি নেই। এ দিনে আল্লাহতা'য়ালা অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে বান্দাহদের অবস্থা দেখে ফিরিশতাদের সামনে তাদের প্রশংসা করে বলেন, "এরা কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত'হয়েছে?" **[সহীহ মুসলিমঃ ৩১৫১]**

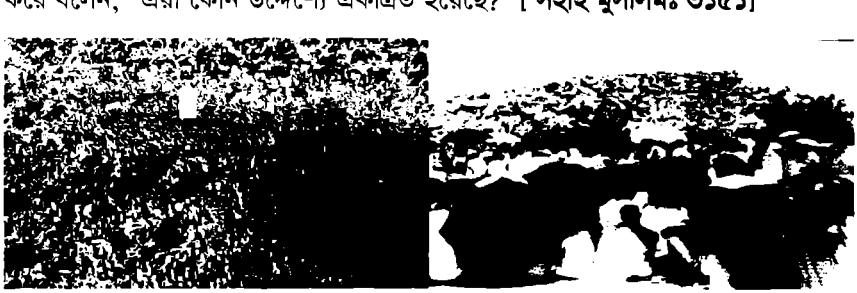

উকুফে আরাফা ঃ
হজ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহর অতিথিরা এদিনের অপেক্ষায় থাকেন ব্যাকুল।

রাসূল(সঃ) বলেন, "আরাফার দিনে, শয়তান যতটা হেয় প্রতিপন্ন ও লজ্জিত হয় অন্য কোন দিনে এতটা হয়না। কেননা, এদিনে চরম মাত্রায় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ বান্দাহ্‌র 'কবীরা গুনাহ' ক্ষমা করে দেন।" **[সহীহ মুসলিমঃ১৩৪৮, নাসায়ী৩০০৬, ইবনে মাযাহঃ৩০১৪]**

হজ্জের কার্যক্রমে আরাফার দিনে, আরাফার ময়দানে প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। অন্যদিকে, যারা হজ্জে আগত নন, তাদের জন্যও এদিনের বিশেষ গুরুত্ব হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। "আরাফার দিনের রোযা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বিগত ও আগত এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।" [সহীহ মুসলিমঃ১১৬৩] এ রোযা হজ্জে অনাগতদের জন্য। আগতদের জন্য নয়। কেননা, নবী(সঃ) বিদায় হজ্জের সময় আরাফায় রোযা রাখেননি। **[সহীহ বুখারী-১৫৪৬, ১৫৪৯]**

আরাফায় প্রায় দশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ভেতরে একই সময়ে বিপুল সংখ্যক অতিথিদের সমাগম ঘটে। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় আল্লাহর অতিথিরা পৃথিবীর সকল প্রকার ভোগের উপকরণ থেকে নিজেকে দূরে রেখে আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির আশায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকেন, যা কিছুর অভাব তার রয়েছে–সব। বর্ণ, জাতি, দেশ নির্বিশেষে সকলের পরিচয় ঐতিহাসিক এ ময়দানটিতে এসে এক হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এক, চাওয়া এক, কাজের পদ্ধতিও এক। সুগভীর ভ্রাতৃত্ববোধ একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকলে এক সার্বভৌম সত্ত্বা আল্লাহ পাকের অধীন। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামই যে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র অনিবার্য পথ– আরাফার বিশ্বজনীন সমাবেশে সচেতন অতিথিদের মাঝে এ বোধ, এ অনুভূতি জাগ্রত না হয়ে পারেনা।

জনসমুদ্রে রাত্রি যাপন : মুযদালিফা

নিজ রুমে, নিজ বিছানায় আমরা অতি স্বাচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করে অভ্যস্ত। জনসমুদ্রের মাঝেও নিশ্চিন্তে রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা মুযদালিফাতেই হয়। আরাফায় উকুফের ইবাদাত সেরে মুযদলিফায় বিশ্রামের ইবাদাত। বিস্তীর্ণ ময়দান জুড়ে বিছানার পর বিছানা। অতিথিদের ঘুমের ইবাদাত চলছে মুযদালিফায়। আশ্চর্য রকম প্রশান্তির সেই ঘুম। অবাক করা নিশ্চিন্ততার ঘুম। ইশার ওয়াক্তে মাগরিব আর ইশা জমা করে একত্রে কসর করে আদায়ের পর বিশ্রাম। এ সময় অন্য কোন নাফল ইবাদাতও নেই, রাসূল (সঃ) করেননি।

জনসমুদ্রে নিশ্চিন্ততার ঘুম কিভাবে আসে, প্রশ্নটি অনেকেরই মনে জাগে। মুযদালিফা একটি হারাম বা পবিত্র স্থান। দু'য়া কবুলের স্থান। প্রত্যেক মানুষ এখানে এসেছেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে, আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে। ফলে এক পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করছে। নিরাপত্তার সমস্যা নেই, নেই ইজ্জত নিয়ে কোন শংকা। ইহরাম বেঁধে প্রতিটি নারী-পুরুষ এক অলংঘনীয় শপথের বন্ধনে কঠিনভাবে আবদ্ধ। অশালীন বাক্যালাপ,অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিপাত অন্য সময়ও তো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর ইহরাম অবস্থায় এসব কাজ, আরও অনেক বেশী গুনাহের কারণ। অন্যসময়ের বৈধ ভোগবিলাস পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় হারাম। মুহরিম সঙ্গী ছাড়া একাকী কোন নারী এখানে আসেন না। হিজাব সহকারেই ঘুমিয়ে পড়েন। শোবার আয়োজন হয় পুরুষ-মহিলা আলাদা কিংবা নিজ মাহরামের সাথে। পাশ্চাত্যের সমাজে কি এরকম পূত-পবিত্র একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের কথা ভাবা যায়? কেবল ইসলামেই এ ধরণের উন্নত নৈতিকতা মন্ডিত সামাজিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

মুযদালিফায় রাতে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন আল্লাহর অতিথিরা।

আরাফার ময়দান থেকে মুযদালিফার দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। আরাফায় উকুফ শেষ করে অতিথিরা এখানে রাত্রিযাপন করেন। প্রায় ৫ কিলোমিটার প্রশস্থ মুযদালিফা একটি পাথুরে উপত্যকা। বর্তমানে মিনার তাঁবু অঞ্চলের একাংশ মুযদালিফার অভ্যন্তরে extension করেছে। মুযদালিফার যে কোন স্থানে রাত্রিযাপন বা অবস্থান করলেই ওয়াজিব আদায় হবে। নবী করীম (সঃ) আরাফা থেকে সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় আসেন এবং রাত্রিযাপন করেন। সাহাবীদেরও তাই করতে বলেন। তিনি বলেছেন, "আমি এখানে (মাশ'য়ারুল হারামে) অবস্থান করলাম। কিন্তু মুযদালিফা পুরোটাই অবস্থানস্থল।" **[সুনানে নাসায়ী]**

আরাফা থেকে মুযদালিফা যাবার সময়, "নবী (সঃ) স্বাভাবিক চলতেন, ফাঁকা পথে উপনীত হলে চলার গতি বৃদ্ধি করতেন।" **[সহীহ বুখারী ঃ১৫৫৩]**

কিন্তু তিনি শোরগোল করে বাহনকে অস্থিরভাবে এগিয়ে নিতে নিরুৎসাহিত করেছেন। উট প্রহারের আওয়াজ পেয়ে তিনি বলেন, "লোকেরা, ধীরে সুস্থে চল। দ্রুত বাহন হাঁকিয়ে চলায় কোন কল্যাণ নেই।" **[সহীহ বুখারীঃ ১৫৫৭]**

খুবই ধীরে চললে মুযদালিফা পৌঁছাতে মধ্যরাত পেরিয়ে নামাযের দেরী হতে পারে। গতি একেবারেই আস্তে হবেনা। এতটা তাড়াহুড়াও করা যাবেনা যাতে অন্যদের কষ্ট হয়। প্রশান্ত হৃদয়ে, সুস্থিরতার সাথে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মুযদালিফা গমনের চেষ্টা করা উচিৎ। নবী(সঃ) এমনই করেছেন।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে স্রোতের মত মানুষ দেখলাম মুযদালিফার পথ ধরেছে। ছোট বাচ্চা সাথে থাকায় এবং আমরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় গাড়িতে যাবার সিদ্ধান্ত হল। গাড়ি ভাড়া করার বেলায় ভাষাটা বড় এক সমস্যা। ইংরেজি বুঝে এখানে এমন ড্রাইভার চোখে পড়েনি। বড়ভাই আরবী এবং ফারসীতে অনর্গল কথা বলায় পারদর্শী। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এক ইরানী ড্রাইভারের সাথে কন্টাক্ট করে একটা মাইক্রোবাস রেন্ট-এ নিয়ে ফেললেন।

আরাফা থেকে মুযদালিফার পথ ঃ

আরাফা থেকে মুযদালিফার দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার হলেও যানজটে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা আর কষ্ট, উভয়ই হাসিমুখে বরণ করেন আল্লাহর অতিথিরা।

আমরা বাংলাদেশী ছিলাম বারজন আর তিনজন উর্দুভাষী মহিলাসহ পনেরজন। পদাতিক মানুষদের পাশাপাশি ধীর গতিতে গাড়ি চলছিল। কিছুদুর যাবার পর দেখি সামনে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে গাড়ির বহর জটলা বেঁধে আছে। কখন যে জটমুক্ত হবে বলা কঠিন। এরমধ্যে বড়ভাই "একটু আসছি" বলে নেমে গেলেন। যানবাহনের ফাঁক গলে কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, কেউই জানিনা। মোবাইলের নেটওয়ার্ক এত দুর্বল যে বেশির ভাগ সময় আমরা তিনজন কেউ কারো মোবাইলে reach করতে পারছিনা। মক্কায় দু'একবার ছাড়া মোবাইল ফোন তেমন একটা কাজে লাগাতে পারিনি। এদিকে খুবই তাড়াতাড়ি আশ্চর্যজনকভাবে যানজট কেটে গেলে গাড়ি চলতে শুরু করল।

ড্রাইভারকে ইংরেজি, আরবী কোন ভাষাতেই বুঝানো গেলনা যে আমাদের লোক আছে, থামুন। ফলে মধ্যম গতিতে গাড়ি বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের জোরালো কণ্ঠ আর ইশারা ইংগিত মিলিয়ে ড্রাইভারের বোধোদয় হল। গাড়ি শ্লো মোশনে আনল। সম্পূর্ণ থামিয়ে রাখা যাচ্ছিলনা, পেছনে ভয়ানক রকম যানজট তৈরীর আশংকায়। গাড়ি রাস্তার পাশে সরিয়ে নেয়ার মত ফাঁকা নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ে বড়ভাইয়ের চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছিনা। অবস্থার জটিলতা টের পেয়ে খুব চিন্তিত মনে আল্লাহর কাছে ধরণা দিতে থাকলাম।

হঠাৎ দেখি মাত্র ৭/৮গজ দূরে আমাদের গাড়ির সমান্তরালে আপন মনে সামনে হেঁটে চলেছেন বড়ভাই। আমাদের ডাকাডাকি আর হাত নাড়ায় কাজ হল। স্বভাবসুলভ হাসিমুখে তিনি গাড়িতে এসে বসলেন। বললেন, "মুযদালিফায় খাবার দাবার পাওয়া যায়না তো, কিছু কিনতে গিয়েছিলাম।" হালুয়া জাতীয় কিছু খাবার তিনি কিনেছেন দেখলাম। বললেন, "যখন দেখি যানজট কেটে গেছে, পেছনে কোন গাড়ি থেমে নেই, তখনই সোজা সামনে হাঁটা দিলাম, ভাগ্যে থাকলে গাড়ির খোঁজ পাবই।" মুনযিরের আব্বু বললেন,"আলহামদুলিল্লাহ। সত্যিই আল্লাহ আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন"। আমি বললাম, "বড়ভাই, সঙ্গে চিড়া, খেজুর আর প্রচুর ফল আনা হয়েছে। ভালভাবেই রাত কাটতো। আপনি খাবার কিনতে গেলেন কেনো?" একটু হাসলেন তিনি।

বেশ শ্লো মোশনে রাত আটটা পর্যন্ত একটানা গাড়ি চলল। এর পর মুযদালিফার ভেতরে এসে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল। আমরা মুযদালিফার মিনা সংলগ্ন স্থানে অবস্থান করতে চাচ্ছিলাম যাতে সকালে সহজেই তাঁবুতে পৌঁছা যায়। আরো দু'কিলোমিটার পথ বাকী। গাড়ি ঠিক হতে কত সময় যাবে বলা কঠিন। গাড়িতে কোন এসি ছিলনা। আগে থেকেই ঘামছিল সবাই। সারাদিনের রোদে তপ্ত পাথুরে মরুমাটি রাতের আঁধারে তাপ বিকিরণ করে চলেছে। কোথাও বাতাস নেই।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা উপত্যকাভূমিতে দাঁড়ালাম। রাস্তার পাশে দেখতে পাচ্ছি শত-সহস্র শয্যা। আল্লাহর অতিথিরা কেউ নামাযে, কেউ বিশ্রামে রত। আমাদের কাছাকাছি একটা আরব ফ্যামিলি রাত্রি যাপনের প্রস্তুতি নিয়েছে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ এক মহিলা, ইজি চেয়ারে আধশোয়া। নিচে বসে মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা। আনুমানিক বারো থেকে বিশ বছর বয়েসী তিন মেয়ে। বড়জন খুবই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গ্যাস বার্নারে কেতলি চাপালো। ছোট দু'জনে ট্রে-তে কিছু বানস্ আর কাপ সাজালো। বাবা-মা দু'জনে Instruct করছেন। মুনযিরকে হাঁটাহাঁটির জন্য ছেড়ে দিয়ে রাইসা আপা আর কোহিনুর ভাবীদের সাথে কথা বলছি। দীর্ঘ সময় বসে থাকার জড়তা কাটাবার জন্য হাঁটছি, মুনযিরের দিকে চোখ রাখছি আবার ফাঁকে ফাঁকে তিন চটপটে কন্যার চায়ের ব্যবস্থাপনাটা উপভোগ করছি।

ইতোমধ্যে গাড়ি সারাই হয়ে গেছে, আমরা উঠি উঠি করছি। ঠিক সেসময় মাঝবয়েসী ভদ্রলোকটি ট্রে হাতে প্রায় ছুটে এলেন। কফি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। তার ভাষা আমাদের বোধগম্য না হলেও ভাবের আবেদন উষ্ণ ও আন্তরিক, বুঝতে কষ্ট হয়নি। আল্লাহর এই অতিথিরা মুযদালিফায় শুধু রাত্রিযাপনই করছেন না, অন্য অতিথিদের সেবা ও সৌজন্যে নিজেদেরকে নিবেদিতও রেখেছেন।

মুনযিরের আব্বু কিছুই খেতে চাইলেননা। ছ'কাপ কফি আর বিশাল আকারের দুটো বানস্ আমরা দশ-বারো জনে খেলাম। সে রাতে পানি আর ফল ছাড়া কোন খাবারের চাহিদা আমরা বোধ করিনি।

কফির পালা সেরে আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ চলার পর ড্রাইভার আরও সামনে এগুতে আপত্তি জানাতে শুরু করলো। বড়ভাই অনর্গল ফার্সিতে তার সাথে কথা বলতে লাগলেন, যাতে সে একঘেঁয়ে বোধ না করে। বড়ভাই ডাক্তার শুনে সে তার নানারকম অসুখ-বিসুখের ফিরিস্তি দিচ্ছিল। বড়ভাই তাকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলে সে খুবই সন্তুষ্ট হল। ড্রাইভার এদিকের রাস্তাঘাট চেনেনা। মুযদালিফার মিনা সংলগ্ন ব্রীজ–'কুবরী মালিক ফায়সাল' পর্যন্ত আমরা যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফায়সাল ব্রীজের অনেক আগেই আবার গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। অগত্যা আমরা গাড়ি ছাড়লাম। রাস্তা শেষ না হলেও, ভাড়া অতিরিক্ত কয়েক রিয়াল করে দাবী করলো সে। সহযাত্রীদের কেউ কেউ অতিরিক্ত ভাড়া দিতে নারাজ। বেশ ঝামেলা। সবাইকে ম্যানেজ করে ভাড়া আদায় করা, আবার ড্রাইভারকেও convince করা। এজন্য মুনযিরের বড়মামা আর আব্বু দু'জনকেই কথা খরচ করতে হল অনেকটা। বাংলা,

ইংরেজি, ফার্সি সবই এখানে কাজে লাগছিল। যে কোন কো-অপারেটিভ কাজেই সুন্দর ম্যানেজমেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর বিশ্বমানের ম্যানেজমেন্ট হতে হলে নানা ভাষায় দক্ষতা জরুরী। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতি অনুযায়ী লেনদেন চুকিয়ে আমরা অবস্থানের জন্য ফাঁকা জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম।

রাস্তায় এত ভীড় যে সামনে পা বাড়ানো কঠিন। রাস্তা থেকে নিচে নেমে প্রায় দশ গজের মধ্যে কোথাও বিছানা করার মত ফাঁকা নেই। সব ফিলাপ। সেখানটা পেরিয়ে আরেকটু এগিয়ে পিচঢালা রাস্তার মত জায়গা। সেখানে পার্ক করা গাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গা মিলল। রাত তখন এগারোটা পেরিয়ে গেছে। আমাদের ফ্যামিলি, রাইসা আপা আর কোহিনূর ভাবী- এ তিন ফ্যামিলির মহিলারা একটিতে, পুরুষেরা আরেকটিতে-এভাবে সীট প্লান করা হল। মহিলা ও পুরুষদের বিছানার মুখোমুখি দুই প্রান্তে দিদার ভাই আর কোহিনূর আপাকে দেয়া হল। এ দু'জন মানুষকে সব কাজেই আন্তরিক ও co-operative পেয়েছি। টয়লেট খুঁজতেই কাছাকাছি পেয়ে গেলাম। পনের বিশ জনের লম্বা লাইন। লাইনে দাঁড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই। একঘন্টা সময় ওখানেই গেলো। বোতলে পানি এনে খোলা মাঠেই উযু করলাম। মাগরিব-ইশা একত্রে জামায়াতে আদায় করে ঘড়ি দেখলাম-রাত বারটা। রাতের খাবার মেলে বসলাম। পাঁচ ঘন্টা আবদ্ধ থেকে হালুয়া ততক্ষণে নষ্টের পথে। দু'একটি খেজুর, জ্যুস বা পানি ছাড়া কেউই তেমন কিছু খেতে আগ্রহী ছিলনা। মুনযিরও আমাদের সাথে সামান্য কিছু খেল। ওর মামা আর বাবা মিলে আমাদের চারজনের কংকর কুড়িয়ে গুনে গুনে রাখছিলেন। প্রত্যেকের জন্য আলাদা থলি। প্রতি থলিতে ৪৯টি। যারা ১৩ জিলহজ্জ অবস্থান করে ফিরবেন তাদের মোট কংকর প্রয়োজন হবে ৭০টি।

সাড়ে বারোটার দিকে সীট প্ল্যানমত সবাই শুয়ে পড়লাম। বিছানায় পিঠ রাখার পরই শীতের প্রচন্ডতা টের পেলাম। এর আগেও শীতবোধ হয়েছে, তবে ছুটোছুটির মধ্যে থাকায় এতটা বুঝতে পারিনি। সন্ধ্যায় তো গাড়িতে ঘামছিলাম। মুনযিরকে ওর ছোট্ট কম্বল দিয়ে ঢাকলাম। কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসের প্রকোপ থেকে নিরাপদে রাখার জন্য ওর উপর রাতভর ছাতা মেলে ধরে ছিলাম । মোটা কাপড়ের বোরকা, পশমী শাল ও স্কার্ফ পরেও শীতে কাঁপছিলাম আমি।

মুযদালিফার খোলা আকাশের নিচে শুয়ে দেখলাম অগুনতি তারা জেগে আছে আকাশের বুকে। ১০ যিলহজ্জের চাঁদ ততক্ষণে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। চারিপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশ্রামের ইবাদাত চলছে। এভাবে উন্মুক্ত ময়দানে জনসমুদ্রের মাঝে ঘুমাবার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও ঘুম আসতে মোটেই দেরী হয়নি।

হজ্জ সফরের শুরু থেকেই একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। এবারে মুযদালিফায় প্রশান্তির ঘুমটা বারবার ভাঙ্গার পরীক্ষা চলল। ফযরের আগ পর্যন্ত দু'একবার নয়,বহুবার। In fact আমাদের অবস্থানস্থলটি ছিল একটি লিংক রোড, যেটা আমাদের

জানা ছিলনা। ওখানে সারি সারি গাড়ি পার্ক করা। দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ এ ধরণের নারী-পুরুষদের জন্য মধ্যরাতের পর থেকে মুযদালিফা ত্যাগ করার অনুমোদন আছে। ঐ ধরণের অতিথিদের মধ্যরাতে চলে যাবার সাথে পার্ক করে রাখা গাড়ির সম্পর্কযুক্ত কোন ঘটনা ঘটতে পারে এরকম কেউই ভাবিনি। ফলে এক কঠিন বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। রাত্রি একটার দিকে গাড়িগুলো একের পর এক চলতে শুরু করল। আওয়াজ শুনে হতচকিত উঠে বসি। রাজ্যির ঘুমভরা চোখ মেলতেই গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধাঁ লাগল। শুনতে পেলাম, এক লোক চিৎকার করে বলছে, "তারিক ইয়া হাজ্জা, তারিক ইয়া হাজ্জা।"–'হে সম্মানিত হাজি, দয়া করে রাস্তা দিন।'

আর কি বসে থাকা যায়? ঝটিতি ঘুমন্ত মুনযিরকে কোলে টেনে নিয়ে সরে এলাম। কোহিনূর আপা, রাইসা আপা মিলে বিছানা সরাতেই শাঁ করে চলে গেল কয়েকটি পাঁজেরো জীপ আর মাইক্রোবাস। চলন্ত গাড়ি থেকেই তারা ধন্যবাদ জানাতে ভুলেনি। বলেছে, "শুকরান, ইয়াল্লা হাজ্জা, শুকরান।"

আবার বিছানা করে শুয়ে পড়ি। চোখের পাতা লেগে উঠতেই আবার হর্ন.....। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল ভোর হওয়া পর্যন্ত। চারিদিকে কোথাও কোন ফাঁকা জায়গা চোখে পড়েনি যে সরে গিয়ে বিছানা করব। ভোরে বেশ অন্ধকার থাকতেই বিছানা ছাড়লাম। পাশে বসেই উযু করলাম। নামায সেরে নিলাম বিছানাতেই ।

ফযরের পর মুযদালিফার এক বিশেষ স্থানে (মাশয়ারুল হারাম) নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে দু'য়া করেন। আল্লাহপাকের বাণী "তোমরা যখন আরাফা থেকে ফিরে আসবে তখন 'মাশয়ারুল হারাম'–এর নিকটে অবস্থান কর এবং আল্লাহকে স্মরণ কর। তেমনিভাবে, যেভাবে তোমাদের পথনির্দেশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই তোমরা পথহারা ছিলে।" (সূরা বাকারাঃ১৯৮)
এরকম জনসমূদ্রে মাশয়ারুল হারাম পর্যন্ত পৌঁছা জরুরী নয়, সম্ভবও নয়। মুযদালিফার যে কোন স্থানই মাশয়ারুল হারামের নিকটবর্তী স্থান। এর যে কোন প্রান্তে অবস্থান করলেই ওয়াজিব আদায় হয়।

নবী(সঃ) বিদায় হজ্জে, সূর্যোদয়ের আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওনা হন। এসময়, "তাঁর সওয়ারীর পিঠে ফযল(রাঃ) কে বসান। ফযল (রাঃ) বলেন, নবীজি জামরাতুল আকাবায় পৌঁছে কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পড়ছিলেন।"**(সহীহ বুখারীঃ১৫৭১)**

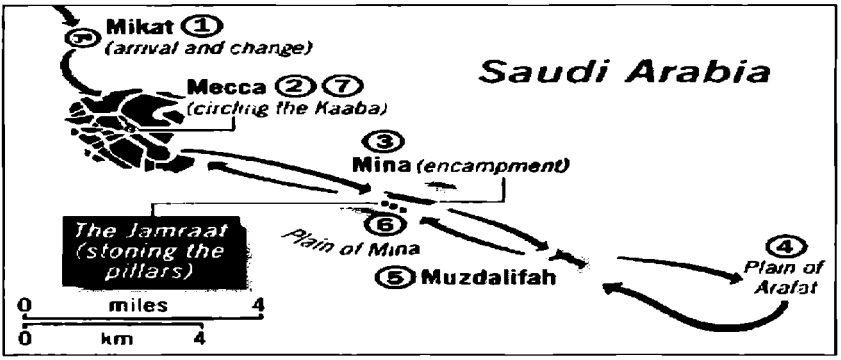

মক্কা- মিনা- আরাফা-মুযদালিফা- মিনা- মক্কা এ পথেই নবীজি [সাঃ] হজ্জের সফর করেছেন।

আমরা বাহন জোগাড় করতে পারিনি। ফযরের পর দু'য়া করে, ব্যাগ গুছিয়ে পায়ে হেঁটেই রওনা হলাম। মিনার দূরত্ব দেড়/দুই কিলোমিটার হবে। হাইওয়ে ধরে হাঁটতে থাকলাম।

লক্ষ লক্ষ অতিথি। মুখে মুখে তালবিয়ার আওয়াজ বুলন্দ রয়েছে আগের মতই। গতরাতে খুঁজে না পাওয়া সেই 'কুবরী মালিক ফায়সাল' সকালের আলোয় সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। যেখানে রাত কাটিয়েছি, সেখান থেকে পনের মিনিট হেঁটে ফায়সাল ব্রীজে চলে আসলাম। ব্রীজের উপরে দাঁড়িয়ে মিনার পাহাড়গুলোর অবস্থান দেখে আমরা আমাদের তাঁবুর দিক নির্ণয় করলাম। মুনযির কিছুতেই মামা বা আব্বুর কোলে যেতে রাজি হলনা। ছোট্ট শিশু কোলে নিয়ে প্রায় দু'কিলোমিটার পথহেঁটে সকালের নরম রোদেও ঘেমে উঠেছি। তাঁবুতে পৌঁছলাম সকাল সাড়ে সাতটায়। পৌঁছতেই, তাঁবুর চেনাজানাদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, "আরাফাত পেয়েছিলেন তো?"

"আপনাদের জন্য খুব চিন্তা হয়েছে। হারিয়ে যাওয়াতে কোন কষ্ট হয়নি তো?"

আমিতো অবাক। বললাম, "আমরা তো হারিয়ে কোথাও যাইনি। জায়গামতই ছিলাম। আপনারা আমাদের হারিয়ে ফেলেছিলেন বুঝি?"

ততক্ষণে সকালের নাস্তা পরিবেশিত হচ্ছে তাঁবুতে। আমার সামনে আজকের গুরুত্বপূর্ন চারটি কাজের চিন্তা প্রাঞ্জল হয়ে উঠল।

কুরবানী ঃএক অন্তহীন ভালবাসার নিদর্শন

আজ দশ যিলহজ্জ। এ দিনে মুসলিম বিশ্বে ঈদুল আযহা। হজ্জের ময়দানে ইয়াওমুন নহর বা কুরবানীর দিন। এ দিনে হজ্জের একটি ফরয, তিনটি ওয়াজিব কাজ রয়েছেঃ জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, চুল কাটা এবং তাওয়াফে যিয়ারাহ (ফরয তাওয়াফ)।

১০ যিলহজ্জ বা ইয়াওমুন নহর বা কুরবানীর দিন ঃ এদিন জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা, কুরবানী করা, মাথা মুন্ডন করা এবং ফরয তাওয়াফ সম্পন্ন করাই আল্লাহর অতিথিদের মূল কর্মকান্ড।

প্রথম দুটোর সাথে মিশে আছে হযরত ইবরাহীম(আঃ) এবং তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) এর জীবনের তুলনাহীন ত্যাগের দৃষ্টান্ত। আল্লাহপাক ঈমানদারদের জন্য এ ত্যাগকে এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন যে এটাকে মুসলিম উম্মাহর জন্য নিদর্শন এবং আল্লাহর অতিথিদের হজ্জের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ করে দিয়েছেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সামনে না রাখলে কুরবানীর ইবাদাত হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ।

আল্লাহর নির্দেশ পালনকে নিজের সহজাত সন্তান বাৎসল্য থেকে উপরে স্থান দেবার শিক্ষা রয়েছে পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর জীবনে। পাশাপাশি আল্লাহর আনুগত্যের পথে মজবুত থাকাটা নিজ জীবনের চেয়ে দামী, প্রমাণ করছেন ইসমাঈল (আঃ)। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সামনে, তাঁরই নির্দেশের সামনে, অবনত হবার যে ঐকমত্য পিতা-পুত্রের মধ্যে তৈরী হয়েছিল, সেখানে বাধ সাধতে শয়তান আবির্ভূত হয়েছিল। শয়তান সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে তিনি কংকর নিক্ষেপ করেন।

আল্লাহর নির্দেশক্রমে ইবরাহীম(আঃ) প্রিয় স্ত্রী হাজেরা(রাঃ) আর প্রিয়পুত্র ইসমাঈল(আঃ) কে মক্কায় অভিবাসিত করে চলে যান ফিলিস্তিনে। মাঝে মাঝে এসে তাদের দেখে যান। ইসমাঈল (আঃ) একটু বড় হলে পর যা ঘটেছিল, কুরআন তার নির্ভুল ইতিহাস বর্ণনা করেছে এভাবে, "যখন সে (ইসমাঈল) তার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল,'প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে কুরবানী করছি। তোমার অভিমত কি? ' সে বলল, 'আব্বা, আপনি আল্লাহর হুকুম কার্যকর করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইবরাহীম স্বীয় পুত্রকে কাত করে শোয়াল, তখন তাকে আমি ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে।' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়নদের পুরস্কৃত করি। নিশ্চয়ই এটি ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আর পরবর্তী লোকদের মাঝে একথা স্থায়ী করে দিলাম যে, ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" [সূরা সাফফাতঃ১০২-১১১]

আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ তথা স্বীয় সন্তানকে কুরবানীর নিদর্শনস্বরূপ পশু কুরবানী আর শয়তানকে বিতাড়ন করে আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তরণের স্মরণিকা জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা। একের পর এক পরীক্ষায় উত্তরণের পর আল্লাহপাক তাকে "মিল্লাতা আবিকুম" [তোমাদের....পিতা-সূরা হজ্জঃ৭৮], "লিন্নাসি ইমামা" [মানব জাতির নেতা-সূরা বাকারাঃ১২৪], "খলিলুল্লাহ" [আল্লাহর বন্ধু-সূরা নিসাঃ১২৫] এভাবে একের পর এক উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর আল্লাহর নির্দেশক্রমেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ(সঃ) স্বয়ং জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন এবং কুরবানী করেছেন। হজ্জে যারা আগত নন, তাদের জন্যও প্রতিবছর সামর্থ অনুযায়ী এদিনে পশু কুরবানী করা ওয়াজিব। এর মাধ্যমে মুমীনরা নিজ ইচ্ছা, বাসনা, ধন-সম্পদ এবং জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহন করে থাকেন। 'কুরবানী' sacrifice-এর নিদর্শন। আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণের practice.

"কুরবানীর উটগুলোকে আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছি।" [সূরা হাজ্জঃ ৩৭]

পশু জবেহ করা কুরবানীর আনুষ্ঠানিক দিক, তাকওয়া হল কুরবানীর প্রাণ। কেননা, "এসকল পশুর গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। এ গুলোর রক্তও পৌঁছেনা। বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।" [সূরা আল হাজ্জঃ ৩৭]

বাধা ডিংগিয়ে আল্লাহর পথে চলার নিদর্শন ঃ রামী

'তাকওয়া' একটি উন্নতমানের নীতি। আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ক্ষেত্রে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় মানুষকে সাহায্য করে। অন্যদিকে, শয়তান মানুষের ঈমানী পরীক্ষায় উত্তরণে সবচেয়ে বড় বাধাদানকারী শক্তি। শয়তান আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মিথ্যা ভয় দেখায় যাতে মানুষ তার রবের অনুগত থাকার ব্যাপারে ভুল করে বসে। যেন মানুষ আল্লাহর বিরাগভাজন হয়ে চুড়ান্ত পুরস্কার অর্জন থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। কুরআন তার পরিচয় এভাবে দিয়েছে "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু"। [সূরা ইউসুফঃ৫] মানুষের রক্ত কণিকায় চিরকাল প্রবাহের ক্ষমতা সে আল্লাহর কাছে চেয়ে নিয়েছে। তাই সে মানুষের চিরশত্রু "ওয়াস ওয়াসিল খন্নাস" 'বার বার কুমন্ত্রনা দাতা' ঃ "বারবার কুমন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, যে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের হৃদয়ে। হোক সে জিন অথবা মানুষ।"[সূরা নাসঃ ৪-৬]

তার প্রধান আক্রমনস্থল হল মানুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ-অন্তর বা হৃদয়। তার প্রথম আক্রমন মানুষের অন্তঃস্থলেই হয়। এতে যারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তাদের দ্বারাই আল্লাহর হুকুম ফিজিক্যালি লংঘিত হতে থাকে। এভাবে সমাজে বিশৃংখলা এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি বিমুখতা যাদের মাধ্যমে ছড়ায় তারা সবই 'খন্নাস'। রামী বা জামরায় কংকর নিক্ষেপ আমাদের এটাই শেখায় যে, আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে শয়তানের ছোট-বড় যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করবো। শয়তানের হাতছানিকে উপেক্ষা করে 'তাকওয়া'-র নীতিতে জীবন যাপন করবো।

কংকর নিক্ষেপ ঃ শয়তানের প্ররোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলার ট্রেনিং।

এ যেন আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টিকে আপোষহীনভাবে সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি। কিছু লোক দেখলাম জামরায় খুব উত্তেজিতভাবে জুতা, ছাতা, ছুঁড়ে দিয়ে নিজের ক্রোধ প্রকাশ করছে। যেন শয়তানকে পিটিয়ে আচ্ছা শায়েস্তা করবে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। একজন মুমীন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্তই শয়তানের প্ররোচনাকে হৃদয় ও কর্মের দৃঢ়তা দিয়ে উপেক্ষা করে চলতে হয় ।

জামরা ঃ

আল্লাহর এক নিদর্শন, যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তার প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের প্ররোচনাকে দূরে নিক্ষেপ করে পথচলার অনুশীলন করে। এ অনুশীলন চলবে যতদিন বাঁচবে এই পৃথিবী।

জামরা বলতে তিনটি স্তম্ভকে বুঝায়। ঐসব পিলারের মাঝে শয়তান আটক হয়ে আছে ব্যাপারটা এমনও নয়। বরং শয়তানের প্ররোচনা ও আহবান প্রত্যাখ্যান করে চলার প্রতীকী মহড়া হচ্ছে জামরায় কংকর নিক্ষেপ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ)এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইবরাহীম(আঃ) জামরাতুল আকাবার নিকটে এলে শয়তান হাজির হয়। তিনি সাতবার কংকর নিক্ষেপ করার পর শয়তান বিতাড়িত হয়। ছোট ও মধ্যম জামরায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। [ইসলামে হজ্জও ওমরাঃ আ.মু.ইউনুস পৃঃ ৩১০]

এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিদর্শন হিসেবে সামনে রেখে ১০ যিলহজ্জ জামরাতুল আকাবায় ৭টি, ১১ ও১২ যিলহজ্জ দুইদিন প্রত্যেক জামরায় ৭টি করে তিন দিনে মোট ৪৯ টি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। হযরত উসামা বিন যায়িদ(রাঃ) ও ইবনে আব্বাস(রাঃ) উভয়ে বলেন, *'জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল (সঃ) তালবিয়া পাঠ করেছেন।' [সহীহ আল বুখারীঃ হজ্জ অধ্যায়]*

১০ যিলহজ্জ জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত রাসূল [সাঃ] তালবিয়া পাঠ করেছেন।

উত্তেজিত ভাবে জামরায় কোন কিছু ছুঁড়ে দেয়া ইসলামী সৌজন্যের বিপরীত। তাকবীর বলে ধীরস্থিরভাবে রামী করা জরুরী। কেননা, *"তাওয়াফ, সায়ী, এবং রামী করা আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।"[সুনানে আবু দাউদঃ ১৬১২]*
জামরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি।"এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে তাজিম করলে তার হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই করে থাকে।" [সূরা হজ্জঃ৩২]

পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর সেই ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা সংঘটনের ময়দান মক্কা আর মিনা। কুরবানীর এ ঐতিহাসিক স্থানেই কুরবানী করার আবশ্যকতা আল্লাহর অতিথিদের আরও একটি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার সুবর্ণ সুযোগ। দু' ধরণের হাজীদের জন্য মিনাতে কুরবানী করা ওয়াজিব। তামাত্তু এবং কিরান। তামাত্তু বলে তাদের হজ্জকে, যারা হারাম মাসে উমরাহর ইহরাম বাঁধেন, উমরাহ করে হালাল হন অতঃপর ৮যিলহজ্জ হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। কিরান বলা হয় তাদের হজ্জকে যারা একসাথে উমরাহ এবং হজ্জ উভয়ের জন্য ইহরাম বাঁধেন। কেবলমাত্র ইফরাদ হজ্জের বেলায় কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। শুধুমাত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলে সেটা 'ইফরাদ হজ্জ'।

আমাদের ইহরাম তামাত্তু হজ্জের। তাই কুরবানীর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ন ছিল। হাজীদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে অধিকতর শৃংখলা বৃদ্ধির প্রয়োজনে এখানে কুরবানীর স্থান সুনির্দিষ্ট করা আছে। এতে নিজের পশু নিজে কিনে কুরবানী করা সম্ভব নয়। এজন্য একটি বড় গ্রুপের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে গ্রুপের সকলের কুরবানীর ব্যবস্থা করা হয়। কুরবানী নিশ্চিত করার পূর্ণ দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করেন। ব্যাংকের মাধ্যমেও কুরবানীর টাকা জমা দেয়া যায়। সেক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কুরবানীর দায়িত্ব নেন। টাকশালের মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট জনাব আমিনুল ইসলাম- এ ধরণের প্রতিনিধি দলের

সাথে আছেন। মুনযিরের আব্বু মক্কা থেকে একদিন তার সাথে গিয়ে পশুর হাটে পশু ঠিক করে, তাকেই কুরবানীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কুরবানী সম্পন্ন হলে তিনি ফোনে জানিয়ে দিবেন।

কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানী, তারপর চুল কাটা–এ ধারাবাহিকতায় রাসূল (সঃ)নিজে করেছেন, আমাদেরও তাই করণীয়।
আনাস(রাঃ) বলেন, রাসূল(সঃ) মিনায় এসে, জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন এরপর তার মিনার অবস্থান স্থলে এসে কুরবানী করলেন। এরপর ক্ষৌরকারকে বললেন, 'নাও'। তিনি হাত দিয়ে মাথার ডানে ইশারা করেন। তারপর বামে। এরপর অন্যদের তা দিতে থাকেন। [সহীহ মুসলিমঃ ২২৯৮]
রাসূল(সঃ) পুরুষদের মাথা সম্পূর্ণ মুন্ডন করার জন্য তিনবার মাগফিরাতের দু'য়া করেছেন। আর চুল ছাঁটার জন্য করেছেন একবার। মহিলারা এর ব্যতিক্রম। চুল নারীর সৌন্দর্য। কাজেই নারীরা চুলের অগ্রভাগ একইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন। মুন্ডন করবেন না।'.....রাসূল(সঃ) নারীকে মাথা মুন্ডন করতে নিষেধ করেছেন।' [তিরমিযিঃ ৩/২৫৭]
রাসূল(সঃ) যখন যেভাবে যেটা করেছেন, সেভাবেই ধারাবাহিকতা রক্ষার চেষ্টা থাকতে হবে। তবে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকতা রাখা অসম্ভব হয়ে গেলে সমস্যা নেই।
আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন্ আস(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল(সঃ)এর কাছে শুনেছি। দশ জিলহজ্জ একব্যক্তি তাঁর নিকটে এল। তিনি তখন জামরার কাছে দাঁড়ানো ছিলেন। লোকটি বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে মাথা মুন্ডন করেছি।' তিনি বললেন, "সমস্যা নেই"। আরেক ব্যক্তি বলল, 'আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে জবেহ করেছি।' তিনি বললেন,"সমস্যা নেই"। অপর এক ব্যক্তি বলল, 'আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি।' তিনি জবাব দেন ,"সমস্যা নেই।" [সহীহ মুসলিমঃ২৩০৫]
"নহরের দিন রাসূল(সঃ) সূর্যোদয়ের ঘন্টা দুই পর জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন।" [সুনানে নাসায়ী ঃ ৩০১৩]

একই সময়ে লক্ষ লক্ষ লোকের একই কাজে নিয়োজিত হলে সমস্যা হতে পারে তাই প্রয়োজন মোতাবেক ব্যতিক্রম করার সুযোগ আছে। পর্দা মেন্টেন করে পুরুষের ভীড় এড়িয়ে হজ্জের কাজ করা নারীদের জন্য জরুরী। মহিলারা সূর্যোদয়ের পূর্বে রামী করতে পারে। ভীড়ে কষ্ট পেয়ে বা পর্দা লংঘন করে সুন্নাত সময়ে যেতেই হবে এরকম বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। বরং হাদীসে রয়েছে–"নারীদের জন্য ১০ তারিখ সূর্যোদয়ের পূর্বে ও রামী করা চলে।"
[সহীহ মুসলিমঃ১২৯০]
সাথে ছোট শিশু থাকায় মধ্যরাতের পর দু'কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জামরায় যাবার সাধ্য আমার ছিলনা। অপেক্ষায় ছিলাম দিনের। সকালে ন'টার দিকে মুনযিরের আব্বু জানালেন যে বড়ভাই সহ আরো ক'জন মিলে জামরায় যাচ্ছেন, রামী করতে। পরিবেশ অনুকূল পেলে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। আর তা সম্ভব না হলে তারাই

আমাদের দু'জনের পক্ষ থেকে রামী করবেন। বেশী ভীড় থাকলে বাচ্চা নিয়ে ওখানে যাওয়া ঠিক হবেনা। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

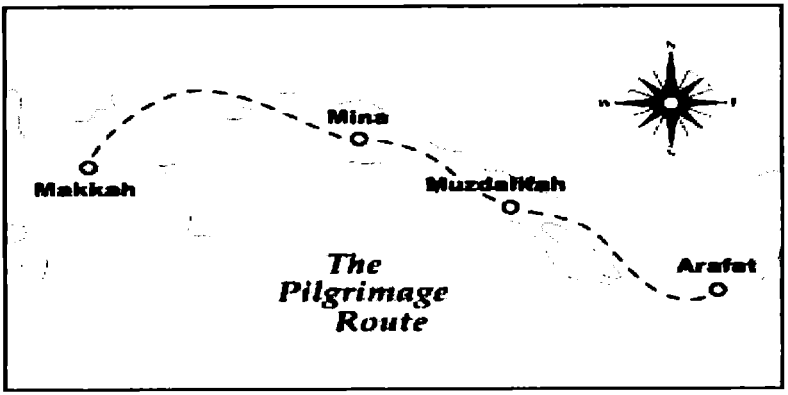

হজ্জের সফরে যে সকল মঞ্জিল অতিক্রম করতে হয়।

দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকেলে মুনযিরের আব্বুর ফোন পেলাম। রামী শেষ করে তারা এখন মক্কায়। প্রচন্ড ভীড় দেখে আমার পক্ষ থেকে রামী করেছেন মুনযিরের আব্বু। আর মুনযিরেরটা ওর বড়মামা। অপারগতায় যে বিকল্প ব্যবস্থা আল্লাহপাক রেখেছেন সেজন্য তাঁর শুকরিয়া জানালাম। আল্লাহর কাছে আবার আসার তাওফীক চাইলাম যাতে নিজেই রামী করতে পারি। কুরবানীর ইতিহাস আর শিক্ষাগুলো স্টাডি করে, মুনযিরের যত্ন আর বিশ্রামে আমার উদ্বিগ্ন সময়গুলো কেটে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ তাঁবুর অনেকেই দেখলাম কুরবানী শেষ করে চুল কেটেছে। আমি কুরবানীর খবর জানতে উদগ্রীব ছিলাম কারণ, আমার ফোন থেকে কিছুতেই মুনযিরের আব্বুর ফোনে reach করতে পারছিলাম না। অবশেষে রাত ন'টার দিকে সালেহ আকবর ভাইকে জানাতেই তিনি উদ্যোগ নিলেন। সালেহ ভাই নিজের সেলফোন থেকে সহজেই মুনযিরের আব্বুকে পেলেন। আমি কথা বলে সার্বিক খোঁজ নিলাম। এইমাত্র আমাদের কুরবানী হবার খবর পেয়েছেন, জানলাম। আজ রাতে ফরয তাওয়াফ সেরে মিনায় এসে আমাকে কালকে রামী ও ফরয তাওয়াফের জন্য নিয়ে যাবার ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন মুনযিরের আব্বু। নিশ্চিন্ত হয়ে চুল কাটলাম। ইলেক্ট্রনিক রেজরে মুনযিরের চুলও কাটলাম। গোসল করে ইহরামের ড্রেস বদলাতেই মুনযিরও যেন বদলে গেল খানিক। এরপর শুরু হল আমার ফরয তাওয়াফের অপেক্ষায় সময় গোনা।

আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোয়

আইয়ামে তাশরিক যিলহজ্জের ১১, ১২, ১৩ তিনদিন, বিশেষভাবে আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। এ তিনদিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার নির্দেশ আল্লাহর স্মরণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। [সুনানে আবু দাউদঃ১৬১২]

"তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দু'দিনে চলে আসে তবে গুনাহ নেই। কেউ যদি বিলম্ব করে তাতেও গুনাহ নেই। যে তাকওয়া অবলম্বন করে –এসব তারই জন্য। আর তোমরা ভয় শুধু আল্লাহকেই করো।" [সূরা বাকারাঃ২০৩]

এগারো ও বারো দু'দিন মিনায় অবস্থান করা জরুরী। কেউ যদি বারো তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় কাটায় তবে তার মিনায় রাত্রি যাপন করে তের তারিখ সূর্য হেলার পর পূনরায় কংকর মেরে মক্কা ফিরতে হবে। সে ক্ষেত্রে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে আরও অতিরিক্ত ২১টি।

আজ এগারো যিলহজ্জ। ভোররাতে তিনটের দিকে বড়ভাইসহ মুনযিরের আব্বু তাঁবুতে পৌঁছালেন। ইহরামের পরিবর্তে সবার এখন স্বাভাবিক ড্রেস। ঈদ ঈদ লাগছিল। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা রেস্টলেস হজ্জের কাজে ব্যস্ত কাটাবার পর দু'জনেরই ভাল একটা বিশ্রাম দরকার। কিছু খাবার পাঠিয়ে দিয়ে তাদের বললাম, খেয়ে বিশ্রাম নিতে। কাজেই তাওয়াফে যিয়ারাহর জন্য আমার অপেক্ষার পালা দীর্ঘায়িত হল। সাফা–ফারাহদের আব্বু ফারুক সাহেব অনেক কষ্ট করে কুরবানীর গোশত মক্কা থেকে রান্না করে এনেছেন। সকালের নাস্তায় সেটা পরিবেশন করল সাফা আর ফারাহ দুইবোন। আজ বাংলাদেশে ঈদ। অনেকে মোবাইলে ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছিল। মুনযির ঈদের সাদা পাঞ্জাবী পাজামা পরে তাঁবুময় ছুটোছুটি করছিল। ওর থেকে বড় কয়েকটি বাচ্চা ছিল, তাদের সাথে খেলছিল। গতদিনে যে মহিলারা জামরায় গিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শুনছিলাম। কেউ খুব সহজে রামী করেছেন, কেউ আবার ভীড়ে পড়েছেন। দু'একজন বলেন, ভীষণ কষ্ট হয়েছে। রাত সাড়ে তিনটায় একমি'র অফিসার শিউলী'পা জামরা থেকে এসেই ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লেন ।

বললাম, কিভাবে এসেছেন?

–হেঁটে।

–গিয়েছেন কিভাবে?

–হেঁটে। তাঁবু থেকে জামরা, তারপর মক্কা। তাওয়াফ সেরে আবার হেঁটে মিনা আসলাম। ধকলটা বেশ গেছে। আপনি?

–যাইনি এখনো। তবে যাব, মুনযিরের বাবা আসলে।

–আমাদের মত হাঁটতে যাবেন না যেন। বাচ্চা নিয়ে অসম্ভব কষ্ট হবে। গাড়িতে যতদূর যাওয়া যায়, যাবেন। আমার তো সারা শরীরে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে।

এদিকে তাঁবুর কয়েকজন বোনের সফরসঙ্গী নিখোঁজ, আরাফার দিন থেকে। তাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় সান্তনা দেয়ার মত অবস্থাও নেই। আমার হজ্জের বাকী কাজগুলো যেন আল্লাহপাক নির্বিঘ্ন করেন সেজন্য দু'য়াকে সার্বক্ষণিক সাথী করেছিলাম। নিখোঁজদের খোঁজ মিলেছিল পাঁচ দিন পর।

প্রাকটিক্যাল ফিল্ডে আল্লাহর অতিথিদের 'জিহাদ'(প্রানপণ প্রচেষ্টা) ছাড়া হজ্জের কাজগুলো সফলভাবে করা সম্ভব নয়। ঈমানের পথে মজবুত থাকার জন্য তো জিহাদের

প্রয়োজন প্রতিনিয়ত। অন্তঃস্থল থেকে যে বোধ তখন জেগেছিল তা ছিল,' সম্ভবতঃ এজন্যই "ঈমান ও জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল মাবরুর হজ্জ"। [সহীহ বুখারীঃ১৪২০] সার্বক্ষণিক সতর্কতা, চোখ কান খোলা রেখে চলা, ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি বুঝে চলা, সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্যকে সার্বক্ষণিক সাথী করে নেয়া ছাড়া হজ্জের মত সুকঠিন ইবাদাতকে সুন্দর করা কিছুতেই সম্ভব নয়।
এগারো যিলহজ্জ, যুহরের পর একসাথে জামরার পথ ধরলাম আমরা। কিছুসময় বাবার কাঁধে চেপে, কিছুসময় মামের কোলে ক্যারিয়ারে চেপে চলছে মুনযির। সাথে কোহিনূর আপা আর দিদার ভাই। সালেহ আকবর ভাই পথ দেখাচ্ছেন। বড়ভাই সকালে ডাঃ সালেহ স্যার আর খালাম্মাকে নিয়ে মক্কা গেছেন।

এখানে জালের মত বিছিয়ে আছে রাস্তা। রাস্তার পাশে মাইলস্টোন বা সনাক্তকরণ চিহ্নগুলো পথঘাট চেনাতে যথেষ্ট মনে হলনা। হাঁটাহাঁটির কষ্ট কমাতে গাড়িতে উঠলাম। যেখানে নামিয়ে দিল, সেখান থেকে হাঁটলাম আরও প্রায় এক কিলোমিটার। জামরার ভেতরে ঢুকে ভীড়ের যে প্রচন্ডতা দেখেছি তা বর্ণনাতীত। মুনযিরের আব্বু এমন ভীড় ঠেলে বাচ্চাসহ আমাকে জামরার কাছে নিয়ে যেতে কিছুতেই রাজী হননি। ভীড় কমার জন্য অপেক্ষায় থাকারও সুযোগ নেই। কেননা এখানে যত বেশী লোক অপেক্ষা করবে ভীড় ততই বাড়বে। তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে হল। জামরার ভেতরে একপাশে একটি মোটা পিলারের ধারে আমাদের রেখে পুরুষেরা রামী করতে গেলেন। ঢুকার পথের আশেপাশে অজস্র হাজী ভাই-বোন প্রশাসনিক নির্দেশ লংঘন করে বিছানা পেতে অবস্থান করছেন। এতে করে রাস্তা ব্লক হয়ে চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে, আর ভীড় বাড়ছে। আবার কোন কোন দেশের লোকেরা বড় দল বেঁধে ঝড়ের বেগে জামরায় প্রবেশ করে। তাদের দুর্দান্ত গতিকে ছাড় দিতে গিয়ে অন্যদের বিড়ম্বনা সইতে হয়। পুরুষেরা রামী করে ফিরলেন ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে। এর মধ্যেই ঐরকম এক ঝটিকা-দলের মুখোমুখি হলাম। নিজেদের ঠিক রাখতে আমি আর কোহিনূর ভাবী পিলারের সাথে সেঁটে, অন্যদিকে কাঁধের ব্যাগের support রেখে দাঁড়িয়েছি। দু'জনের মধ্যিখানে একটু ফাঁকা রেখে মুনযিরকে আগলে রাখছিলাম। ভাবীর সহযোগিতা ছিল খুবই আন্তরিক, ভুলে যাবার নয়। আল্লাহপাক তার কল্যাণ করুন।

মক্কা পৌঁছাতে আমাদের রাত হলো। 'আসর আর মাগরিব সেরেছি পথে। মক্কার বাসায় রাতের খাবার খেয়ে, ইশার নামায পড়ে তাওয়াফ করতে হারাম শরীফে গেলাম। আজকে মক্কায় ভীড় নেই একেবারেই। অনেক স্বাচ্ছন্দে কাবার আঙিনায় তাওয়াফ করলাম। বিস্ময়করভাবে ১৫/২০ মিনিটে আমাদের তাওয়াফের সাতচক্র শেষ হল। সায়ী করলাম একঘন্টায়। আজ মুনযির আমার কোলে বেবী ক্যারিয়ারে থেকেছে পুরো সময়টা। রাত দশটায় শুরু করেছি । এগারোটা ত্রিশ-এর মধ্যে শেষ হল। হজ্জের ফরয সম্পন্ন করতে পেরে হৃদয়ের ভেতর থেকে উৎসারিত হল "আল'হামদুলিল্লাহ"।

মধ্যরাতের ছোট্ট মুসাফির

মিনা যাবার জন্য ভাড়া করা গাড়িতে উঠে দেখি রাত বারোটা। এক ঘন্টার ভেতর মিনা পৌঁছলেও তাঁবুর খোঁজে গেল আরও ঘন্টাখানেক। অবশেষে রাত দুটোয় ড্রাইভার আমাদের তাঁবু থেকে বেশ দূরে এক রাস্তার পাশে নামিয়ে দিতে চাইল। ড্রাইভার বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত, দুই পুরুষ ধরে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা। ভাল আরবী বলে। বাংলা কিছু কিছু বুঝে। অনেক বুঝিয়ে তাকে সম্মত করা হলে আরও কিছুক্ষণ ড্রাইভ করল। দুটো ত্রিশ-এর দিকে জানালো সে আর পারছেনা। আমরা নিরুপায়। গাড়ি থেকে নেমে বেশ সময় ধরে হাঁটলাম। মিনায় তাঁবু হারিয়ে ফেললে খুঁজে বের করার কিছু কৌশল আছে।

ঢাকায় হজ্জ ট্রেনিং ক্যাম্পে তিতুমীর হজ্জ কাফেলা আমাদেরকে মিনার তাঁবুর একটি ম্যাপ সরবরাহ করেছিল এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখিয়েছিল যে হারানো তাঁবু কিভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। সেরকম ম্যাপ আঁকা বিশাল আকারের বোর্ড মিনার বিভিন্ন রাস্তার পাশে রয়েছে। ম্যাপ দেখে নিজ তাঁবুর নাম্বার অনুযায়ী খুঁজে বের করা খুবই সহজ–যদি তাঁবু নাম্বার জানা থকে। মিনার camp-গুলোর পাশে সুউচ্চ পিলারে প্রত্যেক তাঁবুর নাম্বার উৎকীর্ণ করা থাকে। অবস্থান স্থলটি ম্যাপ থেকে সনাক্ত করে সেখান থেকে নিজ তাঁবুর নাম্বার কোনদিকে আছে– সেই দিক নির্ণয় করে হাঁটা দিলেই তাঁবুতে পৌঁছা সম্ভব। দিক নির্ণয় করতে পারলে আর তাঁবু নাম্বার জানা থাকলে মিনায় হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। ম্যাপ বুঝতে আর দিক নির্ণয় করতে ভুল করলে উল্টো পথে হেঁটে নির্ঘাৎ তাঁবু হারানো ছাড়া উপায় নেই। এজন্য তাঁবু নাম্বার জানা থাকা খুবই জরুরী। নাম্বার জানা না থাকলে হাজার হাজার তাঁবু থেকে নিজ তাঁবু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

মিনার তাঁবুতে তাঁবু নাম্বার লিখা থাকে। মিনায় নিজ নিজ তাঁবু নাম্বার মনে রাখা এবং দূর থেকে চিনতে পারা খুবই জরুরী। অন্যথায় তাঁবু হারিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট হতে পারে।

রাস্তার পাশে বড় সাইনবোর্ডে আঁকা ম্যাপ দেখে আমরা ঐ স্থানের তাঁবু নাম্বার এবং নিজেদের তাঁবুর নাম্বারের ব্যবধান নির্ণয় করে নিয়ে পথ চলছিলাম। নানা দেশের তাঁবুর

আঙিনা মাড়িয়ে, রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করে প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর মিলে গেল তাঁবু।
মুনযির প্রায় পুরো রাস্তাটাই হেঁটে চলল। যেন মধ্য রাতের ছোট্ট মুসাফির। আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরি খেলা আর মাটিতে এক ছোট্ট অতিথির ভয়-লেশহীন দুর্বার পথচলা দেখে আমাদের বড়দের ক্লান্তি-শ্রান্তি সব মুছে গিয়েছিল।

মিনা-র জামরায় দুর্ঘটনা ঃ ১২ জানুয়ারী, ১২ যিলহজ্জ ২০০৬

যিলহজ্জের বারো তারিখ কংকর নিক্ষেপের শেষ দিন। দিনের বেলা রামী করেই মক্কা চলে যাওয়া যায়। কিন্তু কেউ এদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় কাটালে তাকে পরদিনও রামী করতে হয়। আমাদের আজই রামী করে মক্কা চলে যাবার কথা। বাদ যুহর রামী করার সময়। জামরার ভীড়ের বিষয়টি বিবেচনা করে, বেলা এগারোটার দিকে আমাকে মক্কার বাসায় পৌঁছে দিয়ে মুনযিরের আব্বু, বড়ভাই আরো অনেকেসহ মিনা গেলেন। যুহরের নামাযের পর পরই যেন কংকর মেরে ফিরে আসা যায়। কোহিনূর ভাবী ও রুমের খালাম্মারা অনেকেই আমার সাথে মক্কায় থাকলেন।

জামরায় মানবিক বিপর্যয়ের কথা বিকেলে লোকমুখে শুনেছিলাম। এরপর থেকে সময়গুলো কেটেছে আল্লাহপাকের কাছে কান্না আর দু'য়ার মধ্য দিয়ে। রুমের প্রত্যেকেই যার যার সফরসঙ্গীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন সময় পার করেছেন। রাত প্রায় আটটায় ফিরে আসলেন মুনযিরের আব্বু। নয়টার দিকে আসলেন বড়ভাই। রামী শেষ করে কেউ কাউকে খুঁজে না পেয়ে আলাদাভাবে চলে এসেছেন। শুকরিয়া করলাম, আল'হামদুলিল্লাহ।
তাদের মুখেই জামরায় প্রচন্ড ভীড়ে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা-পরবর্তী চিত্রের প্রত্যক্ষ বর্ননা শুনেছিলাম। নিয়ম ভঙ্গ করে যারা জামরার আশেপাশে বিছানা পেতে শুয়ে বসে ছিলেন, বেশী ক্ষতি হয়েছে তাদেরই। entrance এবং exit ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়েছিল। মসজিদে খায়েফে সালাতুল যুহর শেষ করে তাঁরা যখন জামরার নিকবর্তী হয়েছিলেন, তখন চলার পথের আশে-পাশে স্তুপীকৃত পরিত্যাক্ত ইহরামের কাপড়, স্যান্ডেল, চশমা, ব্যাগ-ব্যাগেজ, লন্ডভন্ড বিছানাপত্র এসব দেখেই আঁচ করা যাচ্ছিল যে সেখানে এক দুর্যোগ বয়ে গেছে। উনাদের রামীর সময়টা ছিল বেশ হালকা। কিন্তু তার সামান্য আগে, সূর্য হেলার সাথে সাথেই যারা আগেভাগে রামী করার জন্য অস্থির ও বিশৃংখল ভাবে জামরায় প্রবেশ করেছিল অথবা আগেই ওখানে এসে কংকর মারার অপেক্ষায় থেকেছিল তাদের দ্বারা পরিস্থিতি হয়েছিল খুবই ক্রাউডি আর বিপন্ন। দুর্ঘটনার পর পর পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আকস্মিকভাবে পাল্টে যায়।

সুন্নাত হল মাসজিদে খাইফে যুহরের নামায পড়ে, ধীরে-সুস্থে জামরা অভিমুখে যাওয়া। সুস্থিরতার সাথে কংকর মেরে উল্টোদিকে অর্থাৎ মক্কার দিক দিয়ে বেরিয়ে আসা। সুন্নাত অনুযায়ী ঢোকা আর বের হবার দিক ঠিক রেখে, সুস্থির মেজাজে কাজ করে এরকম

দুর্ঘটনা যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য প্রত্যেক হাজীরই দায়িত্বশীলতা থাকা দরকার। আর সুস্থিরতা ও প্রশান্ত মেজাজে থাকা তো 'হজ্জ মাবরুর' হবার জন্যও জরুরী। পরদিন পত্রিকার পাতায় শত শত হাজীর মৃত্যুর ছবিসহ খবর প্রকাশ হয়। অনিয়ন্ত্রিত ভীড়ের চাপে সৃষ্ট এ দুর্ঘটনায় ৩৪৫ জনের মৃত্যু- সংবাদ সৌদি সরকার, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং ইন্টারনেট থেকে পরে বিস্তারিত জানা গেছে। অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। বিগত ক'বছরেও জামরায় ভীড়ের চাপে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তবে এবারের সংখ্যা সর্বাধিক।

কিছুদিন পর শুনেছি, সৌদি সরকার দু'তলা জামরাকে ছয়তলা করার জন্য প্ল্যান করেছে এবং পুরানো স্থাপনা ভেঙ্গে নতুন প্রশস্ত 'ওয়ানওয়ে' জামরা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

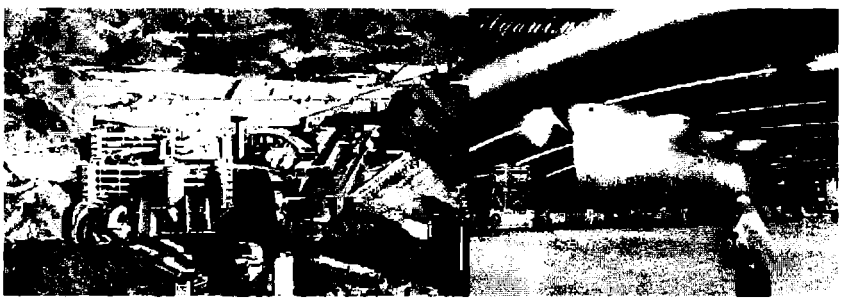

বহুতল বিশিষ্ট জামরার বর্তমান চিত্র।

পরবর্তী বছর থেকে জামরায় ভীড় নিয়ন্ত্রনের জন্য কঠোর উদ্যোগ কার্যকরী করা হয়। এখানে নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকরী থাকা খুবই জরুরী। আল্লাহর মেহমানদের জন্যও এটা শোভনীয় যে তারা আইন-শৃংখলা কঠোরভাবে মেনে চলবেন। যে কোন ধরণের emotion পরিহার করে চলবেন। জামরায় ঢুকে তাকবীর বলে নিয়মমত কংকর ছুঁড়ে বেরিয়ে আসাই ইবাদাত। ছোট ও মধ্য- এ দু'জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'য়া করার সুন্নাত পালনের জন্য দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে অন্যদের কষ্টের কারণ হওয়া বা নিজে কষ্ট পাওয়া উচিৎ নয়। ভীড় না থাকলে দু'য়ার জন্য দাঁড়ানো যায়। আর ভীড় থাকলে না দাঁড়িয়ে দু'য়া করতে করতে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। আবেগ নিয়ন্ত্রিত রেখেই চলা দরকার। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, শয়তানকে পাথর মারা হচ্ছে– বরং রামী হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মানা। এ হুকুম মানার সময় দু'ভাবে নির্ধারিতঃ উত্তম সময় আর জায়েয সময়। উত্তম সময়ে করতে অপারগ হলে জায়েয সময়ে করবে। নবীজি(সঃ) যে সময়ে করেছেন সেটা উত্তম সময়। আর যে সময় থেকে রামী করার অনুমতি দিয়েছেন, সেটা জায়েয সময়।

অনেকে ভীড়ের চাপে মারা যাওয়া সওয়াবের বিষয় বলে ভীড় এড়াতে চেষ্টা করেন না। এটা ঠিক যে নেক আমলে রত থাকা অবস্থায় মৃত্যু একটি সৌভাগ্যের মৃত্যু। কিন্তু সেজন্য কেউ নেক কাজ করতে গিয়ে নিজকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া কি আত্মহত্যার শামীল নয়? ময়দানের জিহাদে পর্যন্ত শত্রুর সামনে নিজকে

মৃত্যুর জন্য পেশ না করে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে যাওয়াই ইসলামের নীতি। একই সময়ে সকলের রামী করা জরুরী হয়ে থাকলে রাসূল(সঃ) সূর্যোদয়ের পূর্বে দুর্বলদের রামী করতে পাঠাতেন না। সুতরাং বাস্তবতার নিরিখে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। রামী কারা কখন করবে, কিভাবে করবে সেটা সহীহ হাদীস ও মাসয়ালা পড়ে আল্লাহর অতিথিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান ঠিক করে আল্লাহকে স্মরণের নিয়াত নিয়ে রামী করবেন। যারা উত্তম বা জায়েয-কোন সময়েই ফিজিক্যালি হাজির হতে অপারগ বোধ করছেন তারা কাউকে represent করবেন। ইসলাম তো সহজ করেছে, কঠিন করে নেয়া মানুষের জন্য ঠিক নয়। যিনি আল্লাহর অতিথি হচ্ছেন, আল্লাহর নির্দেশাবলী নিষ্ঠা সহকারে অথচ সহজ ও সাবলীলভাবে execute করতে পারাই তার জন্য শোভনীয়। নিজকে বা অন্যকে কষ্টে ফেলে দিয়ে কোন ইবাদাতে অধিক সওয়াব আশা করা যায়না। ভাল কাজের শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সহীহ রেখে কাজ করা পরীক্ষায় উত্তরণের উপায়।

নবী (সঃ)এর সুস্পষ্ট বাণী হলঃ *"তাওয়াফ, সায়ী, এবং রামী করা আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।" [সুনানে আবু দাউদঃ ১৬১২]*
আল্লাহপাকের কথা ঃ *"এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে তাজিম করলে তার হৃদয়ের তাকওয়ার কারণেই করে থাকে।"[সূরা হজ্জঃ৩২]* জামরায় রামী করা সহ হজ্জের প্রতিটি কাজ আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) এর নীতি অনুসরণে হজ্জের সব কাজ করলেই নিদর্শনকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া যায়।

এ ঘটনার একসপ্তাহ আগে মক্কায় হাজীদের একটি প্রাচীন আবাসিক হোটেল ধ্বসে পড়ায় ৭৬ জন মানুষের মৃত্যুর খবর তাজা থাকতেই আবার মিনায় অনিয়ন্ত্রিত ভীড়ের চাপে সাড়ে তিনশত হাজী মৃত্যুর ঘটনায় সেখানকার প্রশাসন সজাগ হয়ে উঠে এবং মক্কার সমস্ত পুরানো ভবন সিলগালা করে দেয়। অনেক বিপজ্জনক ভবন ভেঙ্গে ফেলে। আল্লাহর মেহমানদের জন্য প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যকর আবাসন নির্মান এবং হজ্জের সমস্ত কাজ আরও গতিশীলতা ও নিরাপত্তার সাথে সম্পন্ন করার ব্যবস্থাপনা সৌদি হজ্জ মন্ত্রনালয়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। হারাম এলাকার পবিত্রতা রক্ষায়, হারাম শরীফ প্রশস্ত করণ ও আধুনিকীকরণে, বিপুল সংখ্যক রাস্তা-ঘাট নির্মাণে, আল্লাহর অতিথিদের স্বাস্থ্যসেবায় তাদের অনেক ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে। তবে বিশ্বে যত আধুনিকায়ন হচ্ছে, তাদের সেবার মান বৃদ্ধির দাবী সংগত কারণেই উত্তরোত্তর বাড়ছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু না হলে ছ'তলা জামরাতেও ভীড়জনিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জামরাকে সুশৃংখল, নিরাপদ ও ভীড়মুক্ত করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সকল সুবিধাকে কাজে লাগাবার উদ্যোগ গ্রহণ করা সময়ের ঐকান্তিক দাবী। উম্মাহর এ বিশ্বজনীন সমাবেশস্থলে নিজের ভুল পদক্ষেপ দ্বারা যেন কাউকে কষ্টে পড়তে না হয় সেজন্য অতিথিদেরও সার্বক্ষণিক সচেতনতা কাম্য।
বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে মিনা ট্রাজেডির বিষয়টি নানাভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। কারণ হিসেবে যত কিছুকেই দায়ী করা হোক না কেন, উম্মাহর জন্য এতে কিছু শিক্ষাগ্রহণের

দিক অবশ্যই সুস্পষ্ট রয়েছে। মুমীনদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সংযম, শৃংখলা, আনুগত্যে নিষ্ঠা এবং উম্মাহবোধ খুবই জরুরী বিষয়। যেখানেই বিষয়গুলো উপেক্ষিত হবে সেখানেই বিপর্যয় কোন না কোন দিক থেকে ধেয়ে আসবে। আল্লাহপাক উম্মাহকে মধ্যপন্থী হয়ে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার তাওফীক দিন।

শেষের দিনগুলো

জাহিলিয়াতের যুগেও হজ্জ হত। আরাফার সীমায় অবস্থানের পরিবর্তে অন্যত্র অবস্থান করত তারা। কুরবানীর পশুর রক্ত মেখে দিত কাবাঘরের দেয়ালে। তাওয়াফ করত বিবস্ত্র অবস্থায়। আর হজ্জ সমাপন হলে মিনায় সমাবেশ করত। সেখানে পূর্বপুরুষদের স্মরণে লোকেরা কাব্য আর লোকগাথা বর্ণনা করত। প্রকাশ করত নিজেদের অহংকার, গৌরব আর বংশমর্যাদা।

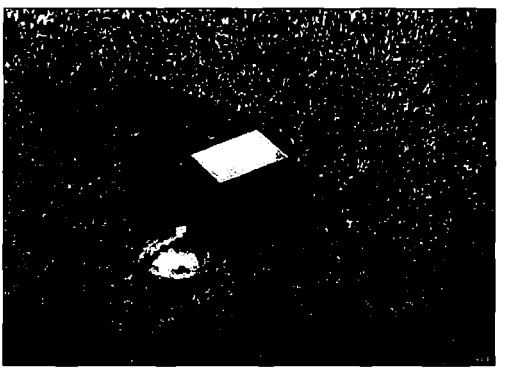

হজ্জ শেষ হলেও মুমীন ব্যক্তি কেবল আল্লাহকেই স্মরণ করবে। তারপর ফিরে যাবে বিশ্বের দেশে দেশে। কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে ছড়িয়ে দিবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দাওয়াত। আজীবন কল্যাণ চাইতে থাকবে কেবল আল্লাহর কাছেই।

বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) জাহিলিয়াতের এ সমস্ত অসার ক্রিয়াকলাপ, কুপ্রথা এবং রেওয়াজ রহিত করেছেন। এর পরিবর্তে কেবল মানবতার কল্যাণ রয়েছে এমন কার্যকলাপই হজ্জের কাজের সাথে সন্নিবেশিত করেছেন।

হজ্জ সমাপ্ত হলে একজন মুমীনের কী কাজ তা কুরআন সুস্পষ্ট করেছে।
"অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমন ভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা স্মরণ করতে পূর্বপুরুষকে; কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক অভিনিবেশ সহকারে। মানুষদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই দাও'–এদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই। আর যারা বলে, 'আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। কল্যাণ দিন আখিরাতেও। আর অগ্নিশাস্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন।'––এরা যা অর্জন করেছে তা তাদেরই প্রাপ্য।" [সূরা বাকারাঃ ২০০–২০২]

ইবরাহীম (আঃ)এর পরবর্তীকালের লোকদের আকীদা-বিশ্বাসে যেমন বিভ্রান্তি ঢুকেছিল, তেমনি বিকৃতি এসেছিল তাদের হজ্জের ক্রিয়াকলাপেও। কুর'আনুল কারীম অন্ধকার যুগের বিকৃত আকীদা ও ক্রিয়াকলাপ শুধরাবার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। নবী

মুহাম্মাদ(সঃ) তা বাস্তবে মেনে দেখিয়েছেন। যারা আল্লাহর অতিথি হতে যাচ্ছেন, তাদের অবশ্যই রাসূল(সঃ) এর হজ্জ কিরূপ ছিল, হজ্জে কী করেছেন, কী করেননি, কী নির্দেশ করেছেন আর কী নিষেধ করেছেন এসব বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করে যাওয়া প্রয়োজন।

১২ যিলহজ্জ রাতে মুনযিরের আব্বু আর ওর বড়মামা নিরাপদে জামরায় কংকর মেরে মক্কা ফিরে আসলে, হজ্জের মূল কাজ শেষ হবার স্বস্তি আমাকে ঘিরে রাখলো। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম যে তিনি এক বিরাট স্বপ্নকে বাস্তব করলেন। অত্যন্ত নিরাপদে, নির্বিঘ্নে তাঁর সাহায্য দিয়ে ঘিরে দিলেন আমার ছোট্ট শিশুকে, যে কিনা আমার হজ্জ সমাধা করার ক্ষেত্রে চিন্তার প্রধান কারণ ছিল।

১৩যিলহজ্জ, ১৩ জানুয়ারি। সকালে শুনলাম অনেকেই আজ মদীনা চলে যাবে। মুনযিরের আব্বুকে ডেকে বললাম, কোথাও রুম খালি হলে আমাদের দেয়ার জন্য সালেহ ভাইকে অনুরোধ করতে। মিনার মুক্ত প্রাঙ্গন থেকে ফিরে এসে আগের সেই বদ্ধ রুমে মুনযির আবার কান্নাকাটির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। আল'হামদুলিল্লাহ। বলার ঘন্টাখানেক পার হয়নি। মুনযিরের আব্বু এসে বললেন, "চলো, রুম মিলেছে।"

সকালের নাস্তাটা রুমমেটদের সাথে সেরে নিয়ে গোছগাছ করে ফেললাম। চলে এলাম নতুন রুমে। দু-বেডের মোটামুটি প্রশস্ত এ রুমে দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দেই কেটেছে। 'বাবা' আর 'মাম' কে একসাথে পেয়ে মুনযির তার স্বাভাবিক আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠল। এখানে নিয়মিত প্রিয় বড়মামাকে কাছে পাওয়াটা ওর জন্য ভীষন আনন্দের ছিল। দেশেও অতি ব্যস্ত মামাকে এত ঘন ঘন পাওয়া যায়না। আরেকটা মজার ব্যাপার, এ রুমের ঠিক অপজিট ডোরে মুনযির খুঁজে পেল ওর সালেহ নানুকে। মিনাতে যেভাবে নানুর হাতে ঔষধ খেয়েছে, এখানেও ঔষধ খাবার সময় হলেই দৌড়ে গিয়ে নানুকে নক্ করে মুনযির। নানু এসে ওকে ঔষধ খেতে সাহায্য করেন। ওকে সঙ্গ দেন। এই সুযোগে আমি হাতের জরুরী কাজ সেরে নেই।

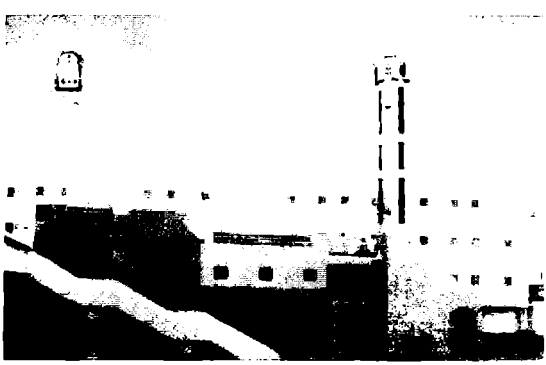

মাসজিদে জ্বীন

মুনযিরের আব্বু সময় সুযোগ করে দু'দিনে কয়েকটি জায়গা ঘুরে আসলেন। বাচ্চার কারনে আমি যেতে পারিনি। মুনযিরের আব্বুর মুখে সেসব স্থানের কথা শুনেছি। একটি হল 'মাসজিদে জ্বীন'। এ স্থানে বিপুল সংখ্যক জ্বীন কুরআনের দাওয়াত কবুল করে নবী

(সাঃ) এর নিকটে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আরেকটি স্থান হল নবীজি (সাঃ) এর গৃহ যেখানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

আরেকদিন মাসজিদে হারামের পূর্বদিকে মক্কার সবচেয়ে উঁচুভূমিতে অবস্থিত কবরস্থান 'জান্নাতুল মুয়ালা' যিয়ারত করেন। এখানেই খাদিজা (রাঃ) সহ বহু সাহাবায়ে কিরাম শায়িত আছেন।

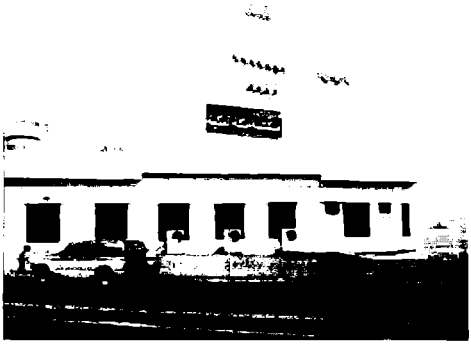

রাসূল (সঃ) এর জন্মস্থান ঃ

রাসূল (সঃ) এর জন্মস্থান মাসজিদে হারামের কাছেই। এখানে এখন পাঠাগার গড়ে তোলা হয়েছে।

আমরা ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত মক্কায় কাটিয়েছি। এ কয়েকদিন হারাম শরীফে নামাযে যেতে তেমন সমস্যা হয়নি। হজ্জ শেষে মক্কা থেকে প্রতিনিয়ত বিদায় নিচ্ছেন আল্লাহর অতিথিরা। কেউ স্বদেশে পাড়ি দিচ্ছেন, কেউবা মদীনায় যাচ্ছেন। এখন হারাম শরীফে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটালেও ভীড়ের জন্য কষ্ট পেতে হয়না। ঘরে তাঁর অতিথি হয়ে কাটাবার সময় জলদি ফুরিয়ে যাচ্ছে, ভেবে মনটা ভারী হয়ে উঠে।

আজীবন অতিথি

কাফেলা থেকে জানানো হল, সতের বা আঠার জানুয়ারি আমাদের রিটার্ন টিকিট হতে পারে। সেভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার ও প্রতিবেশীদের উপহারের জন্য নামাযে যাওয়া-আসার পথে মক্কা টাওয়ার আর মিসফালাহর আশ-পাশ থেকে কিছু কিছু করে শপিং সেরে নিলাম। দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হতেই মন বলছিল, 'আবার কখন আসব'।

মুনযিরের আব্বুকে বলেছিলাম, 'সবসময় যদি আল্লাহর অতিথি থাকতে পারতাম!'

আমার আকাংখার কথা শুনে ছোট্ট এক পকেটবুক বের করে দিলেন আমাকে, "চট্টগ্রামের বন্ধু ইউসুফ বইটি দিয়েছে। সে এখানে Job করে।" বইটির নামঃ **The Forty Makkan Narrations--Compiled by Talaal**

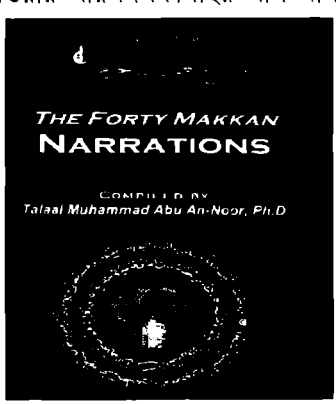

আজীবন আল্লাহর অতিথি বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়।

Muhammad. আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। বইটির 35page, 39 no Hadith.

"আবদুল্লাহ ইবন্ উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন, "তিন ধরণের লোক আল্লাহর অতিথি।

এক: যিনি জিহাদে রত। দুই: যিনি উমরায় রত। তিন: যিনি হজ্জে রত। তিনি (আল্লাহ) তাদের আহবান করেছেন আর তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে।" [সুনানে ইবন্ মাযাহ]

হাদীসটি পড়লাম। একবার নয়, বারবার। আমি বিস্ময়বোধ করছিলাম।

–'সম্ভব! আজীবন অতিথি থাকা সম্ভব!!'

–'অবাক লাগছে? Obviously, ব্যাপারটা এরকমই।'

বললাম,--'মনে হচ্ছে অনেক অনেক দামী এক সম্পদ পেয়ে গেছি।'

উনি বললেন, -'ঠিক তাই।' চট্ করে

নোটবুকে টুকে নিলেন তিনি। বাড়ি ফিরে আর্টিকেল লিখবেন। পরে লিখেছেনও।

"..... উমরাহ ও হাজ্জে রত ব্যক্তি সাময়িকভাবে আল্লাহর মেহমানের মর্যাদায় ভূষিত হন, আর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'য় রত ব্যক্তি সারাটি জীবন আল্লাহর মেহমানের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারেন যেমন নবী করিম (সঃ) ছিলেন।" *[মাসিক পৃথিবী: ডিসেম্বর ২০০৬ : আল্লাহর মেহমান–শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির]*

এক সুন্দর বোধ, এক নতুন প্রাপ্তি আমার হৃদয়কে ভরিয়ে দিল। জীবন জুড়ে এভাবে অতিথি হয়ে থাকার তাওফিক যেন তিনি দেন--এ দু'য়া আমরা আল্লাহর কাছে করলাম।

মাবরুর হজ্জ

হজ্জের পর, দু'টি বিষয়ে দু'য়া করাকে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। দু'জনেই দু'জনকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতাম। এক: মাবরুর হজ্জ, দুই:আজীবন আল্লাহর অতিথি থাকা।

সদ্য হজ্জ সমাপ্তকারী ব্যক্তির অন্তর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর নিদর্শন অবলোকনের অনুভবে থাকে সিক্ত। নরম মাটিতে বীজ উপ্ত করণের মতই ইসলামী জীবনাচরণ ভালভাবে রপ্ত করার, ঈমানের কিশলয়টি ফুলে-ফলে সুশোভিত মহীরূহে পরিণত করার স্বপ্ন তখন আঁকা হয়ে যায় মনে। হজ্জ একটি সফরের ইবাদাত। ব্যয়বহুল এবং শ্রমসাধ্য। অর্থ আর শ্রমের যোগান দিতে হয় অনেক অনেক। "মাবরুর হজ্জ" একটি ব্যাপকতর কনসেপ্ট প্রকাশ করে। শক্তি, সামর্থ আর মহিলাদের মাহরাম সঙ্গী হলেই হজ্জ ফরয হচ্ছে। সে হজ্জ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় না হলে তো তা "মাবরুর হজ্জ" হয়না।

যে হজ্জ পালনকালে কোন গুনাহের কাজ শামীল হয়নি, অশ্লীলতা ও প্রদর্শনীর মনোভাবসহ আল্লাহর নিষিদ্ধ সমস্ত কাজ পরিহার করে চলা হয়েছে এবং হজ্জ-পরবর্তী

বাকী জীবনে আল্লাহর নির্দেশ পালনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, –"মাবরুর হজ্জ" বলতে এমন হজ্জকেই বুঝায় - আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি এমাসগুলোতে হজ্জ করার নিয়ত করে তার জেনে রাখা উচিত হজ্জের সময় সে যেন দাম্পত্য সম্পর্ক, পাপকর্ম আর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর যাকিছু সৎকর্ম তোমরা কর আল্লাহ তা জানেন। হজ্জ সফরে তোমরা পাথেয় সঙ্গে নাও। আর উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। কাজেই হে বুদ্ধিমানরা আমার নাফরমানী হতে বিরত থাক।" [সূরা বাকারা আয়াত নং- ১৯৭]

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল(সঃ)কে প্রশ্ন করা হল, 'সর্বোত্তম আমল কোনটি'? তিনি জবাব দেন,"আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।" 'এরপর কোনটি?' তিনি জবাব দেন," আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" 'এরপর কোনটি?' প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন," মাবরুর হজ্জ।" [সহীহ আল বুখারীঃ ১৪২০]

আমাদের হজ্জের পর আমেরিকা থেকে আমার মেজভাই ডাঃ আলতাফ হোসেন ফোন করেছিলেন। হজ্জ শেষে আমাদের খোঁজ পেতে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। কুশলাদি জানার পর তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "হজ্জ মাবরুর"এর ব্যাপারে careful ও sincere ছিলাম তো? প্রত্যেক হজ্জকারীর কাছে এটি একটি স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

হজ্জের দিনগুলোতে যা কিছু নিষিদ্ধ সেসব কাজ থেকে বাঁচতে হলে ধৈর্য সহকারে চেষ্টা চালাতে হয়। নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট যেমন- মিথ্যা, গীবত, গর্ব-অহংকার, ঝগড়া, কটুকথা, মেজাজের ভারসাম্যহীনতা এসব অতি সতর্কতার সাথে পরিহার করতে হয়। জিহাদ বা আপ্রান চেষ্টা-সাধনা ছাড়া এটা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আর সমগ্র জীবনকে তাকওয়ার সাথে চালনা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সারাটি জীবন তাঁর নাফরমানী হতে বেঁচে থাকার সাধনাই "মাবরুর হজ্জ" এর প্রেরণা। এ প্রেরণা নিয়েই ফেরা দরকার।

হজ্জ ও জিহাদ

হজ্জের স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তা বাস্তবায়নের জন্য বিশুদ্ধ নিয়াত এবং সার্বিক প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দিতে হয়। হজ্জের ফিল্ডে যেভাবে ধৈর্যের সাথে শ্রম, বুদ্ধি ও মেধা খরচ করে কাজ করতে হয়েছে তাতে একবাক্যে জিহাদের কথাই মনে পড়ছিল আমার। আল্লাহর যে কোন হুকুমকে execute করতে যে আন্তরিক চেষ্টার প্রয়োজন পড়ে তার নামই তো জিহাদ। নারী-পুরুষ যিনিই হজ্জের উদ্দেশ্য বুঝে সঠিক পন্থায় হজ্জের কাজে পা বাড়ান, তাকে একাজের জন্য জিহাদ করতেই হয়। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি গভীর প্রত্যয় থেকে অন্তরে ঈমান তৈরী হয়। ঈমানের পরই জিহাদ নারী-পুরুষ সবার জন্য একটি মৌলিক ইবাদাত। কেননা মানুষ তার বিশ্বাস অনুযায়ী তার কর্মপ্রচেষ্টাকে সাজায়। ঈমান ছাড়া কোন আমল গ্রহণীয় নয়। আবার কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া ঈমানের বাস্তব প্রকাশ ঘটেনা। তেমনি আপ্রাণ চেষ্টা ছাড়া আল্লাহর কোন হুকুমই বাস্তবে প্রতিষ্ঠা লাভ

করা সম্ভব নয়। ঈমান আনার পর, নিজেকে গড়া হোক আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ গড়াই হোক, জিহাদই প্রধান অনুসঙ্গ হিসাবে কাজ করে।

ঈমান ও জিহাদের পর সর্বোত্তম আমল 'হজ্জে মাবরুর'। সেই হজ্জের ব্যবস্থাপনা কার্যে অংশগ্রহণের গুরুত্বও রয়েছে। যেমন, ইবনে উমার(রাঃ) বলেন, হাজীদের পানি সরবরাহের প্রয়োজনে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটাবার জন্য আব্বাস (রাঃ) নবীজি (সঃ)এর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। [সহীহ বুখারী:১৬২৩]

"তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো আর মাসজিদে হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সওয়াবের অনুরূপ মনে কর..." এরকম আরও অনেক আয়াত অবতরণের ঘটনার সাক্ষ্যবাহী নবী (সঃ)-এর মিম্বার।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, একদিন জুম'য়ার নামাযের পর নবীজি (সঃ) কে তাঁর মিম্বারের পাশে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঈমান গ্রহনের পর হাজীদের পানি পান করানো অধিক মর্যাদার কাজ, নাকি আল্লাহর পথে জিহাদ করা? সাহাবাদের এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আয়াত নাযিল হয়,

"হাজীদের পানি সরবরাহ করা এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের সওয়াবের অনুরূপ মনে কর, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? এরা উভয়ে সমান নয়।" [সূরা তাওবাহ: ১৯]

ঈমান গ্রহণের পর জিহাদ, মাবরুর হজ্জ ও হজ্জ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ--এ কাজ গুলোর প্রত্যেকটির মর্যাদা ধারাবাহিকভাবে আল্লাহপাক নিজেই ঘোষনা করেছেন।

হজ্জ মাবরুর হতে হলে, হজ্জ পালনকালে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে জিহাদ করেই বাঁচতে হয়। আর হজ্জ পরবর্তী জীবনকে পছন্দের মানে সাজাতে হলেও জিহাদের বিকল্প নেই। হজ্জ জীবনে একবার ফরয। জিহাদ ফরয জীবনভর। মৃত্যুর আগ পর্যন্তই।

নারী ও হজ্জ

নারীর জীবনে হজ্জের গুরুত্ব এবং কল্যাণ কতো যে ব্যাপক, একজন নারী হিসেবে হজ্জের ময়দানে উপনীত হবার পরই তা আমার বোধগম্য হয়েছে। এ ব্যাপকতা ভাষায়

প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। যে প্রেরণা পুষ্পিত হয়েছে তার সুবাস ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছি মাত্র।

হজ্জে নারীর পোশাক, পুরুষের চেয়ে একেবারেই আলাদা। মাহরাম পুরুষ সঙ্গী থাকা নারীদের জন্য জরুরী। পুরুষগণ তালবিয়া পড়বেন সশব্দে আর নারীরা নিঃশব্দে। নারীদের তাওয়াফ এবং সায়ীতে পুরুষদের মত দৌড়ানো নেই। চুল কাটা আছে, কিন্তু মাথা মুন্ডন করা নেই। এছাড়া, আর সবই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই রকম। স্বামী-সন্তান বেষ্টিত পারিবারিক অঙ্গনটিকে আল্লাহর নির্দেশমত চালাবার বেলায় তো চব্বিশ ঘন্টাই একজন নারীকে দৃঢ়তার সাথে জিহাদ করতে হয়, যেটা উপার্জনমূলক কাজের দায়িত্বশীল পিতার পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব নয়। আবার নিজ পরিমন্ডলে দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের জিহাদ, ন্যায়ের আদেশ আর অন্যায় কাজে নিষেধের জিহাদ নারী-পুরুষ সবারই জন্য এক রকম। জামায়াতে নামাযের বেলায়, যুদ্ধের ময়দানে জিহাদের বেলায় তা থেকে নারীদের অব্যাহতি রয়েছে যেমন অব্যাহতি রয়েছে রুটি-রুজির ময়দানে জিহাদের বেলায়। কোন মহিলার যদি রুটি-রুজির ময়দানের কাজে যোগ দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে পর্দার সীমায় থেকে তাও তিনি পারবেন। অবশ্য তা নিজ পারিবারিক অংগনের দায়িত্বকে উপেক্ষা করে নয়।

রাসূল(সঃ) ময়দানে জিহাদ করার কোন সাধারণ নির্দেশ নারীদের দেননি। এজন্য আমরা দেখি যুদ্ধের ময়দানে কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবী যুদ্ধাহতদের পানি পান করানো ও সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নবীজি তাদের নিষেধও করেননি। অপরাপর নারীরা অক্ষম, বৃদ্ধ, শিশুদের পরিচর্যা এবং বাড়িঘরের তদারকীতে নিয়োজিত থাকতেন। অথচ নারীদের জন্য হজ্জকে রাসূল(সঃ) সর্বোত্তম জিহাদ বলেছেন।

আয়িশা(রাঃ) প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহর রাসূল(সঃ), জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম আমল বলে জানি। আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবোনা?" রাসূল(সঃ) বলেন,"তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল,'হজ্জে মাবরুর'।" [সহীহ বুখারী:১৪২১]

অপর এক বর্ণনা এরকম: আয়িশা(রাঃ) থেকে বর্ণিত। "আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মহিলাদের উপর কি জিহাদ ফরয?" তিনি বলেন "হ্যাঁ, তবে সেই জিহাদে লড়াই নেই। তা হলো হজ্জও উমরাহ।" [সুনানে ইবনে মাযাহ]

হজ্জে একজন নারী তার সফরসঙ্গীর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে এক কল্যাণময় অনুগত জীবন যাপনের অভ্যাস তৈরী করেন সেটা যত কষ্টকরই হোক। সফরের জটিল বিষয়ে মহিলারা সময়োপযোগী পরামর্শদানের মাধ্যমে সফরসঙ্গীকে সহায়তাও করতে পারেন। উম্মুল মুমিনীনরা এমনই করেছেন। বিদায় হজ্জের চার বছর আগে উমরাহর লক্ষ্যে সফরকালে হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেলা বাধাগ্রস্ত হলে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রাঃ) এর সুন্দর পরামর্শ নবী (সঃ) কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছে। পরবর্তীতে আল্লাহপাক এ সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে ঘোষনা করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাটিকে ইতিহাসে 'এক রক্তপাতহীন বিজয়' বলা হয়েছে যা একজন ইহরামকারী নারীর তাঁর সফরসংগীকে [স্বয়ং আল্লাহর রাসূল(সঃ)কে] উত্তম পরামর্শদানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় অবিশ্রান্ত সফরে নারীর শারিরীকভাবে কাতর হওয়া সত্ত্বেও

পেরেশানী প্রকাশ না করে ধৈর্যশীল আচরণে, সংযত জীবন যাপনে, নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করায় চূড়ান্ত মাপের জিহাদ করতে হয়। নিজের এবং সঙ্গীর হজ্জকে সুন্দর করার ব্যাপারেও একজন নারীর motivation সৃষ্টির সুযোগ ও দায়িত্ব রয়েছে।

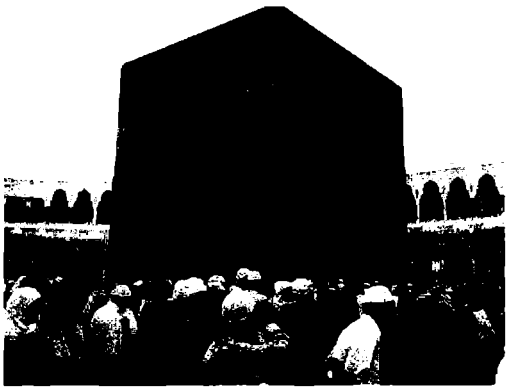

হজ্জে নারীর পোশাক, পুরুষের চেয়ে একেবারেই আলাদা। মাহরাম পুরুষ সঙ্গী থাকা নারীদের জন্য ফরয। নারীদের তাওয়াফ এবং সায়ীতে পুরুষদের মত রমল বা দৌড়ানো নেই।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে তিনি [আয়িশা (রাঃ)] বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), আমরা মেয়েরা কি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবনা?' নবী (সঃ) বলেন, "তোমাদের জন্য সবচাইতে সুন্দর ও উত্তম জিহাদ হল মাবরুর হজ্জ।" আয়িশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর মুখে একথা শোনার পর থেকে আমি কখনো হজ্জ করা বাদ দেইনি।' [সহীহ বুখারী ঃ১৭২৬]

অপরদিকে, আয়িশা (রাঃ) অনেকগুলো যুদ্ধে নবীজি (সঃ)এর সাথেও অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর সকল প্রান্তের মহিলাদের জন্য এটা বাস্তব নয় যে, প্রতিবারই তিনি হজ্জ করতে পারবেন। কারো কারো পক্ষে জীবনে একবার হজ্জ করাও সম্ভব না হতে পারে। তবে এটা বাস্তব যে নিজ অংগনে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় রত থাকতে পারবেন আজীবন। একজন নারী কন্যা, বোন, স্ত্রী, ভাবী, মা, খালা, ফুফু, চাচী, মামী, দাদী, নানী যখন যে অবস্থায় উপনীত হন, সে অবস্থায়ই নিজ পরিমন্ডলে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় ভূমিকা রাখতে পারেন। হজ্জ দ্বীন-ইসলামের একটি অন্যতম ভিত্তি বা খুঁটি। ঘরকে সোজা রাখতে খুঁটি সাহায্য করে। কিন্তু পরিপূর্ণ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন প্রচেষ্টার জিহাদ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন মুসলমান নারী-পুরুষ উভয় ব্যক্তির জন্যই আবশ্যকীয়। আর সেই সামগ্রিক জিহাদের উপযুক্ত training নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রত্যেক মুসলমান পেতে পারেন। এ কারণে হজ্জ গোটা উম্মাহর শক্তি ও সামর্থবান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একটি mass motivation হিসেবে কাজ করে।

মূলতঃ হজ্জ ও উমরাহর গুরুত্ব নারীদের জীবনে কতটা, তা প্রকাশিত হয়েছে নীচে উদ্ধৃত রাসূল (সঃ)-এর বাণীতেঃ

"কোন নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না। কোন মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার গৃহে প্রবেশ না করে।" একথা শোনার পর একব্যক্তি দাঁড়িয়ে

বলল, 'হে রাসূল(সঃ), জিহাদের ময়দানে যাবার জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। অথচ আমার স্ত্রী হজ্জে যাবার সংকল্প করেছে।' রাসূল(সঃ) বলেন, "তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে যাও।"[সহীহ বুখারী:১৭২৭]

হজ্জের এত গুরুত্ব সত্ত্বেও বহু সামর্থবান ও সুস্থ মহিলা নানা অজুহাতে হজ্জের সফর বিলম্বিত করতে থাকেন। এ অবস্থায় অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকের মৃত্যু এসে যায়। তাই যে মহিলা হজ্জ করেছেন বা যে মহিলা হজ্জ করতে যাচ্ছেন, তাঁর শুকরিয়া করা দরকার। আমার মনে হলো ঈমানের সাথে জিহাদের গুরুত্ব যিনি উপলব্ধি করেছেন, হজ্জে আল্লাহর অতিথি হবার পর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদের মাধ্যমে আজীবন অতিথি থাকার প্রেরণাই তিনি লাভ করবেন।

হজ্জের পর চল্লিশ দিন, নাকি আজীবন?

কথাটি শুনেছিলাম সহযাত্রী বোনদের কারো কারো মুখে। হজ্জের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত হজ্জের শিক্ষা মেনে চলার একটি রেওয়াজ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এসময়ে পুরুষেরা মাথায় টুপি পরেন, মহিলারা ফুলহাতা জামা, মাথায় স্কার্ফ বা উড়না পিনআপ করে নেন, অন্য পুরুষের সামনে যান না বা দেখা করেন না, সাজসজ্জা করেন না, নাটক-সিনেমা দেখেন না, শপিং-এ যান না এবং এই চল্লিশ দিন ঘরে অবস্থান করাকে তারা খুবই উত্তম মনে করেন। এটাকে তারা 'হজ্জ ধরে রাখা' বলেন। অনেকে এ রেওয়াজ পালনের চল্লিশ দিন পার হবার পর ধীরে ধীরে ছাড় দিতে থাকেন। কারও নামাযে এবং পর্দায় শৈথিল্য প্রকাশ পায়। কেউ কেউ এতই ছাড় দেন যে, তিনি যে মুসলমান, তিনি যে হজ্জ করেছেন তার কোন নমুনা পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকেনা। এত বিপুল অর্থ ও বিশাল শ্রমসাধ্য ইবাদাত যিনি কেবল আল্লাহর খুশীর জন্যই করেছেন তিনি কি কখনো এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন? আমি কুরআনে বা হাদীসে 'হজ্জ ধরে রাখা' বিষয়ে কোন Reference তালাশ করে পাইনি। সাহাবীদের জীবনেও এরকম কাজের দৃষ্টান্ত নেই। পবিত্র কুরআ'নে আল্লাহ ঘোষনা করেন,

"আল্লাহ তো কেবলমাত্র তাদের কাজকেই কবুল করেন, যারা মুত্তাকী।" [সূরা মায়িদাহঃ২৭]

জীবনের সব পাপ মাফ করিয়ে নেয়ার জন্য হজ্জকে জীবনের প্রান্তিক ইবাদাত হিসেবে রেখে দেয়ার যেমন কোন মূল্য বা যৌক্তিকতা নেই তেমনি, হজ্জ করার পরও আল্লাহর অপ্রিয় কাজে নিজকে জড়িত রাখা হজ্জের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের ব্যর্থতাকেই চিহ্নিত করে।

হজ্জে গিয়ে আল্লাহর অতিথি হবার বিরল সৌভাগ্য যিনি লাভ করেছেন, তিনি বাকী জীবনের পুরোটাই 'আল্লাহর অতিথি'র মর্যাদায় কাটাতে চাইবেন আর মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য 'জান্নাতের অতিথি' হবার আকাংখা পোষণ করবেন এটাই স্বাভাবিক।

নিত্য বিরাজমান আল্লাহ মানুষের সম্পূর্ন জীবনেরই মালিক--কোন খন্ডিতকালের নয়। তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকার দায়িত্ব মানুষের আমৃত্যু। কাজেই হজ্জের মত একটি কল্যাণকর প্রতিশ্রুতিশীল কর্মকান্ডে নিজ অর্থ ও শ্রম নিয়োগ করার পর প্রকৃত মুত্তাকী

ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্তই অনুগত মুসলিম হয়ে জীবনযাপন করবেন এবং সতর্ক থাকবেন যাতে তার সৎকাজ ব্যর্থ না হয়। তাঁর পথে চলাকে জীবনের একক উদ্দেশ্য করে নেয়া তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতারই বাস্তব রূপ। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিশেষভাবে হজ্জ ধরে রাখার ব্যাপারে কুরআন বা হাদীসে কোন দলীল নেই বলে এ প্রথা অনুসরণে আমাদের কোন কল্যাণও নেই। সদ্য হজ্জ সমাপনকারী ব্যক্তির প্রতি নবী (সঃ) এরকম দু'য়া করতেন বলে আবু হুরাইরা (রাঃ)এর এক বর্ণনায় এসেছেঃ 'হে আল্লাহ, আপনি হজ্জ সম্পন্নকারীদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে মাফ করে দিন যাদের জন্য হাজীরা মাফ চান।' [ফিকহুল ইবাদাত, ইসলামে হজ্জ ও ওমরা পৃঃ ৫১২]

হাদীসে আরও উল্লিখিত রয়েছেঃ হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তুমি কোন হজ্জ ফেরত ব্যক্তির সাক্ষাত পাবে--তার ঘরে ফেরার পূর্বে, তাকে সালাম জানাবে, মুসাফাহ করে তাকে অনুরোধ করবে যেন তোমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান। কেননা হজ্জকারী হলেন গুনাহ মাফকৃত ব্যক্তি।" [মুসনাদে আহমাদ]

এ হাদীসে হজ্জ সমাপনকারীকে গুনাহ ক্ষমাকৃত বলা হয়েছে। কিন্তু বাড়ী ফেরার পর তিনি আল্লাহর অননুমোদিত কাজে জড়িত হলে (চল্লিশ দিনের মাঝে হোক বা তার পরেই হোক) নতুন করেই গুনাহ অর্জনকারী হলেন, যতক্ষণ না তাওবা করে নিজকে সংশোধন করছেন। হজ্জ অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে। কিন্তু, আগামীর গুনাহ মাফ করে এরকম কথা বলা হয়নি।

আখিরাত হচ্ছে মানুষের প্রত্যেকটি ভাল ও মন্দ কাজের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের সময়। এ কারণে হজ্জ সুসম্পন্ন করার পর মনে করা দরকার যে, আল্লাহর আতিথেয়তার সোপানে আরোহণ করা হল মাত্র; চূড়ান্ত আতিথেয়তার মঞ্জিল এখনও অ-নে-ক দূরে।

তাওয়াফে বিদা

১৬ জানুয়ারী আমরা খবরটা পেলাম। ১৭ জানুয়ারী, ১৭ যিলহজ্জ মধ্যরাতে আমাদের ফ্লাইট। গালফ এয়ারের জেদ্দা–বাহরাইন–ঢাকা রুটে। মাঝে ট্রানজিট থাকায় সফরটা লম্বা হবে মনে হল। ছোট শিশু নিয়ে লম্বা সফরের প্রাক্কালে একটা ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। আগেভাগেই বিদায়ী তাওয়াফ করতে গেলাম। কেননা এটাই আমাদের বিদায়-প্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন দিক। সুস্থিরভাবে তাওয়াফ সম্পন্ন করার জন্যে ১৭ তারিখ সকালে চলে গেলাম হারাম শরীফে। অনেকের ধারণা, বিদায়ী তাওয়াফের পরে মক্কায় কোন কাজ না করে তাড়াতাড়ি বিদায় হতে হয়। এ ধরণের দ্রুত প্রস্থানের কোন কল্যাণ বা মর্যাদা আমার জানা নেই। তবে যে কোন ইবাদাতের শেষ পর্যন্ত সুস্থিরতা বজায় রাখা ঐ ইবাদাতের সৌন্দর্য। ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সৌন্দর্য ও সৌজন্য শিক্ষা দিয়েছে, বিদায়ী তাওয়াফ তারই reflection. রাসূল (সঃ) নিজে বিদায়ী তাওয়াফ করার পর বলেছেন, "বাইতুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাৎ না করে তোমাদের কেউ যেন না যায়।" [সহীহ মুসলিমঃ ২৩৫০]

তিনি আব্বাস (রাঃ)কে বলেন, "লোকদের বলো, তাদের হজ্জে যেন শেষ কাজ হয় বাইতুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ।" [সহীহ মুসলিমঃ ২৩৫১]
কিছুদিনের জন্য আল্লাহর অতিথি হয়ে তাঁর ঘরের সান্নিধ্যে কাটালাম। তাঁর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলাম। তাঁর বিশাল ক্ষমায় ঘেরা আরাফায় অবস্থান করলাম। দু'য়া কবুলের স্থানগুলোতে অবারিত কল্যাণ-ধারায় অবগাহনের সুযোগ দেয়া হল। এখন বিদায় কালীন ইবাদাত। বিদায়ী তাওয়াফ যেন আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে আজীবন মেনে চলার এক অশ্রুরুদ্ধ শপথ।

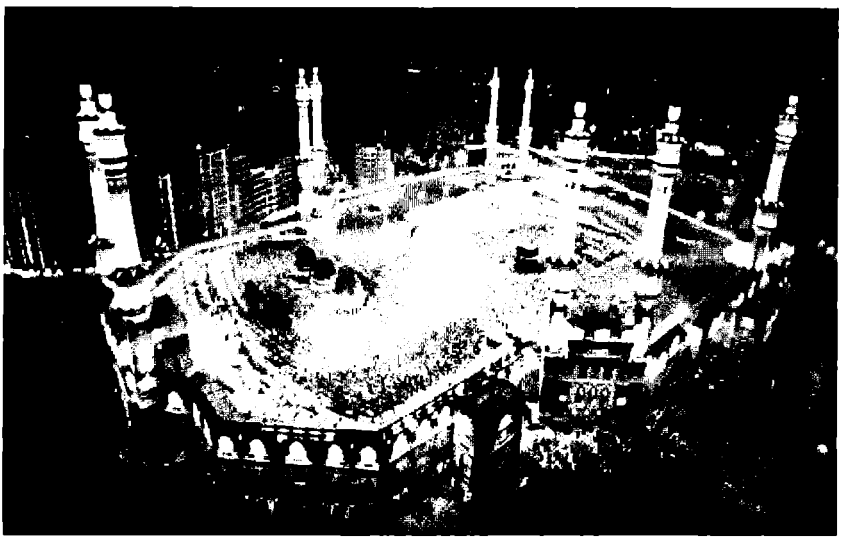

হৃদয়াভ্যন্তরে, আল্লাহর ঘরে সশরীরে তাওয়াফ ও কিয়াম করার যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি আঁকা হয়ে যায়, তা আল্লাহর অতিথিদের সারাটা জীবনকে এ ঘরের রবের হুকুমকে ঘিরেই আবর্তিত হতে সহায়তা করে।

সাতচক্র তাওয়াফ মনে হল ঝটিতি শেষ হয়ে গেল। বিদায়ী তাওয়াফের পর সায়ী নেই। যমযমের পানি আকণ্ঠ পান করে সালাতের জন্য মাকামে ইবরাহীমের কাছে উপনীত হলাম। "রাব্বী জা'য়ালনী মুক্বীমাস সালাতি..... হে আমার রব! আমাকে সালাত-কায়েমকারী করুন। আমার প্রজন্মকেও। হে আমাদের রব! আমাদের দু'য়া কবুল করুন। হে আমাদের রব! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার আব্বা-আম্মাকে আর সমস্ত মুমীনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।" [সূরা ইবরাহীমঃ ৪০, ৪১]

দু'য়াটি করেছিলেন যুগান্তকারী নবী ইবরাহীম (আঃ)। এ দু'য়া আমরাও করলাম। শত প্রতিকূলতা জয় করে যিনি এ শ্রম বিনিয়োগ করার তাওফীক দিলেন, সেই আল্লাহর কাছে ভয় ও আশা মিশ্রিত মনে দু'য়া করতে থাকলাম– যেন এ হজ্জ মাবরুর হিসেবে তিনি কবুল করেন।

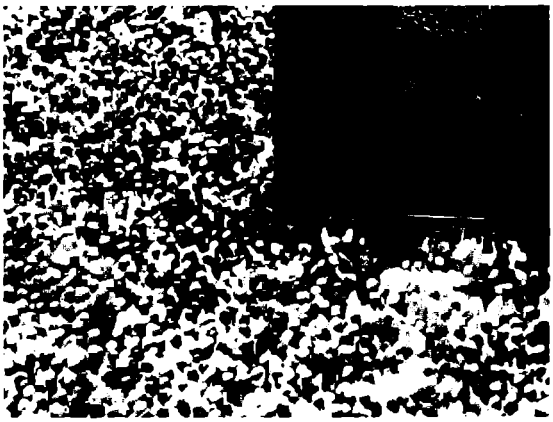

একজন মুমীন তাঁর গোটা জীবনকে, জীবনের সকল চেষ্টা-সাধনা, সকল সুকৃতি, ত্যাগ নিবেদিত করে একমাত্র আল্লাহর জন্য। আল্লাহর অতিথি হয়ে এই আত্মনিবেদনকে অনুভব করা যায় নিবিড়ভাবে।

এক অনাবিল আনন্দঘন বিদায়। তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহ, দান, নিদর্শন ও সাহায্য প্রত্যক্ষ করার পরে বান্দার অন্তর কি করে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হতে পারে? physically কাবা ছেড়ে যাচ্ছি। কিন্তু হৃদয়াভ্যন্তরে, আল্লাহর ঘরে সশরীরে তাওয়াফ ও কিয়াম করার যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি আঁকা হয়ে গেল, তা আমার সারাটা জীবনকে এ ঘরের রবের হুকুমকে ঘিরেই আবর্তিত হতে সহায়তা করবে ইনশাল্লাহ। সফরের কষ্টে, নিজের এবং শিশুর অসুস্থতায়, শিশুর সহজাত চঞ্চলতায়, অনেকের সাথে শেয়ার করে দিনযাপনের অভিজ্ঞতায়, আমার সফরসঙ্গীর আনুগত্য ও মেজাজের ওজন বুঝে চলায় সহনশীলতার এক সবক মিলে যাওয়া ছিল আমার অনেক বড় প্রাপ্তি। মুমীন ব্যক্তির আনুগত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। কাবাঘরকে তিনিই পৃথিবীর কেন্দ্র নির্ধারণ করেছেন। তিনিই মানব জাতিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কাজেই বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই ছড়িয়ে পড়ুক না কেন, যে সভ্যতা বা সংস্কৃতির টাচেই সে আসুকনা কেন, হজ্জ করার আগেও মুমীন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয় কাবার রবকে ঘিরেই। হজ্জ করার পর তা হয়ে উঠে আরও প্রাণবন্ত ও রবের নিয়ামাত প্রত্যক্ষদর্শণের কৃতজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এই এক কেন্দ্রমুখিতা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। কেন্দ্রকে ঘিরেই তো আমি আছি। তাই চলে আসার মুহূর্তেও মনে হচ্ছিলনা যে আমি বিদায় নিচ্ছি। তবুও দু'চোখে অবিরল ধারা যেন গতি পেয়েছিল। পরিতৃপ্তির, আনন্দের এবং প্রত্যয়ের। এ ছিল পিতা ইবরাহীম(আঃ) ও নেতা হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর ভালবাসায়, অনুসরণে, আত্মসমর্পিত এক প্রজন্মের ইতিহাস নির্মাণ করার অঙ্গীকার।

ঘরে ফেরার পালা

রাত দু'টোয় ফ্লাইট। জেদ্দা এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং রাত বারটায়। আটটায় আমরা রেডি। আগের বাসা দারসিন্দি-১ এর রুমমেটদের সাথে দেখা করে এলাম। কোহিনূর ভাবীকে বললাম, "আপনি অনেক হেল্প করেছেন। জাযাকাল্লাহ।"

–"আর আমিতো আপন জনের সাহচর্য পেয়েছি। কখনও ভুলবনা। ইকবাল ভাই আর শোয়েব ভাইয়ের সহযোগিতা যে কত কঠিন কাজকে সহজ করেছে–সেটা না বললেই নয়।"

–" আল্লাহর সাহায্য মুমীনরা এভাবেই পেয়ে থাকেন। আপনি দু'য়া করবেন।"

যেখানে যেখানে লাগেজ ছিল সব নামিয়ে আনা হল। বড়ভাই আগেই এসে মুনযিরের আব্বুকে সব কিছু নামাতে সাহায্য করলেন। ইশার নামাযের পর কিছু মুখে দিয়েই বাসা থেকে নেমে এলাম। রাস্তায় ভাইয়েরা কয়েকজন আমাদের বিদায় জানাবার অপেক্ষায়। হোটেল থেকে বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিস পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার পায়ে হাঁটা পথ। লাগেজ ভর্তি অ্যারাবিয়াগুলো ভাগাভাগি করে কয়েকজনে টেনে এনেছেন। আজকের পথটা মুনযির খুব খুশীমনে মামার কোলে চড়ে এসেছে। বড়ভাই আর কয়েকজন দ্বীনিভাই গাড়ি ছেড়ে আসার আগ পর্যন্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছিলেন। এজেন্সীর মাশরুর ভাই, বাকী ভাই, মুনযিরের আব্বুর ঘনিষ্ঠ পরিচিত দ্বীনিভাই ইউসুফ, আরটিভির মক্কাস্থ সাংবাদিক ভাই হাজিনুর রহমান শাহীন মক্কার দিনগুলোতে বিদায়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, কখনও ভুলবার নয়। আল্লাহ তাদের জাযা দিন।

রাত দশটায় জেদ্দাগামী মাইক্রোবাসে উঠার একঘন্টা পরও গাড়ি স্টার্ট দিলনা। বুঝলাম, পরীক্ষা শেষ হয়নি। বাড়ী পৌঁছা পর্যন্তই যেমন আল্লাহর অতিথি, সফরকালীন কষ্টের পরীক্ষাও চলবে সে পর্যন্ত। মনকে তৈরী করে নিলাম। অনেক বিলম্বের পর রাত বারটায় গাড়ি ছাড়ল। পরে জেনেছি, কয়েকজন গিয়েছিলেন বিদায়ী তাওয়াফে। তাদের অপেক্ষায় এ বিলম্ব। এজন্য আগেভাগে বিদায়ী তাওয়াফ সেরে নিলেই ভালো হয়। অনেক দ্রুত গাড়ি চালিয়েও জেদ্দা পৌঁছুতে রাত দু'টো পাঁচ বেজে গেল। কর্তব্যরত বিমান অফিসার জানালেন, মাত্র পাঁচ মিনিট আগে গালফের বাহরাইনগামী প্লেন ফ্লাই করেছে। আমরা তাকে অনুরোধ করলাম, গালফের next ফ্লাইটে যেন আমাদের এ বিশজনের সিট বুক করা হয়। কাল ১৮জানুয়ারী সকাল নয়টায় পরবর্তী ফ্লাইট, তিনি জানালেন। কাজেই, সকালে রিপোর্ট করলেই হবে।

লোহিত সাগরের তীরবর্তী শহর জেদ্দা। মক্কার চেয়ে শীত অনুভূত হচ্ছে বেশী। অনেকে নিচে ফ্লোরিং করে কম্বল মুড়ে ঘুমুচ্ছে। মুযদালিফার রাতের কথা মনে হল। কিন্তু এটা মুযদালিফা নয়, আজ সেই রাতও নয়। কাজেই, বিমান বন্দরের আধখোলা ছাতার মত ছাদের নিচে চেয়ারে বসে প্রচন্ড শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করে এখানে আমরা রাতটা কাটিয়ে দিলাম। বুকের উপর মুনযিরকে ঘুম পাড়িয়ে শাল দিয়ে জড়িয়ে দিয়েছিলাম

যাতে সে নিরাপদে ঘুমাতে পারে। হালকা ঝিমুনির তালে তালে ভোর ছ'টা বাজলো। মুনযিরের আব্বু নামায সেরে মুনযিরকে নিলে আমার নামায আদায়ের সুযোগ হল।

সকালে জানা গেল নয়টার প্লেন টাইম শিডিউল বদলে বারটার পর করেছে। এগারটায় রিপোর্ট করা হলো। বারটা ত্রিশ -এর দিকে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করে দুপুর দু'টোয় আমরা প্লেনে উঠি। বিকেল পাঁচটায় বাহরাইন পৌছে শুনি পাঁচ ঘন্টার ট্রানজিট। কিন্তু পরে সেটা দাঁড়ায় দশ ঘন্টায়। সময়টা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে, দাঁড়িয়ে কষ্ট করেই কাটাতে হয়েছে, কোন বিকল্প নেই।

সন্ধ্যায় গালফ পরিবেশিত ডিনারের পর বাহরাইন এয়ারপোর্টের ভেতরটা ঘুরে দেখলাম। আরব্য রজনীর প্রাচীন রহস্যময়তা আর আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটেছে এর ডেকোরেশনে। তবে অবিশ্রান্ত পথচলায় তখন আর কিছুই ভাল লাগছিল না। ইশার নামাযের পর মুনযির ঘুমিয়ে গেলে সিটের উপর শুইয়ে দিয়েছিলাম। অসম্ভব ঘুম আর ক্লান্তিতে লাউঞ্জের সিটের ওপর নেতিয়ে পড়লেন ওর বাবাও। ঘুমন্ত শিশু আর লাগেজের পাহারায় নিজেকে নির্ঘুম রাখার তাগিদে বারবার চোখে পানি দিয়ে সময়টা পার করছিলাম। একসময় তাতেও আর পারছি না দেখে মুনযিরকে কোলে নিয়ে চোখ বুঁজে রইলাম।

১৯ জানুয়ারী, রাত আড়াইটায় বাংলাদেশগামী প্লেনে উঠি। অ্যারাইভাল টাইম বাংলাদেশ সময় সকাল আটটায়। ফযরের নামায প্লেনের সিটেই পড়া হল। সকালের নাস্তা সারতেই প্রায় সাতটা বাজল। কর্তৃপক্ষ জানালেন, প্রচন্ড কুয়াশা থাকায় প্লেন যথাসময়ে ল্যান্ড করছে না। কতটা বিলম্ব হবে তা তারা বলতে পারলেন না।

মুনযিরের আব্বু সার্বিক অব্যবস্থাপনায় ভীষণ রকম মর্মাহত। অথচ প্রচুর পরিশ্রমেও মুষড়ে পড়েন না তিনি। আমি সান্তনার ভাষা খুঁজতে থাকলাম। বেশীদূর যেতে হয়নি। অনুপ্রেরণার নির্ঝর প্রবহমান হলো আমার ভেতরে। মনে পড়ল: "হজ্জ ও উমরাহকারী ব্যক্তি (নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্তই) আল্লাহর অতিথি। সে তার মেযবান আল্লাহর কাছে দু'য়া করলে তিনি তা কবুল করেন। সে মাগফিরাত চাইলে মঞ্জুর করেন।" [সুনানে ইবনে মাযাহ]

মুনযিরের আব্বুকে শোনালাম সেকথা। "যতই এগিয়ে যাচ্ছি, দু'য়া কবুলের সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।" স্মরণ করে দু'য়ায় মগ্ন হয়ে গেলাম দু'জনেই। হৃদয়ের গভীর থেকে হাজারো চাওয়া নিবেদিত হতে থাকল। আর জোড়া জোড়া সিক্ত ফোটায় সমস্ত কষ্ট মুছে যেতে লাগল। সুগভীর উৎকণ্ঠা আর একবুক আশাভরে চাইলাম, আখিরাতের জীবনে যেন তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করে তাঁর অতিথির মর্যাদায় গ্রহণ করেন।
সকাল ১০.৩০ [দশটা ত্রিশ]। ১৯ জানুয়ারী ২০০৬। প্লেনের জানালায় বাংলাদেশের অতি চেনা সবুজ দিগন্তরেখা ফুটে উঠেছে। মনে হল যুগ-যুগান্তরের বঞ্চিত এ জনপদের চৌদ্দ কোটি জোড়া চোখ চারিদিক হতে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর সাহায্যের প্রতীক্ষায়

আকাশের জানালায় দৃষ্টি মেলে আছে। সহসা আমার দৃষ্টিপথে দুলে উঠল আমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকা আমাদের আগামী প্রজন্মের মুখগুলো। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের প্রত্যাশার আলো চোখের তারায় ঝিলিক দিতেই অনুভব করলাম, প্লেন আমার জন্মভূমির মাটি ছুঁয়েছে।

মানুষের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে কিছু না কিছু প্রেরণা থাকে। যে কোন ভাল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতে মুক্তির নিয়াতে না করলে তা যত ভালই হোক, নেক-আমল হিসেবে কবুল হয়না। কাজেই হজ্জ-উত্তর জীবনটাকে যেভাবে পরিচলিত করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব, আমাদের প্রত্যাশা কেবল তা-ই হওয়া দরকার। আর চুড়ান্ত প্রাপ্তি তো রয়েছে আখিরাতে, মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে।
হজ্জ থেকে আমরা কী পেলাম, এ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু মা-বোনের হজ্জের অনুভূতি সংকলিত করার প্রয়াসে যাদের মুখোমুখি হয়েছিলাম, যা পরিশিষ্ট-১ এ তুলে ধরেছি, তা আগামী প্রজন্মের আখিরাতে মুক্তির দিগন্তকে উন্মোচিত করুক।

বায়তুল্লায় আবার ফিরে আসবো, এ স্বপ্ন বুকে নিয়ে উচাটন মনে জন্মভূমির উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করেন আল্লাহর অতিথিরা।

পরিশিষ্ট - ১

কেস স্টাডি ঃ কিছু অনুপম অনুভূতি

ডাঃ খালেদা নাসরীন মণি
চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন,
ভিশন আই হসপিটাল, ঢাকা।

হজ্জ আমরণ মুমীনের তাকওয়ার এক উৎস নদী। এটি আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের একটি আদেশ যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। যে কল্যাণের শুরু আছে শেষ নেই। এটি এমন এক ইবাদাত যার সুদূরপ্রসারী শিক্ষায় একজন মানুষ জীবনে বারবার ভুল পদক্ষেপ নিতে গিয়ে প্রতিবার ফিরে আসে আল্লাহর ভয়ে, ফলে তার ভালবাসা এবং দয়ায় সিক্ত হয় অন্তর; আর কখনো বিশুষ্ক বা বঞ্চিত হয়না। জীবন চলার পথে আমার দু'বছর আগের অর্থাৎ ২০০৬ সালের (ডিসেম্বর) হজ্জের অনুভূতি এখনও মন- প্রাণকে করে রেখেছে আল্লাহভীরুতায় মুগ্ধ।

মদীনার মাসজিদে আমার অনুভবে ধরা দিয়েছে' দিনে দক্ষ সেনাপতি আর রাতে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক করায় অনড়' মহানবী (দঃ) এবং সেসব তাজাপ্রাণ, কালোত্তীর্ণ, তাকওয়াবান সাহাবীদের স্মরণ, যাদের পাশে নিজের নগণ্যতার উপলব্ধি। মদীনা থেকে মক্কা যাবার দিন আমার জন্য ছিল এক দিগ্বিজয়ের অনুভূতি। সঙ্গে আমার মাহরাম পুরুষ আমার Husband ডাঃ মনোয়ার হোসেন, বড়বোন মুহসিনা আপা, আমার Husband এর বন্ধু তালেব ভাই, ছোটবোনের Husband দলনেতা শোয়েব নাজির ভাই, উনার বন্ধু কর্ণেল গোলাম মুস্তফা ভাই, তার স্ত্রী ও দশ বছর বয়েসী মেয়ে সহ আমরা মোট আটজন। শুকনো মরুতে মাঝে মাঝে উযু ও খাবারের জন্য কুসুম গরম পানি, চা-নাস্তার ব্যবস্থা, দ্রুতগামী বাসে প্রত্যেক যাত্রীর খোঁজ-খবর নেয়া সব মিলে হাজীদের যাতে কষ্ট না হয়, তার বিপুল আয়োজন। আগে রাসুলের (দঃ) সময়ে প্রতিমুহূর্তে শত্রুর আক্রমনের ভয়ে ভীত অবস্থায় কাফেলাগুলি ঈমান ও তাকওয়ার পুঁজি নিয়ে চলত এ পথে।

হজ্জের প্রতিটি কাজে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই মানবজাতির জন্য এক ওয়ার্কশপ। হারাম area-তে চলাফেরার নিয়মকানুন, ইহরামের শিক্ষা, তাওয়াফ, সায়ী, আরাফা, মিনা, মুযদালিফা সর্বত্র আল্লাহর উপর শিরকমুক্ত ঈমান অর্জনের, কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি দূর করার এক ওয়ার্কশপ, যা নিজে সশরীরে এসে নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত সে শতভাগ অনুভূতি থেকে বঞ্চিতই রইল। আল্লাহর রহমতের সমূদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হবার যে আনন্দ তৃপ্তি তা তো মন দিয়ে বুঝার ব্যাপার। নিগূঢ় সত্য হল: now বলতে যে present moment, এর পরবর্তী অনাগত সময় একজন মানুষ বাঁচবে কিনা এটাই তো অনিশ্চিত। অতএব হজ্ব ফরয হওয়ার পর দেরী করার কোন যুক্তি নেই।

একটি বিষয়ে খুব কষ্টবোধ করেছি যে বাংলাদেশের মহিলাদের হজ্জে উপস্থিতি বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশ এমনকি মুসলিম সংখ্যালঘু দেশের চেয়ে নগণ্য মনে হল। লক্ষ্য করলাম মরক্কো, মিশর, মৌরিতানিয়া, বসনিয়া, উজবেকিস্তান, আমেরিকা, চায়না, জাপান, রাশিয়ার Housewife, Engineer, Doctor, Lawyer, Teacher, Nurse, Student ইত্যাদি নানা পর্যায়ের মুসলিম নারীদের বিরাট উপস্থিতি। চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইসলামিয়া আই হসপিটাল, আল-নূর হসপিটাল ও ভিশন আই হসপিটালে কর্মরত থাকাকালে চোখের সমস্যা দেখাতে আসা নানা পেশার উচ্চশিক্ষিত এবং অল্প-শিক্ষিত উভয় ধরণের মহিলাদের সাথে আলাপকালে জানলাম, অনেকেই বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করেননি, করার ব্যাপারে চিন্তাও করছেন না। কবে করবেন তাও তারা জানেন না। এমনকি কারো কারো হজ্জ যে ফরয এ ব্যাপারেই চেতনা নেই। কেউ নানা সমস্যার কথা বলেন, কেউ মেয়ের বিয়ে দিয়ে হজ্জে যাবেন মনে করেন। অথচ তাদের অনেকে বিভিন্ন Training, সেমিনার বা ওয়ার্কশপে যোগ দিতে, কেনাকাটা করতে, বছরান্তে পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে, ব্যবসার সুবাদে, দর্শণীয় স্থান ভিজিটে দু-তিন সপ্তাহের জন্য ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দুবাই, আমেরিকা পর্যন্ত নানা দেশ ঘুরে বেড়ান। হজ্জে কথা হয়েছে মরক্কোর এক ইঞ্জিনিয়ার বোন এবং মিশরের বোন মারিয়ার সাথে। দেখলাম, এরা কুরআন সম্পর্কে অনেক জানেন এবং তাকওয়ার সমাজ গঠনে খুবই সচেতন। আমার দেশের মা-বোনদের হজ্জে উপস্থিতি এবং এ বিষয়ে আগ্রহের কমতি, বেদনার্ত করেছে আমাকে। হজ্জে গিয়ে আমার মনে হল, দুনিয়ার কল্যাণ আখিরাতে মুক্তির জন্য তীব্র গতিতে ছুটে চলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন আমার হাজব্যান্ড ডাঃ মনোয়ার।

তাওয়াফের পূর্বক্ষণে এত বিশাল জনসমূদ্র দেখে মনে হচ্ছিল পারবতো? পরক্ষণেই ভাবলাম যিনি এপর্যন্ত আনলেন, তিনিই করাবেন। আমি শুধু Discipline এর সাথে দু'য়া পড়ে যখন নেমে গেলাম তখন সহজ মনে হল।

হজ্জ থেকে ফিরে মনে হয়েছে হজ্জের সেই ঐক্যবোধ নিয়ে সংঘবদ্ধতার সাথে নিকটতম সবাইকে নিয়ে নিজের মনিবকে খুশী রাখার কাজ করা, অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া, শিরকমুক্ত জীবন যাপন করা, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার বেলায় সবসময় লাব্বাইক(হাজির) থাকা, সুশৃংখল জীবন যাপন করা, কঠোর পরিশ্রম করতে পারার উদ্দীপনা সঞ্চয় করা, রহমত ও শান্তির সমূদ্রে অবগাহণের মত মানসিক শক্তি অর্জন করা, ইহরাম অবস্থার মতই সবসময় নিষিদ্ধ কাজ না করা--এভাবে জীবন চালাতে পারলে হজ্জের এ শ্রম সার্থক। তা নাহলে হজ্জ হয়ে উঠবে শুধুমাত্র মরুময় স্মৃতিময় একটি জার্নি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আফরোজা বুলবুল
বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংগঠক
বিলাশপুর, গাজীপুর।

ছোটবেলায় আম্মার মুখে নানা-নানীর হজ্জে যাবার গল্প শুনতে শুনতে শিশু বয়সে কল্পনায় মক্কা-মদীনা ঘুরে হজ্জ করে আসতাম আর দু'য়া করতাম বড় হয়ে যেন সত্যিই হজ্জ করতে পারি। মরহুম আম্মার হজ্জে যাবার তীব্র আকুতি থাকা সত্ত্বেও বাস্তব সমস্যা এবং মৃত্যুর কারণে হজ্জ ভাগ্যে জোটেনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ও হজ্জ করতে না পারার আফসোস আমাকে দারুন পীড়া দেয়। এজন্য সবসময় আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে দু'য়া করতাম তিনি যেন তাঁর ঘর যিয়ারতের নসীব করেন। স্বামীকে দিতাম তাগাদা। সংসার জীবনের অনেকগুলো বছর ভাড়াবাসায় কাটাবার পর একখন্ড জমি কিনে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলল। এরপর '৯৮সালে আমার Husband জানালেন এবার আমরা হজ্জে যাব। মহান আল্লাহ আকস্মিকভাবে যাবার এ বন্দোবস্ত করে দেয়ায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে মন। তিনি তো এমনই "যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই।"

ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়ে হজ্জে যাবার সময় ভাষাতীত আনন্দ অন্যদিকে হজ্জ কবুল হয় কিনা সেই ভয় নিয়ে হজ্জ শেষ করি। সেখানকার পবিত্র মাটিতে পা রেখে তৈরী হয় এক পবিত্র অনুভূতি। যেন আল্লাহর রাসূল(স:)এপথে হেঁটেছেন, খোলাফায়ে রাশেদার পদচিহ্ন আঁকা মাটিতে পা রেখেছি অথচ তাদের দেখানো পথে কি চলছি? ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠত। খানায়ে কাবায় নামাযের শান্ত কাতারের দৃশ্য মনে করিয়ে দিয়েছে মুসলমান এক সুশৃংখল উম্মাহ। নামাযের কাতারের এ ঐক্য যদি নামাযের বাইরেও অটুট থাকত তবে আজ বিশ্বের বুকে মুসলমানদের এত লাঞ্ছিত অবস্থা বিরাজ করতনা। হজ্জ কি আমাদের জীবনে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ গড়ার অংগীকার হতে পারেনা?

হজ্জ আমাকে আজীবন আল্লাহর পথে ঐক্যবদ্ধ ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। কোন ভুল বা অন্যায় হয়ে গেলেই মনে পড়ে আমি তো হজ্জ করেছি যা মানুষকে নিষ্পাপ করে, তখনই তাওবা করে ফিরে আসি।

বেগম লতিফা খাতুন
লেখক ও সমাজসেবক
লেক ব্রীজ, রোড নং-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা।

মানুষের জীবন যখন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত তখন ভাত-কাপড়ের চিন্তা হয় প্রধান। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা যেখানে প্রধান হয়ে যায় সেখানে আল্লাহর কাছেই মানুষ তার সকল আবেদন-নিবেদন করে। কি স্বচ্ছলতা, কি অস্বচ্ছলতা, সবসময় কেটেছে আল্লাহর উপর নির্ভরতায়। তার পথেই চেষ্টা-সাধনা করেছি। আর

তাই তিনি এমন অবস্থায় আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন যখন তিনি একের পর এক আমার আকাংখার পরিপূরণ করেছেন। তিনি যে তাঁর এ নগণ্য বান্দাকে শরীরে শক্তি থাকতেই তাঁর নিদর্শন দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন, আজ প্রায় সত্তুরের কাছাকাছি বয়সে আমি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত, অবনত।

'৯৫সালে আমার স্বামী যখন বাবার বদলী হজ্জের উদ্যোগ নিলেন, আমার মন ব্যাকুল হল যদি তার সাথে যেতে পারতাম। উনাকে বলার পর বললেন, তোমার হজ্জের টাকা কই? আমরা দু'জনে জীবনভর সংগ্রাম করে চলার পর আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ছেলে-মেয়েদের ভালভাবেই দাঁড় করিয়েছেন। দু-ছেলে স্বাবলম্বী হয়ে তাদের বাবাকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের দেশে পিতার সম্পদে মেয়েদের ইসলাম প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত নেই। আমি গ্রামের বাড়ি গিয়ে ছোটভাইকে বললাম, আমি তো আমার প্রাপ্য সম্পত্তি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কখনো নেইনি। এখন আমার সম্পদ থেকেও হজ্জ না করায় তো গুনাহগার হতে হবে। ছোটভাই আমার ভাগের একখন্ড জমি নিজেই কিনে আমাকে টাকা দিয়ে দিল। হজ্জের পুরো খরচ বহনে ছেলেরাও এগিয়ে এসেছিল।

আল্লাহর ঘর যিয়ারাত করে এসে মনে হল আল্লাহর ইবাদাত করতে পারায় কী শান্তি, কী আনন্দ। যার কোন তুলনা নেই। যে শান্তি এবং স্বস্তি আমাকে ঘিরে রেখেছে তাতে মনে হয় আমার সম্পদ কমেনি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কত, সে পরিমাণ আমারও জানা নেই। তবে সেসময়ের মত শারিরীক অবস্থা তো এখন নেই। আমাদের অসংখ্য মা-বোনেরা হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যথাসময়ে কোন উদ্যোগ নেন না। বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে সবকিছু ঠিকমত করতে সক্ষম হননা। হজ্জের মত ব্যাপক কল্যাণের ইবাদাতে অংশগ্রহণ করার জন্য মহিলাদের আকুলতা থাকা দরকার।

হজ্জ করার শক্তি ও সামর্থ আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই হয়। সেই অনুগ্রহের সন্ধান প্রত্যেক মুসলমানেরই করা উচিত। সংগ্রাম আল্লাহর ছাড়া পথে চলাই যায়না। আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর হুকুম বাস্তবায়নে প্রতিটি মহিলা অগ্রসর হলে তবেই তারা আল্লাহর সাহায্য পাবে।

নাসরিন হোসেন
গৃহিনী, ৪৯/২ আল আমিন রোড,
কাঁঠালবাগান, ঢাকা-১২০৫

সামর্থবান মানুষের জন্যই হজ্জ ফরয। সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষ যেমন কঠিন পরিশ্রম করে এ ফরয আদায়ের জন্যও সেরকম পরিশ্রম করার আগ্রহ থাকা দরকার। হজ্জের দিনগুলোতে রয়েছে গভীর মনোযোগের সাথে কঠিন পরিশ্রমের কাজ। আন্তরিক আগ্রহ, কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা এবং আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা থাকলেই কেবল এটা সম্ভব।

এ ফরয আদায়ের জন্য ব্যাকুল থাকেন প্রায় সকল মুসলিম নর-নারী। আমি সেই ব্যাকুলতা নিয়ে সৌদী আরবে প্রবাসী থাকাকালে আমার Hasband এর অনেক কষ্টে পাওয়া মাত্র ৫ দিনের ছুটিতে হজ্জের উদ্দেশ্যে একটি বাংলাদেশী হজ্জ কাফেলার সঙ্গী হয়ে শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যখন মক্কায় উপনীত হই তখন মনে হয়েছিল আল্লাহর কাছে দু'য়া করার জন্য জীবনের দুর্লভতম সময় হাতে পেয়েছি।
আল্লাহর কাছে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে দু'য়া করার, ক্ষমা চাওয়ার এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রত্যেক হজ্জকারী ব্যক্তিরই আন্তরিক চেষ্টা থাকা খুবই প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়েছে। মিনা ও আরাফার মূল্যবান সময়গুলোতে কিছু মহিলার সুখদুখের আলাপচারিতা এবং বিচিত্র খাবারের স্বাদ আহরণে ব্যস্ত থেকে দু'য়া এবং আল্লাহর স্মরণে শিথিলতা এবং হৈ-হল্লা করে অন্যদের ইবাদাতের পরিবেশ বিঘ্নিত করতে দেখে অবর্ণনীয় কষ্ট অনুভব করেছি। অনেক মানুষের ভিড়ে হৈচৈ কোলাহল না করে, গল্প-গুজব, গীবত-পরচর্চায় লিপ্ত না হয়ে আল্লাহর কাছে চাইবার আকুলতায় মগ্ন থাকলে নিজেও যেমন আল্লাহর স্মরণে থাকা হয় অন্যদেরকেও আল্লাহর স্মরণের অনুকুল পরিবেশ উপহার দেওয়া যায়। হজ্জ একটি সামাজিক ইবাদত। হজ্জে নিজে সৎকর্ম করা, ভবিষ্যতে সৎকর্মের সংকল্প করা, আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, অন্যদের সাথে সদাচরণের পাশাপাশি অন্যদেরকে সৎকর্মের কথা স্মরণ করানো বা করার সুযোগ তৈরী করে দেয়া এবং আল্লাহর স্মরণের প্রতি উৎসাহী ও আগ্রহী করে তোলাও হজ্জের একটি সামাজিক দায়িত্ব। বিশেষভাবে আমাদের দেশের মহিলাদের হজ্জে এসে এই দায়িত্ব পালনে বেশী সচেতনতা দরকার বলে মনে হয়েছে।

কাবাঘরের সামনে আল্লাহকে এত গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়, ইচ্ছে করে বার বার যাই। বিদায়ী তাওয়াফ করতে এসে মনকে কিছুতেই মানাতে পারিনি যে চলে যাচ্ছি। মাত্র ৫দিনের মাথায় আল্লাহর ঘর ছেড়ে চলে আসতে হলো বলে খুবই কষ্ট লেগেছে। আমাদের মত দূরদেশের মানুষের এতটা Short প্রোগ্রাম নিয়ে হজ্জ করতে আসলে বরকতময় স্থানগুলোতে আরও বেশী সময় কাটাতে না পারার কষ্ট বাড়ায় তবু শুকরিয়া আল্লাহর যে, তিনি সবচেয়ে স্বল্প সময়ের ঐ তড়িৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্ততঃ ফরয হজ্জ আদায় করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

দোয়া করি এ সৌভাগ্য যেন আল্লাহ সামর্থ্যবান সকল মুমিন নারী-পুরুষকে দান করেন, যারা তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যের কাঙ্গাল।

জোহরা আখতার
চাকুরীজীবি, এসপিসিবিএল, গাজীপুর।

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির কিছু কথা লিখছি। মুসলমানের সন্তান হিসেবে সুদূর আরবে মক্কা নামে এক পূণ্যভূমি আছে সেকথা ছোটবেলা থেকেই জেনেছি। সেখানে মানুষ কেন যায়, কি করে তার ভাসাভাসা ধারণাও বয়স বাড়ার সাথে সাথে পেয়েছি।

টিভিতে যেসব হাজী সাহেবদের ছবি দেখতাম তাদের প্রায় সবাই ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। স্বভাবত:ই আমার ধারণা হয়েছিল জীবনের শেষ প্রান্তে এসেই বুঝি এ পূণ্য কাজটি করতে হয়।

একদিন আমার বাসায় এক অতিথি এলেন, তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ভাষায় হজ্জ সফরে মক্কা-মদীনা মিনা-আরাফার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। শুনে আমার মনের গভীরে শুরু হল সেখানে যাবার স্বপ্ন লালন করা। আমার স্বামীও সম্মত হলেন। আমার অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা থাকায় অল্পদিনেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার আকুতি পূর্ণতায় রূপ দিলেন। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি নিয়ে আমি যখন মহা সম্মানিত সেই একমাত্র ঘরের সামনে দাঁড়ালাম, বাঁধভাঙা জোয়ারের মত অশ্রুধারা আমাকে মনে করিয়ে দিল, এইতো সময় তাঁর কাছে চাইবার। মনে হল যিনি সামর্থ এবং শক্তি দিয়েছেন, ত্যাগতো তাঁর খুশীর জন্যই করা দরকার। দুনিয়াবী নানান বাহানায় আমরা আমাদের সামর্থকে অন্য মোড়ে ঘুরিয়ে রাখি, কিন্তু আমার বিশ্বাস হজ্জ করে এবং আল্লাহর খুশীর পথে খরচ করে কেউ অভাবী হয় না। বরং সেই ব্যক্তির উপার্জন আল্লাহ নানান উছিলায় ভরিয়ে দেন। নিজেই প্রমান করে দেখুন। এজন্য ভোগের চেয়ে ত্যাগেই শান্তি, কথাটি যথার্থ।

২০০৫ এ আমার হজ্জের শেষ দিন মক্কায় স্মরণকালের সেরা বৃষ্টিপাত হয়। আমরা জামরা থেকে মক্কায় ফেরার পথে এক দোকানে আশ্রয় নেই। দোকানী দোকান বন্ধের উদ্যোগ নিয়েও আমাদের আশ্রয়ের জন্য খুলে রাখল। তার মালামাল হাঁটু সমান পানিতে ভিজে যাচ্ছিল কিন্তু সে বলল, আল্লাহর অতিথিকে সাহায্য করায় আল্লাহই আমাকে বরকত দেবেন।' আল্লাহর জন্য এভাবে ত্যাগের মানসিকতা আমাকে বিস্মিত করেছিল।

হজ্জের সফর খুবই পরিশ্রমের সফর, শক্তি থাকতেই একজন মুসলমানের হজ্জ করার গুরুত্বের বিষয়টি অনেক মুসলমানই এখন জানেন। বিরামহীন পথ চলার কটা দিন। এদিনগুলোয় সুমেজাজে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। শয়তান তো ওখানেও লেগে আছে যেন-তেন ব্যাপারে কারো উপর আপনাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে। একটি ছোট ঘরে অনেক মানুষের গাদাগাদি করে থাকা, টয়লেটে লাইন দেয়া এসব বড় করে না দেখে, উত্তেজিত না হয়ে সমস্ত সমস্যা যিনি ফায়সালা করতে পারেন তাঁর কাছেই চাইবেন।

হজ্জের আগে বা পরে অনেকে উঠেপড়ে প্রতিযোগিতায় লেগে যান পরিবারের সদস্যদের নামে আলাদা আলাদা উমরা করায়। কিন্তু, তার চেয়ে ভাল প্রতিদিন নামাযের ফাঁকে তাওয়াফ করা। আল্লাহর কাছে জীবনের সমস্ত গুনাহের জন্য আকুল হয়ে ফরিয়াদ জানান, তিনি ক্ষমা করবেনই।

যাবার আগে হজ্জের বই পড়ে এবং অভিজ্ঞদের কাছ থেকে নিয়মকানুনগুলো জেনে, খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জেনে নিলে অজানা অচেনায় কোনই সমস্যা হবেনা, নিতে হবেনা অন্যের সাহায্য কেননা, সেখানে সবাই থাকেন ভীষণ মানসিক চাপে। মন থাকে প্রার্থনারত, শরীর থাকে নিদ্রাহীনতার ক্লান্তিতে ভরা। তাই শক্তি আর সামর্থ হওয়ামাত্র বার্ধক্যের জন্য হজ্জকে ফেলে না রেখে মনের গভীর থেকে নিয়াত করুন, আল্লাহ সব

সহজ করে দেবেন যেমন আমার বাস্তব জীবনে এখন ইসলামকে মেনে চলা হয়েছে অনেক সহজ যা একসময় কঠিনতম মনে হত।

ফারহানা রহমান কান্তা
গৃহিনী, ৮১ পাতলাখান লেন, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

DPS-এর টাকা Maturity শেষে কী করব এ আলোচনায় আমিই প্রথম আমার স্বামীকে হজ্জে যাবার কথা বলি। এক কথায় সেও রাজী হল। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পাঁচ বছরের মেয়ে নাফিসাকে নিয়েই হজ্জে রওনা হলাম। ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠেই মনের দ্বিধা দূর হয়ে তৈরী হল এক পবিত্র আনন্দের অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। যতই পথ অতিক্রম করছি আগ্রহ ততই বাড়ছে।

হারাম শরীফে পৌঁছে কাবাঘর দেখে যে অনুভূতি, তা অতীতের যে কোন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের থেকে অন্যরকম। আগ্রার তাজমহলসহ বিশ্বের নানা দেশের নামীদামী স্থাপত্য দেখে এসেছি, কিন্তু তাতে আমার এরকম অনুভূতি হয়নি, যা তৈরী হয়েছে হজ্জের সফরে, কাবাঘর দেখার পর। মনে হয়েছে যে, এত শান্তি, এত ভাললাগা আমার এ জীবনে আর কোন সময়েই আমি পাইনি।

ছোট মেয়েকে কোলে নিয়েই তাওয়াফ-সায়ী করি। একটু কষ্ট হলেও সে এক অন্য রকম অনুভূতি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে যথারীতি হজ্জ সম্পন্ন করি এরপর মদীনায় যাই। রওযা, রিয়াদুল জান্নাহ, মাসজিদে কুবা, কিবলাতাইন, উহুদ প্রান্তর ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থানেও হাজির হয়েছি শিশুকে নিয়ে, কোন অসুবিধা হয়নি। বরং ছোট শিশু থাকাতে অন্যদের সহযোগিতা পেয়েছি, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে একদিন আমি ও আমার মেয়ে কাবা ঘরের সামনে বসে আছি। ওর বাবা তাওয়াফ করতে গিয়েছেন। অনেকক্ষণ হল তিনি আসছেন না। ক্ষিদে পেয়েছে বলে নাফিসা হঠাৎ কান্না শুরু করল। বাচ্চার জন্য আনা খাবার ফুরিয়ে গেছে। আমার কাছে ঐ মুহূর্তে ওকে দেয়ার মতো কোন খাবার নেই। আবার কাবার চত্বরের বাইরে গিয়ে নিয়ে আসব সে উপায়ও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ এতই মেহেরবান যে তিনি এই অবুঝ শিশুর জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এক অপরিচিত ভীনদেশি বৃদ্ধ এসে ওর হাত ভরে কিসমিস,আপেল, চকলেট দিয়ে চলে যান। আমি সাথে সাথে শুকরিয়া আদায় করি এবং ভাবি যে আল্লাহ কখনই তার বান্দাকে কষ্টে রাখতে চান না।

হজ্জ শেষে ফিরে আসলাম। হজ্জে অনেক কিছু শিখলাম। হাশরের মাঠে কিরূপ অবস্থা হবে তা আরাফাত মাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। সবাই যার যার মতো আল্লাহকে ডাকছেন, ক্ষমা চাইছেন, কান্নাকাটি করছেন। একমনে সবাই শুধু গোনাহ মাফের আকুতিতে বিনম্র চেষ্টায় রত। হজ্জের সময় মানুষ একে অপরকে যেভাবে সাহায্য করে তা সত্যিই অনুকরনীয়। আমার ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে কোন কষ্ট হয়নি। সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাসজিদে কর্মরত নিরাপত্তা কর্মীরা

বাচ্চার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। মক্কা- মদীনার লোকজনের অমায়িক ব্যবহারও আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ এক অন্যরকম অনুভূতি, যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ওয়াক্ত মতো হারাম শরীফে নামায আদায়, সব সময় আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, অপরকে কষ্ট না দেয়া, আল্লাহর ভীতি, আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা এ সবই হজ্জের মাধ্যমে পুনরায় শিখলাম। আল্লাহ যেন আবার তার বরকতময় ঘরের মেহমান হওয়ার তৌফিক দেন সে কামনাই করি।

হজ্জে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ শুধু তাঁর পথে দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে এগিয়ে যাবার মধ্যেই রয়েছে। হজ্জ করার পর থেকে আল্লাহর পথে এখন সচেতন ভাবে এগিয়ে চলছি এবং ইনশাল্লাহ আজীবন চলার আকাঙ্খা পোষণ করছি।

সুমাইয়া হোসেন
এম,বি,বি,এস, ৩য় বর্ষ
আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ক্লাস এইটের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। আম্মু আর আমার ছোট ভাই-বোনকে নিয়ে সৌদি আরবে আব্বুর কাছে এসেছি। তখনও আমার হজ্জের কাগজ পত্র ফাইনাল হয়নি। অবশেষে সকল জটিলতা পেরিয়ে আমি, আব্বু আর আম্মু যখন রওনা দিলাম কাবার পথে, নিজের সৌভাগ্য নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিলনা।

আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে হজ্জ করতে পারায় আমার প্রথম অনুভূতি হয়েছিল কৃতজ্ঞতার। *আল্লাহ যে, তাঁর এই নগন্য বান্দাকে তাঁর ঘর তাওয়াফের সৌভাগ্য দান করেছেন সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা আমার সাধ্যাতীত। কাবার প্রথম দর্শনের শিহরণ, আনন্দ ও শ্রদ্ধা মেশানো ভালবাসার অনুভূতি ভাষায় বর্ননা করার নয়, তা শুধু অনুভবই করা যায়।*

আল্লাহতায়ালা হজ্জের মাধ্যমে মানুষের জন্য যে অপার রহমতের ব্যবস্থা করেছেন, তা থেকে আসলে সবার প্রাপ্তি সমান হয়না। একেক জন মানুষ তার চেষ্টা-সাধনার দ্বারা তার অংশটি পায়। হজ্জ আসলে একটি ট্রেনিং। হজ্জের প্রতিটি কাজ আল্লাহর হুকুম অনুসারে এবং শুধু তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য করার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে কিভাবে চালাব তার একটি দিক-নির্দেশনা পাই। হজ্জ মানুষকে এক আত্মিক শক্তি যোগায়। যাতে জীবন চলার পথে শত কষ্ট ও বিপদ-মুসিবতেও মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা হল, হজ্জের ফলে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অনেক সহজ হয়ে যায়, এবং সেইসাথে ভাল কাজের প্রতি দুর্বার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

পরিশিষ্ট-২

প্রশ্নোত্তর ঃ হজ্জ ও উমরা

[প্রশ্নোত্তর সম্বলিত এ অংশটি সংগৃহিত। সৌদি আরবের স্থায়ী গবেষণা ও ফাতওয়া বিভাগের পক্ষে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, শাইখ আবদুল আজীজ বিন বায এবং শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন। *Hajj & Umrah Guide*-compiled by Talal bin Ahmad al-Aqeel - গ্রন্থ হতে লেখিকা কর্তৃক অনূদিত এবং সংকলিত।]

কতিপয় প্রশ্নের জবাব

প্রশ্নঃ ১. আমরা অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা, প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম এখান থেকে হজ্জ করতে যান। আমরা সিডনি হতে যাত্রা শুরু করে জেদ্দা, আবুধাবি, বাহরাইন- এ তিনটি স্থানের যে কোন একটিতে প্রথমে অবতরণ করি। আমাদের মীকাত কি হবে? আমরা কি সিডনি থেকে ইহরাম বাঁধব নাকি অন্য কোন স্থান হতে?

উত্তরঃ সিডনি,আবুধাবি,বাহরাইন এদের কোনটিই হজ্জ বা উমরাহর মীকাত নয়। জেদ্দা তাদের মীকাত নয় যারা আপনার মত বহিরাগত। জেদ্দা কেবল তাদেরই মীকাত যারা ওখানে বসবাস করেন। যে কোন দিক হতে মক্কা আসার পথে মীকাতসমূহ সুনির্ধারিত। মীকাত সেইস্থানকে বলে, যে স্থান অতিক্রম কালে ইহরাম বাঁধা জরুরি। হজ্জের সফরে ইহরাম না বেঁধে যে স্থান অতিক্রম করা যায়না। মীকাত সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রাসূল (সঃ) মীকাতের সীমা বেঁধে দিয়েছেন, মদীনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফা [বর্তমান নাম 'আবইয়ার আলী'-যা মক্কা হতে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত], উত্তর আরব এলাকা, শাম বা সিরিয়া, জর্ডান, মিশর ও উত্তর আফ্রিকাবাসীদের জন্য জুহফাহ [মক্কা-আল-মুকাররমা হতে ১৮৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যা বর্তমানে 'রাবিগ' শহরের নিকটে], আরবের পূর্বাঞ্চল বা নাজদ্‌বাসীদের জন্য ক্বারনুল মানাযিল [বর্তমান নাম 'আস-সায়িল আল-কাবির'-যা মক্কা হতে ৭৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত], ইয়েমেন ও তার দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম [যা বর্তমানে 'আস-সাদিয়া' নামে পরিচিত এবং যা মক্কা হতে ৯২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত]। এগুলো তাদের জন্যও, যারা হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে মীকাত ব্যতীত অন্যস্থান হতে ঐ পথ [মীকাতের পথ] দিয়ে আসে। আর যারা মীকাতের সীমার অভ্যন্তরে বসবাস করবে তাদের স্বস্থানই তাদের ইহরামের জায়গা। তদ্রুপ মক্কাবাসী ইহরাম বাঁধবে মক্কা থেকে [বুখারী -১৪২৯] । অপর এক হাদীসে ইরাকবাসীদের মীকাত যাতু ইরক [যার বর্তমান নাম সাইল], নির্ধারণ করা হয়েছে। [মুসলিম-২/৮৪১]

মক্কা আসার সময় আকাশ/নদী/স্থলপথে সর্বপ্রথম যে মীকাত আপনাকে অতিক্রম করতে হয় তার পূর্বেই আপনি ইহরাম বাঁধবেন। নবী [সঃ] মীকাত সমূহ চিহ্নিত করার পর

বলেন, *"মীকাতসমূহ তাদের জন্য, যারা মীকাতস্থিত স্থান হতে আসে এবং তাদেরও জন্য যারা হজ্জ ও উমরাহর উদ্দেশ্যে তা [মীকাত] অতিক্রম করে আসে ।"* [বুখারী ও মুসলিম]

আপনি ইহরাম ছাড়া মীকাতস্থিত স্থান অতিক্রম হয়ে যাবার আশংকা করলে, বিমানের ক্রু-দের বলে রাখতে পারেন যেন মীকাত নিকটবর্তী হলে তারা আপনাকে তা অবগত করেন, যেন আপনি যথাসময়ে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়তে পারেন। ইহরামের পূর্বপ্রস্তুতি অর্থাৎ চুল ও নখ কাটা, গোসল করা, ইহরামের পোষাক পরা এসব কাজ যে কোন স্থান হতে এমনকি রওনা হবার আগে বাসা হতেও সেরে নেয়া যায়।

প্রশ্নঃ ২. কেউ যদি হজ্জ বা উমরাহর সংকল্প ছাড়া মক্কায় যান, তার জন্য হুকুম কি?

উত্তরঃ যে কোন ব্যক্তি হজ্জ বা উমরার সংকল্প ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন- যেমন ওখানে কারও ব্যবসা বা চাকুরী রয়েছে, কেউ সেখানে পিয়ন, ড্রাইভার, ছাত্র, শিক্ষক হিসেবে যান, কেউ কিছু কেনাবেচার জন্য যান-এসব লোকদের জন্য হজ্জ বা উমরাহর ইচ্ছা ব্যতিত ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। প্রথম প্রশ্নোত্তরে উল্লিখিত নবী [সঃ] এর হাদীস থেকে এটাই বুঝা যায়। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য সহজতা ও দয়া।

প্রশ্নঃ ৩. কেউ কেউ বলেন, যারা আকাশপথে হজ্জ করতে আসেন, তারা জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধবেন। এটা ঠিক নাকি তার আগেই ইহরাম বাঁধা উচিৎ?

উত্তরঃ যে সকল হজ্জযাত্রী আকাশপথে, সড়কপথে, বা পানিপথে আসেন তাদের সবাইকে মীকাত অতিক্রমের পূর্বে ইহরাম বাঁধতে হয়। যানবাহনে চলন্ত অবস্থায় থাকুন, শিপে কিংবা প্লেনে আরোহিত থাকুন, একই বিধান। রাসূলের (সঃ) সুস্পষ্ট বাণীতে মীকাতের হুকুম সুনির্দিষ্ট করা আছেঃ "ঐ স্থানগুলো তাদের জন্য, *যারা সেই স্থান হতে আসছে [মীকাত এলাকার বাসিন্দা]* এবং তাদেরও জন্য যারা হজ্জ বা উমরাহর সংকল্প নিয়ে ঐ স্থান অতিক্রম করছে।" [বুখারী, মুসলিম] এ কারণে জেদ্দা কোনভাবেই তাদের মীকাত নয় যারা অন্যত্র [দূরবর্তী স্থানসমূহ] থেকে আসছেন। বরং জেদ্দা দুই ধরণের লোকের মীকাতঃ এক, যারা জেদ্দার বাসিন্দা; দুই, যারা অধিবাসী নন, ওখানে প্রবেশ করেছেন হজ্জ বা উমরাহর সংকল্প ছাড়া অন্য কোন কাজে, পরবর্তীতে জেদ্দা থেকে হজ্জ বা উমরাহ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

প্রশ্নঃ ৪. আমার মায়ের মৃত্যুকালে আমি ছিলাম অনেক ছোট। বড় হয়ে বিশ্বস্ত একজনের দ্বারা মায়ের বদলী হজ্জ করাবার উদ্যোগ নিয়েছি। আমার বাবাও মারা গেছেন ছোটবেলায়, যার জন্য তাদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে তেমন কিছু আমার জানার সুযোগ হয়নি। লোকমুখে শুনেছি যে বাবা হজ্জ করেছিলেন। এ অবস্থায় আমি কী বাবার

পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারি? আর অন্য লোককে যে অর্থ দিয়ে মায়ের বদলী হজ্জ করাচ্ছি, এটা ঠিক হয়েছে, নাকি আমারই তা করা উচিৎ?

উত্তরঃ আপনি নিজে যদি তাদের উভয়ের জন্য হজ্জ করেন এবং এর ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হোন তবে তো তা অগ্রগণ্য।অন্যথায় একজন দ্বীনদার ব্যক্তি যার উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন, তাকে হজ্জের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের অর্থ দিয়ে পাঠালে সেটাও ভালো। আপনার বাবা-মায়ের জন্য হজ্জ ও উমরাহ উভয়টি করা ভাল। নিজেই করুন বা যাকে বদলী হজ্জ করায় নিযুক্ত করেছেন তাকে বলুন যেন তিনি হজ্জ ও উমরাহ উভয়টিই করেন। এভাবে আপনি আপনার হারানো মাতা-পিতার প্রতি যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে পারেন। আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

প্রশ্নঃ ৫. এটা কি কারও জন্য অনুমোদনযোগ্য যে, তিনি জীবিত থাকা সত্ত্বেও অন্যকে তার হজ্জ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করবেন?

উত্তরঃ যিনি বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার পর্যায়ে পৌছে গেছেন বা এমন রোগে ভুগছেন যে আরোগ্যের কোন সম্ভাব্যতা নেই- এ দু'ধরণের লোক এটাই করবেন। কেননা, নবী(সঃ) এরকমই বলেছেন। যখন এক সাহাবীর পক্ষ হতে নবী(সঃ)সমীপে এই মর্মে প্রশ্ন করা হয় যে তার পিতা ভ্রমণ করতে অপারগ বিধায় হজ্জে যেতে পারছেননা, তিনি কী করবেন? নবী (সঃ) প্রতিউত্তর করেন,"তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরাহ কর।" এবং যখন খাসয়াম গোত্রের মহিলাটি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল(সঃ), আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি হজ্জ সফরে অক্ষম। তার হজ্জ কী আমি করতে পারব?" আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন, "তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ কর।" [বুখারী, মুসলিম]

প্রশ্নঃ ৬. কেউ যদি এ অবস্থায় মারা যান যে- নিজে হজ্জ করতে পারেননি, তার পক্ষ হতে হজ্জ করার জন্য কাউকে মনোনীতও করে যাননি, এ বিষয়ে কোন অসিয়তও করেননি- এমতাবস্থায় তার পুত্র যদি তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করে তবে ফরয হজ্জের হক আদায় হবে কিনা?

উত্তরঃ কারও মুসলমান পুত্রসন্তান, যিনি ইতিপূর্বে নিজের ফরয হজ্জ সম্পন্ন করেছেন- তিনি তার পিতার ফরয হজ্জের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে পারেন। একইভাবে যে কোন মুসলমান ব্যক্তি যিনি ইতিমধ্যে স্বীয় ফরয হজ্জ আদায় করেছেন, তিনিও এই বদল হজ্জ করতে পারবেন। এটি বুখারী ও মুসলিম শরীফের প্রামাণ্য দলীল দ্বারা নিশ্চিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক মহিলার কথা বর্ণনা করেন, যিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), এমন এক সময় আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন এবং হজ্জ সফরে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। সুতরাং তার হজ্জ কী আমি

করতে পারব?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "হ্যাঁ। তুমি তোমার বাবার হজ্জ করতে পার।"

প্রশ্নঃ ৭. আমার মা বৃদ্ধা, তিনি হজ্জ পালনের সামর্থ রাখেন এবং করতেও চান, কিন্তু দেশে তার কোন মাহরাম নেই। বিদেশ থেকে নিজ মাহরাম ছেলেকে আনিয়ে হজ্জে যেতে বিরাট অংকের অর্থ খরচ হবে, যা তার সম্ভব নয়। এ অবস্থায় তিনি কী করবেন?

উত্তরঃ তার জন্য হজ্জ বাধ্যতামূলক নয়, কেননা তিনি বৃদ্ধা হোন বা তরুনীই হোন একজন নারীর জন্য মাহরাম ব্যতিত হজ্জের সফরে যাবার অনুমোদন নেই। তিনি কেবল মাহরাম জোগাড় করতে পারলেই হজ্জ করবেন। নচেৎ তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তার সম্পত্তি থেকে বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পরিবারের লোকদের রয়ে যাবে। আর যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজ অর্থ খরচ করে তার জন্য হজ্জ করে তবে তাও গ্রহনযোগ্য।

প্রশ্নঃ ৮. ইহরাম বাঁধার সময় সশব্দে নিয়াত উচ্চারণ করা জরুরী কিনা?

উত্তরঃ অবশ্যই জরুরী। ইহরাম ছাড়া আর কোন আমল করার সময়েই একজন মুসলমান কী সংকল্প করছেন তা সশব্দে উচ্চারণ করা উচিৎ নয়। কেবল ইহরাম বাঁধার সময়ই সশব্দে নিয়াত উচ্চারণ করতে হয়। কেননা, নবী (সঃ) এরকমই করেছেন। যেমন, সালাত বা তাওয়াফের শুরুতে তিনি 'আমি সংকল্প করছি অমুক নামাযের [নাওয়াইতু আন উসাল্লি.....]' কিংবা 'আমি এরূপ বা ঐরূপ তাওয়াফের সংকল্প করছি' এই জাতীয় শব্দাবলী উচ্চারণ করেননি। আর এটা এজন্য যে ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন করা এবং তার ঘোষণা দেয়া নিকৃষ্টতম কাজ। যদি কোন সৎকাজ করায় নিয়াত উচ্চারণ করা জরুরি হত তবে তা নবী (সঃ) কর্তৃক মুসলিম উম্মাহর কাছে কথা বা কাজের মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করা হত। আর সেসব কাজকর্ম সাহাবাগন এবং উম্মাহর একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ন পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হত। যেহেতু এটা আমাদের কাছে নবী (সঃ) হতে বা সাহাবায়ে কিরাম হতে আসেনি তাই এটি 'বিদ'য়াত'।

আর নবী (সঃ) বলেছেন, *"একাজ নিকৃষ্টতম যে, [ইসলামে] এমন কিছুর সংযোজন করা যা দ্বীনের ভেতরে নেই এবং প্রতিটি বিদ্'য়াত হচ্ছে বিপথগামিতা।"*[মুসলিম]
তিনি আরও বলেছেন, *"কেউ যদি আমাদের রীতিনীতির মাঝে এমন কোন কিছু আনে যা এর অংশ নয়, অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য।"*[বুখারী ও মুসলিম]

প্রশ্নঃ ৯. যিনি ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ করেছেন অতঃপর পুনরায় নিজের জন্য হজ্জ করার নিয়াতে যাত্রা শুরু করে আরাফায় পৌছালেন। এমতাবস্থায় তিনি স্বীয় সংকল্প পরিবর্তন করলেন এবং এই হজ্জ তার অন্য কোন আত্মীয়ের জন্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এভাবে নিয়াত পরিবর্তন করা সহীহ নাকি ভুল?

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি নিজ হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর আরাফায় বা অন্য কোথাও গিয়ে এ নিয়াত পরিবর্তনের ইখতিয়ার রাখেন না। অবশ্যই তার নিজের জন্যই সে হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে। শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণীঃ *"এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরাহ সম্পূর্ণ কর।"*[২ঃ১৯৬]
সুতরাং যখনই সে নিজের জন্য ইহরাম বাঁধল তখন তা নিজের জন্যই পূর্ণ করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে গেল। আর যখন অন্য কারও পক্ষ হতে ইহরাম বাঁধল তখন সেই ব্যক্তির পক্ষ হতেই হজ্জ বা উমরাহ সম্পন্ন করা আবশ্যক। ইহরাম বাঁধার পর আর নিয়াত পরিবর্তন করার কোন অধিকার তার নেই।

প্রশ্নঃ১০. কোন ব্যক্তি হজ্জের মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে উমরাহ করতে চাইলে এ উদ্দেশ্যে মীকাতে গিয়ে তিনি কী করবেন?

উত্তরঃ এ ধরণের ব্যক্তির জন্য দুটি অবস্থা হতে পারে ।
একঃ হজ্জের মাসগুলো ছাড়া অন্য সময়ে [যথা রমযান বা শাবান মাস] মীকাতে পৌঁছে উমরাহর নিয়াতে ইহরাম বাঁধবেন, হৃদয়ের সংকল্প সহকারে তালবিয়া পাঠ করবেন-কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছার আগ পর্যন্ত। কাবায় পৌঁছে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে সাত চক্র তাওয়াফ করবেন,মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দু' রাকাত নামায পড়বেন, সাতবার সাফা-মারওয়া সায়ী করবেন,সবশেষে মাথা মুন্ডন করে উমরাহ সম্পন্ন করবেন এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হবেন।
দুই ঃ আরেকটি অবস্থা হল, হজ্জের মাস বা নিকটবর্তী মাসসমূহ যথা শাওয়াল, যিলক্বদ এবং যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। এসময়ে হলে তিনটির যে কোন একটি তাকে বেছে নিতে হবেঃ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা [ইফরাদ], শুধু উমরাহর ইহরাম বাঁধা [তামাত্তু], হজ্জ ও উমরাহর ইহরাম একসাথে বাঁধা [কিরান]। বিদায় হজ্জের সময় যিলক্বদ মাসে যখন নবী[সঃ] মীকাতে পৌঁছান, তখন সাহাবীদের এই তিনটির যে কোন একটি বেছে নিতে বলেন। তবে এসময় যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে আনেননি, তার জন্য সুন্নাত হলো উমরাহর ইহরাম বাঁধা। এরপরে তিনি ধারাবাহিকভাবে সেই সব কাজই করবেন যা অন্য সময়ে মীকাত অতিক্রমকালে করতে বলা হয়েছে। এটা এইজন্য যে নবী [সঃ] সাহাবীদের জোর দিয়েছিলেন, যেন তারা উমরাহর ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করেন।

প্রশ্নঃ১১. বিদায়ী তাওয়াফ কি ফরয তাওয়াফের সাথে একত্রে করা যাবে, যখন কেউ যথাশীঘ্র মক্কা ত্যাগ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে চায় ?

উত্তরঃ এতে কোন সমস্যা নেই। যদি কেউ ফরয তাওয়াফ বিলম্বিত করেন এবং কংকর নিক্ষেপ ও হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্নের পর প্রত্যাবর্তন করার পরিকল্পনা নেন, তখন তিনি বিদায়ী তাওয়াফকে ফরজ তাওয়াফেই একীভূত করতে পারেন। এ দুটি তাওয়াফ পৃথকভাবে করায় অতিরিক্ত কল্যাণ পাবেন এটা ঠিক কিন্তু একত্রিতভাবে করায় ফরয তাওয়াফ এবং বিদায়ী তাওয়াফ উভয়টির হক পূর্ণভাবেই আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ১২. একজন মহিলা স্বহস্তে কংকর নিক্ষেপ ছাড়া হজ্জের সকল কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। তার সংগে ছোট শিশু থাকায় কংকর নিক্ষেপের জন্য অন্য একজনকে মনোনীত করেন। কংকর নিক্ষেপের কাজটি হজ্জের আবশ্যকীয় ওয়াজিব বিধায় মহিলার এ ভূমিকা শরীয়তের আলোকে ঠিক কিনা?

উত্তরঃ এতে তার কোন ভুল হয়নি। অন্যকে দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করানোর মাধ্যমে তিনি রামীর ওয়াজিব আদায় করেছেন। এটা সঠিক। কেননা, জামরায় ভিড়ের প্রচন্ডতা কখনও কখনও মহিলাদের জন্য ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়; বিশেষ করে সঙ্গে যখন ছোট শিশু থাকে ।

প্রশ্নঃ১৩. জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে কিনা? কোন কোন অবস্থায় এটি অনুমোদনযোগ্য?

উত্তরঃ নিজের পক্ষ হতে কংকর নিক্ষেপের জন্য অপর কাউকে নিয়োজিত করা অনুমোদিত। অসুস্থ, দূর্বল, গর্ভবতী নারী যার জন্য জামরার ভীড়ে ক্ষতির আশংকা রয়ে যায়, শিশুর মা যার শিশুর কাছে রেখে যাবার কেউ নেই, বৃদ্ধ নারী ও পুরুষ এবং এমন ব্যক্তি যিনি অন্য কোন কারণে কংকর নিক্ষেপের জন্য যেতে পারেননি- তারা কেবল এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা রামী করাতে পারবেন, যিনি এবার হজ্জ করছেন। ছোট শিশুর পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রথমে তিনি নিজ কংকর মারবেন এরপর অন্যেরটা। এমন কাউকে যদি রামী করানোর জন্য নির্বাচিত করা যাবেনা, যিনি হজ্জ করছেন না, কেউ এ ধরণের প্রতিনিধি নিয়োগ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ ১৪. তাওয়াফে ইফাদা বা ফরয তাওয়াফের পূর্বে হজ্জের সায়ী করা হজ্জকারীর জন্য অনুমোদিত কিনা?

উত্তরঃ যদি তার ইহরাম 'ইফরাদ' বা 'কিরান' হয় তবে তিনি তাওয়াফে ইফাদার পূর্বে, যখন তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করেছেন- সেই সঙ্গে সায়ী করে নিতে পারেন। রাসুলে করীম (সঃ) এবং তাঁর যেসব সাহাবীদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল তারা এমনটিই করেছেন।
কেবল তামাত্তু হজ্জের বেলায় দুইবার সায়ী করতে হয়; **প্রথমতঃ** হজ্জকারী যখন উমরাহর ইহরাম বেঁধে মক্কায় উপনীত হলেন, **দ্বিতীয়তঃ** হজ্জের ইহরাম বেঁধে যখন তিনি ফরয তাওয়াফ করলেন, তার পর। কেননা, সাধারণতঃ সায়ী হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে তাওয়াফের পরবর্তী কাজ।
কিন্তু কেউ যদি তাওয়াফের পূর্বে সায়ী করেও ফেলে খুব সম্ভব তা ভুল হবেনা। কেননা, একজন নবীজি (সঃ) কে বলল," আমি তাওয়াফের পূর্বে সায়ী করেছি।" তিনি জবাব দেন, "সমস্যা নেই।"

ঈদের দিনে (ইয়াওমুন নাহর, ১০ যিলহজ্জ) হজ্জকারীগন পাঁচটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করবেন [নবী (সঃ) বিদায় হজ্জের সময় এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন] ঃ

১. জামরাতুল আকাবা বা বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ
২. কুরবানী করা
৩. মাথা মুন্ডন করা বা চুল ছাঁটা
৪. তাওয়াফে ইফাদা বা ফরয তাওয়াফ
৫. সাফা-মারওয়া সায়ী করা-যদি 'ইফরাদ' ও 'কিরান' হজ্জকারী আগমনী তাওয়াফের পর সায়ী করে থাকেন তবে এদিনে তাকে সায়ী করতে হবেনা। এভাবে করাই অগ্রগণ্য তবে কেউ যদি প্রয়োজনবশতঃ এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারেন তবে তাও গ্রহণযোগ্য; এ হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধা।

প্রশ্নঃ১৫. সেই ব্যক্তির জন্য বিধান কি হবে যিনি নিজ পিতার পক্ষ হতে উমরাহ করেন, অতঃপর মক্কাস্থিত তানঈম গিয়ে সেখান থেকে নিজ উমরাহর জন্য ইহরাম বেঁধে আসেন? এভাবে ইহরাম বাঁধা বৈধ নাকি মীকাতে উপনীত হয়েই ইহরাম বাঁধতে হবে?

উত্তরঃ প্রথমে আপনি নির্দিষ্ট মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে স্বীয় উমরাহ সম্পন্ন করবেন এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হবেন। তারপরে অন্য কারও পক্ষ হতে উমরাহ করার কথা ভাবতে পারেন। এ ব্যাপারে কথা হল, পিতা বা যার পক্ষে উমরাহ করতে চাচ্ছেন, তিনি যদি অসুস্থ বা অক্ষম হয়ে থাকেন কেবল তবেই তা করা যাবে। এক্ষেত্রে আপনি হারামের সীমার বাইরে চলে যাবেন, যেমন তানঈম-এ লোকেরা যান, এরপর সেখান হতে ইহরাম বাঁধবেন। এ ক্ষেত্রে মীকাত পর্যন্ত যাওয়া জরুরী নয়। এ বিধি কেবল উমরাহর উদ্দেশ্যে সফরকারীর জন্য। হজ্জের সফরে উমরাহ একবারই কারণ রাসূল (সঃ) তা-ই করেছেন।

প্রশ্নঃ১৬ একজন তামাত্তু এবং কিরান হজ্জকারী কুরবানী করতে অক্ষম হলে তিনি কী করবেন?

উত্তরঃ ইফরাদ হজ্জকারীর কুরবানী নেই। তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর জন্য এটি জরুরি। কাজেই তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারী কুরবানী করায় অপারগ হলে অবশ্যই হজ্জের সময় তিনটি ও বাড়ি ফিরে সাতটি মোট দশটি রোযা রাখতে হবে । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

"এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণভাবে সম্পন্ন কর। যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে কুরবানীর জন্য যা সহজলভ্য তাই তোমাদের জন্য ধার্য। আর মাথা মুন্ডন করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে। তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে অথবা যার মাথায় কোন কষ্ট আছে তার বিনিময়ে সে রোযা রাখবে অথবা সাদাকা করবে বা কুরবানী করবে। আর যারা হজ্জ ও উমরাহ একত্রে আদায় করতে

চাও, যা কিছু সহজলভ্য তা দ্বারা কুরবানী করাই তাদের কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা পশু পাবেনা তারা হজ্জের দিনগুলোয় রোযা রাখবে তিনটি , বাড়ি ফিরে যাবার পর সাতটি। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হবে। এ নির্দেশ তাদের জন্য যাদের পরিবার পরিজন মাসজিদুল হারামের আশপাশে বাস করেনা। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীত ভাবে জেনো যে আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন।" [সূরা বাকারাঃ১৯৬]

সহীহ আল বুখারীতে আয়িশা [রাঃ] এবং উমার [রাঃ] বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,"তাশরীকের দিনে রোযা রাখার অনুমোদন নেই কেবল তারা ছাড়া যারা কুরবানী করতে পারেনি।"
এ তিনটি রোযা আরাফার আগে রাখতে পারলে অধিক পছন্দনীয় কিন্তু আরাফার দিনে রোযা রাখা উচিৎ নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ [সঃ] আরাফায় অবস্থানের দিনে রোযা রাখেননি। আর এই রোযা [৭+৩=১০টি] আল্লাহ যেহেতু ধারাবাহিকভাবে রাখার নির্দেশ দেননি কাজেই আরাফার আগে-পরে মিলে তিনটি এবং বাড়ি ফিরে যে কোন সময় বাকী সাতটি আদায় করলেই হবে।

প্রশ্নঃ১৭. একজন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে মাসিক বিলম্বিত করার ঔষধ সেবন বৈধ কিনা?

উত্তরঃ হজ্জের সফরে এটি অনুমোদনযোগ্য। কেননা হজ্জের সফরে এ বিষয়টি একজন নারীকে চিন্তান্বিত ও বিব্রত করে। তবে স্বাস্থ্যের দিকটি বিবেচনা করে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে আলাপ করার পরেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ১৮. ইহরাম অবস্থায় মুখে নিকাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা না জেনে একজন মহিলা মুখ নিকাব দ্বারা আবৃত করেই উমরাহ করেছেন। এজন্য তাকে কী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?

উত্তরঃ ইহরাম অবস্থায় যা কিছু নিষেধ করা হয়েছে তন্মধ্যে মুখমন্ডলের আবরণ বা নিকাব অন্যতম। যে নারী ইহরাম অবস্থায় নিকাব দিবেন, অবশ্যই তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। তা হল, একটি ছাগল বা ভেড়া কুরবানী করা অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো অথবা তিনটি রোযা রাখা। যিনি এ শর্তটি জানেন এবং যার এটা স্মরণেও ছিল- ফিদইয়ার বিধান তার জন্য। কিন্তু কেউ যদি এ বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ এটি করেন অথবা তিনি ইহরাম অবস্থায় আছেন - এটা ভুলে যাবার কারণে করেন, তবে ফিদইয়া দিতে হবেনা। জানার পর অথবা ইহরাম অবস্থা স্মরণে থাকার পরও নিকাব ব্যবহার করলে তাকেই কেবল ফিদইয়া দিতে হবে।

পরিশিষ্ট-৩

হজ্জের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দু'য়া ঃ

হারাম এলাকার [মক্কা ও মদীনা] পুরোটাই দু'য়া কবুলের স্থান। তাওয়াফ ও সায়ীর সময়, মাকামে ইবরাহীম ও যমযম কুপের সামনে, কাবাঘর সামনে রেখে, মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা অবস্থানকালে, যে কোন সফরকালে এবং মসজিদে নববীর রিয়াদুল জান্নাহ-র প্রতিটি স্থানই দুয়া কবুলের জায়গা। কাজেই হজ্জের সফরে পথ চলার সময়ে, হারাম এলাকায় অবস্থান কালীন সময়গুলোয় এবং বিশেষ বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান সমূহে উপনীত হয়ে আল্লাহর কাছে চাইবার এ সুযোগ কাজে লাগানো দরকার। এজন্য কুরআন ও হাদীসের শেখানো দুয়াগুলো আগেই ভালভাবে শিখে নেয়া ভাল, যাতে তখন ভুল না হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ সহজতর এ দু'য়াসমূহ সহীহভাবে শিখে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়া আমাদের হজ্জের প্রস্তুতির পাথেয় হওয়া দরকার।

হজ্জের সফরে যখন যে দু'য়া প্রয়োজন এবং যখন যে দু'য়া করতে মন চায় সে দু'য়া যেন করা যায় তারই লক্ষ্যে দু'য়াগুলো সংকলিত করা হয়েছে।

উমরাহ এবং হজ্জের নিয়াত ঃ

নিয়াত হল অন্তরের সংকল্প। রোযা, নামায, যাকাত, তায়াম্মুম বা যে কোন সৎকর্মের নিয়াত বলতে মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হওয়াকে বুঝায়। কিন্তু উমরাহ এবং হজ্জের নিয়াত বা সংকল্প সশব্দে ঘোষণা করতে হয়। সেটা হলঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান"।
"-হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করার জন্য হাজির হয়েছি।"
দু'য়া নিজ ভাষায়ও করা যায়ঃ "হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করার সংকল্প করছি। আমার জন্য একাজ সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা কবুল করুন।"
উমরাহ এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধার নিয়ম একই, হজ্জের বেলায় "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান" আর উমরাহর বেলায় "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান" বলতে হয়।
[সহীহ আল বুখারী ঃ ১৪৫৯, ১৪৬০]

তালবিয়া, যা উমরাহর ইহরাম বাঁধার পর হতে কাবাগৃহ দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত বলতে হয়ঃ

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। 'হে আল্লাহ! [আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে] আমি উপস্থিত হয়েছি।'
লাব্বাইক, লা শারীকালাকা লাব্বাইক।- 'আমি হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার কোন শরীক নেই।'
ইন্নাল'হামদা।--'নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা শুধু আপনার।'
ওয়ান্-নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক - 'এবং সমস্ত নিয়ামত শুধু আপনারই এবং সব রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বও।'
লা-শারীকা লাক। -'আপনার কোন শরীক নেই।' [সহীহ আল বুখারীঃ ১৪৪৭, ১৪৪৮]

ইহরাম বেঁধে একবার তালবিয়া পাঠ করা ফরয। ইহরাম অবস্থায় বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করতে থাকা দরকার। বারবার তালবিয়ার ঘোষণা আল্লাহর আতিথেয়তার আহ্বানে বারবার সাড়া দেয়া, আল্লাহর কাজে সদাসচেতন, উদ্দীপ্ত ও জাগ্রত থাকার ঘোষণা।

তাওয়াফ শুরু করার সময় হাজরে আসওয়াদের বরাবর ডান হাত দিয়ে ইশারা করে বলতে হয় ঃ

'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল 'হামদ'। অর্থ-মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই।

হাজরে আসওয়াদে সহজেই চুম্বন করা সম্ভব হলে করবে। কিন্তু ভিড় থাকলে অন্যদের কষ্ট দিয়ে ঠেলে সেদিকে যাবার চেষ্টা করা অনুচিৎ। সেক্ষেত্রে হাতের ইশারা করে উপরোল্লিখিত দু'য়া পড়ে তাওয়াফের প্রত্যেক চক্র শুরু করতে হবে।

[সহীহ আল বুখারীঃ ১৫০৭]

তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামনী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এই দু'য়াটি বারংবার পাঠ করতে হয়ঃ

'রব্বানা-আ-তিনা-ফিদ্‌দুনিয়া-'হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি 'হাসানাতাঁও ওয়াক্বি-না 'আযা-বান্ না-র।'

অর্থাৎ "হে আমাদের রব। আমাদেরকে আপনি পার্থিব জীবনে কল্যাণ দিন আর কল্যাণ দিন আখিরাতে। আর আগুনের শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন।" [সূরা বাকারা ঃ ১০২]

যমযমের পানি পানের দু'য়াঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী-আসআলুকা 'ইলমান না-ফিয়ান ওয়া রিজকান ওয়া-সিয়ান ওয়া শিফা-উ মিন্ কুল্লি দা-য়ীন।" অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কল্যাণকর জ্ঞান, প্রশস্ত রিজিক, এবং সকল রোগের নিরাময় চাইছি।

সায়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে নবী [সঃ] এ আয়াত পাঠ করতেন ঃ

"ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'য়ায়িরিল্লাহ।" অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত।" [সূরা বাকারা ঃ ১৫৮]

সবচেয়ে উত্তম দু'য়া হল আরাফা দিবসের দু'য়াঃ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াহদাহু, লা-শারী-কালাহু- লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদী-র। অর্থঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁর এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" [তিরমিযি শরীফঃ ৩৫৮৫]

হজ্জের ইহরাম বেঁধে জামরাতুল আকাবা দেখার পূর্ব পর্যন্ত পড়তে হয়ঃ
তালবিয়া, যা ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। হজ্জের ইহরাম বেঁধে ৮ যিলহজ্জ মিনায় তারবিয়ার দিন, ৯ যিলহজ্জ আরাফার দিন, ১০ যিলহজ্জ জামরাতুল আকাবায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হবে যত পারা যায়। নবী (সঃ) এমন করেছেন। [সহীহ বুখারী ' হজ্জ অধ্যায়]

কংকর নিক্ষেপের পূর্বে পড়তে হয় ঃ
নবী (সাঃ) [জামরায় প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তাকবীর পড়েছেন। [সহীহ আল বুখারীঃ ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩০, ১৬৩১] তাকবীরে তাশরীক- "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর। ওয়ালিল্লাহিল হামদ।"
অর্থঃ আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান। প্রশংসা কেবল তারই জন্য।
আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে (১১,১২ ও ১৩ যিলহজ্জ) তাকবীরে তাশরীক পড়তে হয় যতবার পারা যায়। বিশেষ করে ফরয সালাতের পর। "এ দিনগুলোতে জামরায় কংকর নিক্ষেপের নির্দেশ আল্লাহর স্মরণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই।" [সুনানে আবু দাউদ ১৬১২]

হজ্জের কাজসমূহ কবুল হওয়ার জন্য তাওয়াফ শেষে, সায়ী শেষে বা ইহরাম খোলার সময় ঃ
"রব্বানা-তাক্বাব্বাল মিন্না-ইন্নাকা আন্‌তাস সামি-'উল 'আলি-ম।"
অর্থঃ "হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী।" [সূরা বাকারাঃ ১২৬]

হজ্জের কাজগুলো যেন আল্লাহ সহজ করে দেনঃ [যখনই কষ্ট অনুভব করবেন তখনই পড়ুন]
"রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুওয়াসসির ওয়াতাম্‌ মিম আ'লাইনা-বিল খাই-র।"
অর্থঃ হে আমার রব! সহজ করে দিন। কঠিন করবেন না। আমাকে কল্যাণের মাঝে রাখুন।

হজ্জের শিক্ষা যেন আমাদের জীবনকে হেদায়েতের পথ দেখাতে পারেঃ
"রব্বানা-, লা-তুযিগ্‌ 'ক্বুলু-বানা,বা'য়দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া 'হাবলানা-মিল্লাদুনকা রা'হমা। ইন্নাকাআন্‌তাল ওয়াহ্‌হা-ব"।"

অর্থঃ হে আমার রব! সরল পথ দেখাবার পর আপনি আমার অন্তরকে সত্যলংঘন প্রবণ হতে দিবেন না। আপনার পক্ষ হতে রহমত দিন। নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা।" [সূরা আলে ইমরানঃ ৮]

"ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলু-ব। ছাব্বিত ক্বালবি 'আলা দ্বীনিক।" [তিরমিজি]

অর্থঃ হে হৃদয়সমূহ ঘুরিয়ে দেয়ার মালিক! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

নিজের ও পরবর্তীদের জন্য দু'য়াঃ

"রব্বী-জায়ালনী মুক্বীমাস সালাতি ওয়ামিন যুররিয়্যাতি রব্বানা ওয়াতাক্বাব্বাল দু'য়া।"

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে সালাত-কায়েমকারী করুন। আমার প্রজন্মকেও। হে আমাদের রব! আমাদের দু'য়া কবুল করুন। [সূরা ইবরাহীম ঃ ৪০]

রাসূল [সাঃ] এর কথা মনে হলেই দরুদ পড়ুন ঃ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা-মুহাম্মাদ। ওয়া 'আলা-আলি মুহাম্মাদ।"

অর্থঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ [সাঃ] ও তার পরিবারবর্গের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

কল্যাণকর জ্ঞান ও সৎকর্ম বৃদ্ধির দু'য়াঃ

রব্বী-যিদ্‌নী- 'এলমা-।

অর্থঃ হে আমার রব! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। [সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৪]

রব্বী-হাবলী হুকমাও ওয়াল হিক্বনী বিস সলি'হী-ন। [সূরা শুয়ারা ঃ ৮৩]

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়নদের শামীল করুন।

পিতামাতার জন্য দু'য়াঃ

রব্বির 'হামহুমা কামা রাব্বাইয়া-নী সাগী-রা-।

অর্থঃ 'হে আমাদের রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।' [সূরা বানী ইসরাঈল ২৪]

রাব্বানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়ালিল মু-মিনী-না ওয়াইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসা-ব।

অর্থঃ হে আমাদের রব! হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার আব্বা-আম্মাকে আর সমস্ত মুমীনদেরকে ক্ষমা করে দিন। [সূরা ইবরাহিমঃ ৪১]

পরিবার পরিজনদের জন্য দু'য়া ঃ

রব্বানা-'হাব্‌লানা-মিন্ আয্‌ওয়া-জিনা ওয়া জুররিয়্যা-তিনা কুররাতা আ'ইয়ুনিওঁ ওয়াজায়ালনা- লিল্ মুত্তাক্বী-না ঈমা-মা।

অর্থঃ হে আমার রব! আমাদের স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য নয়ন জুড়ানো করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীনদের আদর্শস্বরূপ করে দিন।[সূরা ফুরকানঃ ৭৪]

গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা ও ক্ষমা চাইবার দু'য়াঃ

রব্বানা-যলামনা-আ'নফুসানা-ওয়াইল্লামতাগফির লানা ওয়াতারহামনা-লানাকু-নান্ না মিনাল খ-সিরী-ন।

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নাফসের উপর যুলম করেছি, আপনি যদি ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' [সূরা আরাফ ঃ ২৩]

রব্বানা-আতমিম লানা-নূ-রা না ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদী-র।

অর্থঃ 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান। [সূরা তাহরীম ঃ ৮]

রব্বানা-ইন্নানা-আমান্না-ফাগফির লানা-যুনু-বানা-ওয়াক্বীনা-আ'যাবান্ নার।

অর্থঃ 'হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করুন।' [সূরা আলে ইমরানঃ ১৬]

পরিশিষ্ট-৪

রেফারেন্স

১. আল-কুরআনুল করীম– ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২. পবিত্র কুরআনুল করীম– বাদশাহ ফাহদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স
৩. তাফহীমুল কুরআন–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
৪. সহীহ আল বুখারী–২য় খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
৫. সহীহ মুসলিম– ৪র্থ খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
৬. বুখারী শরীফ– ৩য় খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৭. আসান ফেকাহ– ২য় খন্ড মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, আধুনিক প্রকাশনী।
৮. THE HISTORY OF MAKKAH MUKARRAMAH _Dr. Muhammad Ilyas, Al-Rasheed Printers, Madinah.
৯. HISTORY OF MADINAH MUNAWARAH_ do.
১০. নবীদের সংগ্রামী জীবন–আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা।
১১. পবিত্র মক্কার ইতিহাস– শায়েখ সফীউর রহমান মুবারকপুরী, দারুস সালাম, রিয়াদ।
১২. পবিত্র মদিনার ইতিহাস– শায়েখ সফীউর রহমান মুবারকপুরী, দারুস সালাম, রিয়াদ।
১৩. আর রাহীকুল মাখতুম– ছফীউর রহমান মুবারকপুরী, আল কুরআন একাডেমী , লন্ডন।
১৪. হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত গাইড–মুহাম্মদ শামছুল হক সিদ্দিক, হুজ্জাজ চেরিটেবল সোসাইটি, ঢাকা।
১৫. নারীর হজ্জ ও উমরা–ড. আবুবকর যাকারিয়া, হুজ্জাজ, ঢাকা।
হজ্জ পালন অবস্থায় রাসূল (সঃ)এর নান্দনিক আচরণ–ফায়সাল বিন আলী, হুজ্জাজ,ঢাকা।
১৬. জিলহজ্জ, ঈদ ও কোরবানী–ফয়সাল বিন আলী ও আবু আনাস খাইরুল্লাহ, আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, ঢাকা।
১৮. At the Service of Allah's Guests – Ministry of Information, KSA.
১৯. ATLAS ON THE PROPHET'S BIOGRAPHY-- Compiled by Dr.Shawqi Abu Khalil, Darussalam ,Riyadh.
২০. History of Makkah -Shaikh Safiur Rahman Mubarakpuri, Darussalam, Riyadh.
২১. A Pictorial History Of Medina— Dr Muhammad Ilyas, Al-Rasheed, Madinah.
২২. ইসলামে হজ্জ ও ওমরা–আবুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ, দারুল হিকমাহ, বাংলাদেশ।
২৩. কবীরা গুনাহ- ইমাম আয্-যাহাবী (রঃ) -- বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,
২৪. মদীনার ফজিলত -- আবদুল মুহসিন বিন হামাদ- হুজ্জাজ, ঢাকা।
২৫. আধুনিক বাংলা অভিধান--- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
২৬. আধুনিক বাংলা অভিধান---ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।